মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সম্পাদিত

দ্বিতীয় বর্ষ

কলিকাতা

৯।১, জোড়াপুকুর স্কোয়ার

বিদ্যাসাগর ইউনিয়ন ক্লব

হইতে প্রকাশিত

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা মাত্র

এ

একবার দেখা (গল্প) ...	শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী	২২৭
একা বিষ্ণুপ্রিয়া (কবিতা)	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	২৬৫
একান্নভুক্ত পরিবার ...	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ...	৪১

ও

ওরা এবং আমরা ...	... ...	৩০৪

ক

কাঙ্গালিনী মা (গান) ...	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ...	১৫৯
কালো মেয়ে (গল্প) ...	শ্রীজলধর সেন ...	৫৪
কৌলীন্য ও সমাজ ...	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী...	৪৯
কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ...	শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র ..	২৫৩

গ

গভীর নিশীথে (কবিতা) ...	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	৯৩
গান	শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ...	৩২
গার্হস্থ্য চিত্র	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ..	১৩৩

চ

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ...	শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল এম, আর, এ,এস	৩০০
চিত্র (গল্প)	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	১৫০
চির-সধবা (গল্প) ...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত ...	৩০৮

জ

জাহ্নবী (কবিতা) ...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ,... .	২৬৬
জাহ্নবী (সন্দর্ভ) ...	শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	২১২
জ্ঞানদাস বনাম চণ্ডীদাস ...	শ্রীজগদীশ্বর রায় বি, এল, ...	৩২৬

ঝ

ঝড় (গল্প)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬১

ঠ

ঠাকুরের অদৃষ্ট (গল্প) ...	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ . .	২৬৬

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

অচেনা (কবিতা) ...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	২৬১
অনুরোধ-রক্ষা (গল্প) ...	শ্রীহেমচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল, ...	৯৫
অন্নপূর্ণা (কবিতা) ..	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, ...	৩০০
অরণ্য (কবিতা) ...	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৩
অল্পে চালানো ...	শ্রীকিশোরীলাল সরকার এম,এ, বি,এল	১১৭
অশ্রুহার (সমালোচনা)...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, ...	৩৩৯
অক্ষয় তৃতীয়া ...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ, ...	২৩৬

আ

আকাশ (কবিতা) ...	শ্রীধ্রুবলাল দত্ত ...	১৩০
আঁখির মিলন (কবিতা)...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, ...	৬
আগ্রার তাজ ও রূপসী বিধবা নারী } (কবিতা)	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সিংহ ..	৩০৩
আমরাও তাই (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী দাসী ...	১৭১
আমাদের একমাত্র উপায়	শ্রীকিশোরীলাল সরকার এম,এ,বি,এল,	৭,৩৭
আমার কৈফিয়ৎ ...	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৩৫
আমার ঘর (কবিতা) ...	শ্রীমতী মহামায়া দাসী ...	২২০
আমার ছোকরা চাকর ...	শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	২৪২
আমার জীবন (সমালোচনা)	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ...	১১৫
আলমগীরি-কথা ...	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ...	১৪২
আয়ুভিক্ষা (কবিতা) ...	শ্রীরজনীকান্ত সেন বি, এল, ...	১৪৫

উ

উদ্ভিদের দুষ্টামি ...	শ্রীশশধর রায় এম, এ, বি, এল, ...	১৫৭, ২২৫,২৬১
উপহার (কবিতা) ...	শ্রীমতী কৃষ্ণসোহাগিনী দাসী ...	৩৩৪

ড

ডাকঘর	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২০৬

ত

তপস্বিনী (গান)	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি. এ, ...	১৯১
তাজমহল (কবিতা)	...	শ্রীমতী সুরধুনী পালিত ...	৩০৩
তুমি মোর (কবিতা)	...	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	১৪১

দ

দর্পচূর্ণ (গল্প)	...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ...	৭১
দাসীর নিবেদন	...	শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী ...	২৮৩
দীনের আত্ম-নিবেদন	...	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী ...	১৪৬
দেশীয় অর্থশাস্ত্র ও স্বদেশী আন্দোলন	...	শ্রীকিশোরীলাল সরকার এম.এ.বি,এল	৬৫
দেশীয় ধনশাস্ত্র	...	... ঐ ...	৫০০
দেশের কথা	...	...	১৮০, ২৩৫, ২৫৯, ২৯২, ৩৪৩

ধ

ধর্ম্ম	...	শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ	২২০

ন

নববর্ষায় (কবিতা)	...	... ...	৬৯
নববর্ষে	...	... ...	৪
নমস্কার (কবিতা)	...	শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন ...	১
নিরাশা (কবিতা)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	২৭৩

প

পথের দেখা (গল্প)	...	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	১১
প্রণাম (কবিতা)	...	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৬৪
প্রবাহ (সমালোচনা)	...	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার বি,এল, ...	৩১৮
প্রভাতী (গল্প)	...	শ্রীমতী নির্ঝরিণী দাসী ...	১৯২
প্রভাতী (কবিতা)	...	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	১৮১
প্রাণের দেবতা (কবিতা)	...	শ্রীমতী নীতি-কবিতা রচয়িত্রী ...	২২৪

প্রার্থনা (কবিতা) ... শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন ... ৩৩

প্রার্থনা (কবিতা) ... শ্রীমতী মানকুমারী দাসী ... ১১০

ফ

ফেউ ... শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ২০৪

ব

বরাহ মিহির ... ... শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ... ৮২

বড়ী-ভিক্ষা (কবিতা) ... শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ... ২৪৬

বাসনা (কবিতা) ... শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৩৩

বিদ্যাসাগর (গান) ... শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ... ১৪৯

বিবিধ ১২৪

বীরপূজা (সমালোচনা) ১৭৯

বৈষ্ণব উপাসক ... শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ... ১৭৫

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটা পদ ... শ্রীজগদীশ্বর রায় বি, এল, ... ১৬০

ঐ (প্রতিবাদ) ... শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল এম,আর,এ,এস ১৮৯

বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মপ্রচারকগণ ... শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১২৫, ১৬৯

ভ

ভাবান্তর (কবিতা) ... শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৩৩১

ভারতীয় বার্ত্তানীতি ... শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র ... ২১৪

ভারতীয় শিল্পসমিতিতে গায়কোয়াড়ের বক্তৃতা ২৮০

ভারতীয় শিল্পের আদর না অনাদর ... শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২৪

ভাষাবৃত্তি ও ভাষা ব্যক্তর্থ নামক টীকা ... শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, ১১১

ম

মুহূর্ত্তের তরে (কবিতা) ... শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ... ৫৪

মোহিতচন্দ্র সেন (কবিতা) ... শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ... ৮১

মৃত্যু-বধূ (গল্প) ...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ...	৩৩২
ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় ...	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম, বি,	২৩২

র

রঙ্গপুরের প্রাচীন ইতিহাস ...	শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র বি, এ, ...	২৭৪
রত্নমালা (সমালোচনা) ...	শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ...	৬৩
রমণীর প্রাণ (কবিতা) ...	শ্রীমতী সরলাবালা দাসী ...	৯০
রাঙা মেয়ে (কবিতা) ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, ...	৩২১
*রাজদ্রোহ (কবিতা) ...	শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী ...	১১৪
*রাজভক্তি (কবিতা) ...	ঐ ...	১১৪
রাজেশ্বর-মঙ্গল (কবিতা) ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, ...	২০৯
রূপের প্রতিমা (কবিতা) ...	শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৩৪৩

ল

লয় ...	শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ...	১৮২
লক্ষ্ণৌভ্রমণ ...	শ্রীজলধর সেন ...	৮৪
লুকোচুরি (কবিতা) ...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	২১

শ

শিবাজী উৎসব ...	... ...	৬২
শোক-সংবাদ ...	... ...	৬৩

স

সন্ধি-ভঙ্গ (কবিতা) ...	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৮৭
সমালোচনা	...	৩০,১২১,১২২,২৬০,২৮৯
সম্পাদকের প্রতি (কবিতা) ...	শ্রীচমৎকার শর্ম্মা ...	১৬৭
সান্ত্বনা (কবিতা) ...	তিমির	২৮৩
সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি (কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	২৩৭
সৌম্য (কবিতা) ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, ...	৩৩৫
স্বপ্ন	শ্রীশশধর রায় এম, এ, বি, এল,	২২,৯১, ১৩১,১৮৮,২৫০,৩২১
স্বপ্ন-প্রসঙ্গ	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ...	১৭৫
স্বপ্ন-প্রসঙ্গে	শ্রীমতী নীতি-কবিতা রচয়িত্রী ...	৩১৬

স্বদেশী-প্রসঙ্গ ... শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৯৩
স্বাগত (কবিতা) ... শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ... ১২০

হ

হরিনদী ... শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩৭
হরিনদী সম্বন্ধে দু'একটী কথা ... শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী ... ২৪০

ভ্রমসংশোধন।

গত শ্রাবণ সংখ্যা জাহ্নবীতে সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর দুইটী কবিতা কর্ম্মচারীর অমনোযোগীতায় ও ভুলে 'নাম শূণ্য' অবস্থায় বাহির হয় (পৃঃ ১১৪)। প্রথমটীর নাম 'রাজদ্রোহ' ও দ্বিতীয়টীর নাম 'রাজভক্তি' হইবে। জাঃ সং

জাহ্নবী।

ধারা হিমাদ্রিকুহরাদিব জাহ্নবীয়া
ভক্তিঃ স্বজন্মভুবি শাশ্বতপুণ্যপূর্ণা।
বাধা বিধূয় রভসাপি গিরিপ্রমাণাঃ
প্রত্যেকলোকহৃদয়াৎ প্রবহত্বজস্রম্॥

দ্বিতীয় বর্ষ } বৈশাখ, ১৩১৩। { প্রথম সংখ্যা।

নমস্কার ও প্রার্থনা।

নমস্কার

দেদীপ্যতে চন্দ্রিকেব প্রোচ্ছলৎসিন্ধুবীচিষু।
যস্মিন্ জন্মভুবি প্রীতির্মহাত্মানং নমামি তম্॥ ১॥

উচ্ছলিত সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন
মিশিয়া মিশিয়া জ্বলে চন্দ্রের কিরণ;
তেমনি স্বদেশ-প্রেম যাহার আত্মায়
জ্বলিতেছে, নমি আমি সেই মহাত্মায়। ১।

বিশ্বপ্রেমরসেনাত্মা দেহঃ প্রেমাশ্রুধারয়া।
যস্যাভিষিচ্যতে নিত্যং নরদেবং নমামি তম্॥ ২॥

বিশ্বপ্রেমসুধাময় রসে নিরন্তর
অভিষিক্ত হইতেছে যাহার অন্তর;
তিতিছে যাহার দেহ প্রেমাশ্রু-ধারায়,
নমস্কার করি সেই নরদেবতায়। ২।

যোহি দণ্ডভয়ং ত্যক্ত্বা তৃণবদ্দেশমঙ্গলে।
স্থিতো গিরিরিবাকম্প্যো বন্দে তং নরসত্তমম্॥ ৩॥

দণ্ডভয় তৃণতুল্য করিয়া গণন,
অটল অচল গিরিরাজের মতন,

দেশের কল্যাণ-পথে যে জন দাঁড়ায়,
নমি আমি সেই মহাপুরুষের পায়। ৩।

যো জাতিধর্ম্মাদিবিভেদশূন্যঃ
স্বদেশজান্ বেত্তি নিজান্ কুটুম্বান্।
স্বদেশকীটেষ্বপি যন্মমত্বং
বন্দে গুরুং তং নররূপদেবম্ ॥ ৪ ॥

জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা-বর্ণ করে না বিচার,
স্বদেশীমাত্রই যার নিজ পরিবার;
দেশের কীটেও যার অতুল মমতা,
আমার নমস্য গুরু সে নরদেবতা। ৪।

দৃঢ়ব্রতো ভীষ্মবদস্থিদানে
দধীচিবদ্দেশহিতায় যশ্চ।
সহস্রকৃত্বশ্চরণারবিন্দং
নতেন মূর্দ্ধ্না প্রণতোঽস্মি তস্য ॥ ৫ ॥

দধীচির পুণ্য কথা স্মরি' যেই নর (১)
দেশহিতে অস্থি দিতে না হয় কাতর;
ভীষ্মসম কভু যার প্রতিজ্ঞা না টলে
সহস্র প্রণাম তার চরণ-কমলে। ৫।

প্রত্যক্ষদেবীং নিজজন্মভূমিং
হৃদাসনে প্রাণময়ীং নিধায়।
আত্মা বলির্যেন কৃতস্তদঙ্ঘ্রৌ
গৃহ্লামি তৎপাদরজাংসি মূর্দ্ধ্না ॥ ৬ ॥

জ্বলন্ত দেবতা জন্মভূমিই জীবন,
হৃদি-সিংহাসনে তাঁরে করিয়া স্থাপন,
তাঁরি পদতলে যেই দেয় আত্মবলি,
তার পদধূলি আমি শিরে লই তুলি। ৬।

---

(১) দানবগণের অত্যাচার হইতে লোকরক্ষার জন্য দধীচি মুনি মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া নিজ দেহাস্থি দান করিয়াছিলেন। লোকহিতে ত্যক্তপ্রাণ সেই পুণ্যশ্লোকের অস্থিই বজ্রে পরিণত হইয়া দানবসংহার করিল।

অদ্বৈতং যদ্‌ব্রতমহরহো মঙ্গলং মাতৃভূমেঃ
যেষামেকা নিজজননভূর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাঃ।
যেষামন্নং স্খলতি বদনাদশ্রুধারাভিষিক্তং
ধ্যাত্বা দুঃখং স্বজননভুবস্তান্ নমস্যান্ নমামি ॥ ৭ ॥

মাতৃভূমি-সুমঙ্গল যাদের কামনা,
ধ্যানে জ্ঞানে মনে প্রাণে অদ্বৈত সাধনা;
একমাত্র নিজ মাতৃভূমির কুশল
যাহাদের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-ফল;
যাহাদের স্বদেশের দুর্গতি-চিন্তায়
ভেসে যায় অন্নগ্রাস অশ্রুর ধারায়;
নমস্য উপাস্য তারা দেব-অবতার,
তাদের চরণে আমি নমি বারবার। ৭।

বীর্য্যৈঃ স্তন্যৈঃ প্রথয়তি সমং জীবিতং যা সুতস্য
প্রাণগ্রন্থিং রচয়তি শিশোর্জন্মভূভূতিমন্ত্রৈঃ।
দীনাশাং তাং স্বচরিতবিভাপাবিতাশেষদেশাং
বন্দে দেবীং পতিতশরণং ব্রহ্মকারুণ্যমূর্ত্তিম্ ॥ ৮ ॥

স্তনদুগ্ধধারা-সহ পুত্রের জীবন—
সুসাহসে বীররসে যে করে পোষণ;
"দেশহিতে আত্মবলি"—মহামন্ত্র দিয়া
শিশুর জীবন-গ্রন্থি যে দেয় বাঁধিয়া;
স্বদেশ পবিত্র যার চরিত্র-প্রভায়,
মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মকৃপা যে নারী ধরায়;
বিপন্ন জাতির আশা, পতিতের গতি,
সে দেবীর পদে মোর সহস্র প্রণতি। ৮।

স্বর্গং মোক্ষং গণয়তি তৃণং দেশসেবাব্রতে যা
তন্নাম্নৈব জ্বলতি চপলেবোদ্যমো যচ্ছিরাসু।
দেশার্থে যা গলগলদসৃক্ ছিন্নমস্তেব দত্তে
গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ধরণিপতিতস্তৎপদং পূজয়ামি ॥ ৯ ॥

স্বদেশের সেবা-ব্রতে সঁপিয়া জীবন,
স্বর্গ মোক্ষ তৃণতুল্য যে করে গণন;

'স্বদেশ'—নামেই যার শিরায় শিরায়—
উৎসাহ জ্বলিয়া উঠে বিদ্যুতের প্রায় ;
ছিন্নমস্তা-সম নিজে কাটি' নিজ শির,
স্বদেশ-কল্যাণ-তরে যে দেয় রুধির ;
সে দেবীর পাদপদ্ম, গন্ধপুষ্প দিয়া
পূজি আমি ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া । ৯। *

* ॥ ওঁ জন্মভূম্যৈ নমোনমঃ ॥ *

নববর্ষে।

জাহ্নবি, জননি, তোর স্নিগ্ধশ্যামা তটভূমিতে একটী বৎসর যাপন করিলাম। একটী বৎসরের প্রতিদিনে, প্রতিদণ্ডে, প্রতি নিমিষে তোর বক্ষে কত তরঙ্গই না দেখিলাম। প্রতি নিমিষে কত বুদ্বুদের উত্থান ও পতন, কত ঊর্ম্মির ঘাত-প্রতিঘাত ! তোর কুলুধ্বনিতে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন করুণা, কখন ক্রোধ,—কতই না দেখিলাম। কখন রণরঙ্গিণী সৃষ্টিসংহারিণী, আবার কখন করুণাময়ী,—কত বেশেই তোমায় দেখিয়াছি মা ! আজ বৎসরের শেষে আবার তোমার চরণে প্রণাম করি।

বোধ হয় সংসারটা একখানি জমাখরচের খাতা, তাই বৎসরের শেষে তাহার হিসাব দেখিতে হয়। কতটা খরচ হইয়াছে, কতটা জমা রহিয়াছে, লাভ বেশী হইল, কি ক্ষতিই বেশী ইহার খতিয়ান করিতে গিয়া অনেক মাথা ঘামাইতে হয়। কিন্তু মা, তোমার গণিত-শাস্ত্রের হিসাব এক নূতন প্রণালীতে চলে। সে হিসাবে আয়ের পরিমাণ যে কত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; আবার ব্যয় এত যে তাহার তো পরিমাণ করিয়াই উঠা যায় না, তবু মা, "জাহ্নবীর বারিরাশি কখন শুখাইয়াছে" একথা শুনি নাই। কেহ কেহ বোধ হয় তোমার নিকটেই গণিতের এই নূতন নিয়ম শিখিয়া লইয়াছেন, তাই তাঁহারা লাভালাভের হিসাব না করিয়াই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহাদের কখনই দেউলে হইতে দেখি নাই। তাই ভাবিয়াছি মা, তোমার নিকটে গণিত শাস্ত্রের সেই নূতন নিয়ম শিখিয়া লইব। যে নিয়মের মূলমন্ত্র "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—সেই নিয়ম শিখিয়া

* "প্রার্থনা" দ্বিতীয় সংখ্যায় বাহির হইবে। লেখক

লইব। আমরা জানি প্রাণের অপেক্ষা ধন নাই, সেই মহামূল্য জীবনরত্নকে কোথায় কোন কৌটার ভিতরে যে নিরাপদে রাখিব এই চিন্তাতেই আমরা সর্ব্বদা বিব্রত থাকি। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এ মন্ত্র আমরা কখন অবহেলা করি না, আমাদের সুশিক্ষিত পদযুগল সর্ব্বদাই জীবন-রত্নকে শত্রুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য পলায়নে তৎপর হয়। তবুও তো জীবন রক্ষা করিতে পারি না!

প্রতিদিন তোমার তীরে কতই চিতানল জ্বলিয়া উঠে। অগ্নির সুন্দর শিখাগুলি যখন ঊর্দ্ধদিকে মাথা তুলিয়া "পবিত্রম্, পবিত্রম্, পবিত্রম্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে, তখন বিস্মিত হইয়া ভাবি জগতে মৃত্যু কোথায়? তখন তোমার তীর-প্রবাহী পবিত্র বায়ু মন্দগতিতে "স্বস্তি, স্বস্তি, শান্তি,শান্তি," বলিয়া চলিয়া যায়। ইন্ধনের সঙ্গে বহুদিনের সঞ্চিত সন্তাপ ও পাপ ভস্মস্তুপে পরিণত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাও তুমি স্নেহমাখা বাহুতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লও।

দাও মা, আমাদের সেই সর্ব্বত্যাগকারী অমৃতমন্ত্র দাও। সঞ্চয় করিতে গিয়া আমরা সকলই হারাইয়াছি; এবার বিলাইতে, ঢালিয়া দিতে, আহুতি দিতে শিখাও। দাও মা, আমাদের সে অমৃত মন্ত্র দাও; যে মন্ত্রের সাধনায় আমরা মরিয়া অমর হইতে শিখিব—যে মন্ত্রে আমরা ১৩১২ সালকে চিরসঞ্জীবিত, চির নবীন করিয়া রাখিতে পারিব—সেই মন্ত্র আমাদের দাও। তোমার কুলু-কুলু কল্লোলে "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত" ধ্বনি কি গম্ভীর স্বরে দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে! জীবনদায়িনি, বৃথা জীবনের ভাণের পরিবর্ত্তে সত্যজীবন নিত্য-জীবন লাভের আশায় তোমার তীরে তপস্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, আশী-র্ব্বাদ কর যেন আশা পূর্ণ হয়।

ঐ দেখ মা, তোমার জলে স্নান করিয়া তরুণ অরুণ পূর্ব্বাকাশে উঠিতেছেন। কি আনন্দ, সুমঙ্গল, সুমঙ্গল, সর্ব্বত্র মঙ্গল! পশ্চিমাকাশ ঘন মেঘে ঢাকিয়া আসিতেছে; যদি ঝড় উঠে, রণরঙ্গিনি তোমার সন্তানের তাহাতেই বা ভয় কি? তোমার তীরে যে অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে সে তো চিতানল নহে, সুপবিত্র হোমানল।

আঁখির মিলন।

১

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন!
ভুলিল রে ধূলিখেলা, ভুলিল সঙ্গীর মেলা
বাহু পশারিয়া করে আত্মসমর্পন!
আঁখিযুগ বিষ্ফারিয়া, হাসিরাশি ছড়াইয়া
জননীর কমকণ্ঠ করিল ধারণ!
নাচে সিন্ধু শশী-করে; টানে রবি ধরণীরে,
যাদুরে করিল যাদু জননী-বদন,
ওই আঁখির মিলন!

২

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলম!
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতীর হ'ল তবু শত আলাপন!
হ'ল মন জানাজানি, হ'ল প্রাণ টানাটানি,
আশার চিকন হাসি, মানের রোদন,
বিজয়ায় কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ ক্ষতে চন্দন লেপন,
ওই আঁখির মিলন!

৩

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন!
পাখী, শাখী, তরঙ্গিনী, করে সুমধুর ধ্বনি,
"আয় খ্যাপা, ধেয়ে আয়, পাবি দরশন!"
ফেল্ ফেল্ কবি চায়; ভেবে ঠিক নাহি পায়
কোন্ দিকে, হায় ও যে সকলি মোহন!
প্রকৃতির সাথে হয় কবি-চিত্ত বিনিময়;
সংসার বোঝেনা সেই জীবন্ত স্বপন,

৪

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন রে,
আঁখির মিলন!
কি খেলা খেলালে মাগো, কি লীলা দেখালে মাগো,
শূন্যে গাঁথা র'য়ে গেল, ফেরেনা নয়ন!
খিলটি সরিল নারে, চাবিটি খুলিল নারে
আমরি কি ভোজবাজী, চুরি হ'ল মন!
আমি হাসি চুরি গেলে, লোকেতে পাগল ব'লে,
জানেনাক মহাকালী কি ধন সে ধন,
ওই আঁখির মিলন!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

আমাদের একমাত্র উপায়।

যে দেশের লোকের কেবল জমীচাষের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। তাহারা নিশ্চয়ই নির্ম্মূল হইবে। এই তত্ত্বটি ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্রবিদেরা বিশেষ করিয়া জানেন। কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনপ্রণালী-রক্ষণে স্বার্থযুক্ত তাঁহারা একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কদাচিৎ কখনও এক আধটু তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই তত্ত্বের কথা প্রকাশ হয়। কিন্তু আমেরিকার অর্থতত্ত্ববিৎ রাজনৈতিক নেতা-দিগের এরূপ স্বার্থ নাই। সুতরাং কয়েক বৎসর হইল আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রসিডেন্ট বা সভাপতি এই তত্ত্বটি আমেরিকাবাসী লোকদিগের মনে দৃঢ়ীকৃত করাইবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "কি সর্ব্বনাশ, আমেরিকায় শিল্পকার্য্যের চর্চ্চা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের চর্চ্চার দিকে লোকের বেশী মতিগতি দেখিতেছি। এরূপ ভাব চলিতে থাকিলে আমেরিকাবাসীদিগের সর্ব্বনাশ হইবে।" এই কথাটী যে কতদূর সারগর্ভ তাহা আমাদের দেশে অনেকে হৃদয়ঙ্গম করেন না। কেহ কেহ যদি একটু হৃদয়ঙ্গম করিতে যান, সাহেবদিগের কথাবার্ত্তায় তাঁহারাও অনেক সময় পশ্চাৎ-পদ হয়েন। সাহেবেরা কেবলই বলিতেছেন "এখনও তোমাদের অনেক জমী পড়িয়া আছে, তোমরা মূর্খ, সেই সব জমীর চাষের চেষ্টা কর না; তোমরা আলস্য করিয়া কষ্ট পাইতেছ। আমরা এগ্রিকল্‌চারেল বিভাগ স্থাপনা

চালনা—যে বুদ্ধিবৃত্তির অভিমান, ঋষিগণ হইতে পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে আর তাহা থাকে না—তাহা ধ্বংশ প্রায় হইল। কারণ ইহার মূল দুগ্ধ ও ঘৃত; বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এই কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন না, কেহই উপলব্ধি করেন না। কিন্তু সকলেই ইহার ফল ভুগিতেছেন। আমাদের আছে কি? না মাটী আছে; সেই মাটীই কামড়াইতেছি, এবং সেই মাটী কামড়ানর জন্যই আমাদের শাসনকর্ত্তারা আদেশ দিতেছেন, এবং এগ্রিকলচারেল উন্নতির জন্য লেক্‌চার ঝাড়িতেছেন। এবং সেই মাটীই কি অফুরন্ত? মাটীর পরিমাণের ও একটা শেষ আছে; মাটীর উৎপাদিকা শক্তিও অতি সঙ্কোচ সীমাবদ্ধ।

এই অবস্থা যে আমাদের কেন হইতেছে তাহার কারণ এখানে না বলিলেও চলে। তাহার কারণ অতি সহজ, এক কথাতেই বলা যায়; এবং সকল লোকেই তাহা বুঝে। কিন্তু সেই কারণটির প্রক্রিয়া কিছু জড়িত ভাবাপন্ন। দেশ হইতে প্রতি বৎসর যে স্তুপাকার অর্থ ভিন্ন দেশে পাঠাইতে হয়, তাহাই এ দুরাবস্থার কারণ। সেই স্তুপাকার অর্থ আমরা প্রথমত নগদ দিই বটে, কিন্তু পরিশেষে সেই অর্থের যোগে আমাদের একমাত্র সম্পত্তি ভূমি-উৎপন্ন ফসল,তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে ভিন্ন দেশে পাঠাইতে হয়; এবং তাহা পাঠাইতেই হইবে—পাঠানো না পাঠানো আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। অবশিষ্ঠ যাহা কিছু থাকে তাহার দ্বারা ভরণপোষণ হয়, ভিন্ন দেশকে আমাদের যে অর্থ দিতে হয় তাহা যদি আমরা ভূমির বিনা সাহায্যে পরিশ্রমোৎপন্ন অর্থাৎ কারুশিল্পোৎপন্ন ধন দ্বারা শোধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের মাটী লইয়া এত কামড়াকামড়ি করিতে হইত না। তাহা হইলে ভারতের মা লক্ষ্মীর অনেক আসন থাকিত। এই যে সৈনিক বিভাগের মাহিয়ানা এবং সিভিল সার্ব্বিসের মাহিয়ানা ও বিলাতের হোমচার্জ্জ এই সমস্তের মধ্যে যদি কিয়দংশ আমরা শরীর খাটাইয়া শোধ করিতে পারিতাম অর্থাৎ শিল্পকারুকার্য্য দ্বারা শোধ করিতে পারিতাম,তজ্জন্য যদি ভূমি-উৎপন্ন ফসল পাঠাইতে না হইত, তাহা হইলে আমাদের এত দুর্দ্দশা হইত না। কিন্তু এই সমস্ত দেনা আমাদের কেবল মাত্র ভূমির উৎপন্ন ফসলের দ্বারা শোধ করিতে হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, ধানচালের দ্বারা যে কেবল আমাদের এই দেনা শোধ করিতে হইতেছে তাহাই নহে; আমাদের পরিবার কাপড় এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যবহার্য্য সামগ্রী বিদেশ হইতে আনীত হইতেছে। তাহার মূল্যও আমরা

ধানচালের দ্বারা শোধ করিতেছি। ধানচালের দ্বারা কাপড় ইত্যাদি কিনি না বটে, প্রথমেই নগদ টাকা দিয়ে থাকি, কিন্তু সেই নগদ টাকা তৎক্ষণাৎই ধানচাল লইয়া যাওয়ার কার্য্যে সাহেবেরা ব্যয়িত করে। অন্ততঃ আমরা যদি নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি আপনাআপনি প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতের মা লক্ষ্মীর কিছু আসান হয়। ভারতের বক্ষঃস্থিত ভূমি আঁচ্‌ড়াআঁচ্‌ড়ি করা কিছু হ্রাস হয়। দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা অনেকটা লাঘব হয়। অতএব বিদেশীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বর্জ্জন করিয়া দেশীয় কারুশিল্প ইত্যাদির চালনা করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; এবং একমাত্র উপায় কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—কলৌ অর্থাৎ ব্রিটিশ্ শাসন কলৌ।

শ্রীকিশোরীলাল সরকার।

পথের দেখা।

১

ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক ছাত্র প্রতিপালন করিতেন। আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য না হওয়াতে গৃহিণীর সহিত এ বিষয়ে অনেক বিচারবিতর্ক হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়ের পথ ধরিয়া বিচার করিতেন, গৃহিণীও যে অন্যায়ের পথ ধরিয়া অবিচার করিতেন এ কথা বলিতে সাহস করা সুকঠিন। ফলটা শেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হইত। ন্যায়রত্ন নিজের উত্তরীয়ের অগ্রভাগে গৃহিণীর গলদশ্রুলোচন মুছাইতে মুছাইতে বলিতেন "গৃহিণি, সংসারচিন্তা ত্যাগ কর। এ জগতে কে কার, কেবল পথের দেখা। সংসার তোমার ও নয়, আমার ও নয়, যাঁর সংসারের ভার তিনিই বহিবেন।"

সংসার-চিন্তা যে গৃহিণীরই বড় অধিক ছিল তাহা নয়, পতির দেবতুল্য কান্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া থাকিত, সংসার-চিন্তার সেখানে স্থান বেশী ছিল না। তবে শুভানুধ্যায়িনী প্রতিবেশিনীগণ যখন তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "হ্যাঁলা বউ, তোর আক্কেলটা কি? পণ্ডিতই না হয় পাগ্‌লা মানুষ; তা বলে তোরও বুদ্ধিলোপ হ'ল নাকি? মানুষটা যে এত টাকা রোজকার করে আনে, সে কি কেবল বারভূতকে খাওয়াতে? না হ'ল তোর হাতে দু' পয়সার সংস্থান, না হ'ল তোর গায়ে দু' তোলা সোনা। শেষের উপায় কিছু ভাবছিস্ কি?"—এই সমস্ত উপদেশে যখন ব্রাহ্মণ কন্যার সংসার-চিন্তা সহসা সুচেতন হইয়া উঠিত,

তখনই স্বামীর দেখা পাইলে এ বিষয়ে একটু বোঝাপড়া হইত। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখা হইলে, গৃহিণীর অত কথা মনে থাকিত না।

যাহা হউক, অবশেষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'পথের দেখা' শেষ হইয়া গেল। একদিন কোন অজানা নূতন পথে তিনি কোন্ দেশে চলিয়া গেলেন, তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি এতদিন যে সকল ছাত্রকে বিদ্যা, অন্ন, ও স্নেহ দান করিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন তাহারাও "পথের দেখা"র সার্থকতা অনুভব করিয়া যে যাহার পথ দেখিতে লাগিল! ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অতি সাধের চতুস্পাঠী শূন্য পড়িয়া রহিল। যে গৃহ ছাত্রদিগের পাঠকলরবে মুখরিত হইত, সেখানে অতি কঠিন নিস্তব্ধতা গাম্ভীর্য্যের সিংহাসনে বসিয়া নীরব ভাষায় সংসারের অনিত্যতা প্রচার করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া শুভানুধ্যায়ী ও শুভানুধ্যায়িনীগণ বলিলেন, "আমরা তো তখনই বলেছিলাম, কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।"

ন্যায়রত্নতনয় রমনাথের শাস্ত্রচর্চ্চায় তাদৃশ অনুরাগ ছিল না, সে গ্রাম্য ডিস্পেন্সরীতে বিনা মাহিনায় কম্পাউণ্ডারী করিত, লোকের সামান্য অসুখে চিকিৎসাও করিত। আহারের সময় ভিন্ন তাহার গৃহের সহিত সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। অতএব তাহার সংসার-বুদ্ধি যে পিতা ও মাতা অপেক্ষা কোন বিষয়ে বা কোন ক্রমে অধিক হইবে, সে আশা করা অন্যায়।

যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে রমানাথ শূন্য হৃদয় লইয়া শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহে তণ্ডুলমুষ্টি পর্য্যন্ত নাই। মাতা, বিধবা ভগ্নী, তাঁহার দুইটি শিশুসন্তান, শালগ্রাম শিলা এবং একটী গাভী স্থাবর ও অস্থাবরের মধ্যে ইহাই কেবল অবশিষ্ট আছে। ধূলিশায়িনী মাতা ও ভগ্নীর দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে পুরুষ, মাতা ভগ্নী ও ভগ্নীর শিশুদুইটীর ভার তাহারই উপর। তখন কি জানি কোথা হইতে সেই সপ্তদশবর্ষীয় বালকের মনে অপরিসীম সাহস ও বলের সঞ্চার হইল; সেই সঙ্গে মনে মনে সঙ্কল্পও স্থির হইয়া গেল। তাহার পরদিনই রমানাথ বিদেশ যাত্রা করিল, জননী ও ভগিনীর অশ্রুস্রোত ও করুণ বিলাপ কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিল না।

"বাছা আমার ক্ষিদে সইতে পারে না, কে তা'র মুখের দিকে চেয়ে দু'টী খে'তে দেবে।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জননীর ক্ষুধাতৃষ্ণা চলিয়া গেল। অনিদ্র জননী সারা রাত্রি ভূমিতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "ওরে আমি কি রাক্ষসী, পেটের দায়ে আমার দুধের বাছাকে বনবাসে দিলাম।"

এলাহাবাদে 'মিত্র মহাশয়ের' সহিত ন্যায়রত্নের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, সেই ভরসায় রমানাথ তাঁহার গৃহদ্বারে গিয়া অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দারিদ্র্য যেমন আত্মীয়তা নষ্ট করে এমন আর অন্য কিছুতেই নয়; কাজেই এখন আত্মীয়তার আশা করা দুরাশা, দুর্দ্দশায় পড়িয়া রমানাথের এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। তবে এই ব্যবস্থা হইল যে,রমানাথ মিত্রমহাশয়ের পুত্রকে দুইবেলা পড়াইবে এবং বেতনের পরিবর্ত্তে আহার পাইবে।

ইহার পর রমানাথের ভাগ্য আরও একটু প্রসন্ন হইল, একজন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী কাজ তাহার ভাগ্যে জুটিয়া গেল।

(২)

চৈত্র মাস, বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। কালটা বসন্তকালই বটে, কিন্তু আম্রমুকুলের গন্ধ, ভ্রমরঝঙ্কার কি কুহুধ্বনির কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না,—বর্ণনীয় বস্তুর মধ্যে রৌদ্র ও ধূলাই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। মলয় সমীরণের পরিবর্ত্তে 'লু' চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

ঠিক্ এই সময় রমানাথ আতর সুঁইয়ার গলির একতলা বাড়ীখানির দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

'কড়া নাড়িলেন' না বলিয়া 'কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন', এ কথাটার ভাবটা ঠিক বুঝা গেল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু 'আরম্ভ' 'শেষ' রূপে পরিণত হইতে যে অনেক বিলম্ব হইল এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

গলির সম্মুখের দ্বিতল বাটীর জানালায় বসিয়া একটী বালিকা একমনে সেই দুয়ারের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ব্যগ্রভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে তাহার ক্ষমতা থাকিলে সে এখনই গিয়া দরজা খুলিয়া দিত।

অবশেষে বহুক্ষণের পর দরজা খুলিল। কড়ানাড়ার শব্দ থামিয়া যে গর্জ্জন-শব্দ শুনা গেল তাহা এইরূপ—

"আর বাপু, তোমার জ্বালায় পারি না। বাবু ভাল এক আপদ জুটিয়েছ যা হোক্। দুপুর বেলা মানুষ খেটে খুটে দু'টা ভাত মুখে দিয়ে যে একটু ঘরে গিয়ে শো'বে তার যো নেই। এই একটু শুয়েছি, আর তোমার কড়ার ঝন্ঝনানীতে ঘুম ভেঙ্গে মাথা ধরে গেল।"

"ঝি, আজ একটু বেশী কাজ ছিল বলে দেরী হয়ে গিয়েছে—"

"কোন্ দিন বা তোমার সকাল সকাল হয় তাই আজ দেরী হয়ে গেছে, ভাত নিয়ে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার যে প্রাণটা গেল।"

দ্বিতলের জানালায় বসিয়া উমা এই সমস্ত কথা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। রৌদ্রক্লিষ্ট ক্ষুধা-পিপাসায় অবসন্ন প্রবাসীর ম্লান মুখ দেখিয়া হয় তো তাহার মনে করুণা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। রমানাথ ও ঝি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেও সে শূন্য দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু ঝির সুমধুর গর্জ্জন আবার শুনা গেল, এবার সুর মুদারা হইতে তারায় উঠিয়াছে।

"বেড়ালে ভাত খেয়ে গেছে, আমি তার কি কর্‌ব বাপু? নিত্যি নিত্যি কে তোমার ভাত পাহারা দেবে? মাহিনা দিয়ে ক'টা লোক রেখেছ?"

বিড়ালের এবং কাকের ভাত খাইয়া যাওয়া আজিকার নূতন ঘটনা নহে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত, এবং উমা তাহার সমস্ত ইতিহাসই জানিত।

ঝিয়ের কথা শেষ হইবার পরেই রৌদ্রক্লিষ্ট অনাহারী রমানাথ শুষ্কমুখে বাটী হইতে বাহির হইলেন, একতলা বাড়ীর দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া মুক্তার মত অশ্রুবিন্দুগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল উমা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, সে যে কাঁদিতেছিল তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। যখন তাহার দিদি আসিয়া বলিলেন, "জানালায় বসে মুখ ঢেকে কি হচ্ছে? তোর সেই ছোট ছেলের ছেলেটী মারা গেছে বুঝি? তাই কাঁদ্‌ছিস্?" তখন তাহার চমক্ ভাঙ্গিল।

দিদির এই সম্ভাষণে উমা যখন মুখ তুলিয়া একটু হাসিল, তখন দিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "হ্যাঁরে সত্যই যে কাঁদ্‌ছিস্!"

(৩)

প্রতিবাসিনী প্রবীণারা উমার নিন্দা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন "বাপে আর বোনে আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়ে দিয়েছে। অমন আদুরে মেয়ে—শ্বশুর ঘর কের্‌বে কমন করে?"

কেহ কেহ বলিতেন "শ্বশুর ঘর কি আর কর্‌তে হবে? বাপ একটা ছেলে ধরে এনে বড় জামায়ের মত ঘর জামাই করে রাখবে।"

"হোক্ বাপু, তা বলে মেয়ে ছেলের এতটা আহ্লাদ ভাল নয়। আমাদের ঘরে কি আর মেয়ে নাই?"

উমার নামে যে এই সমস্ত অপবাদ, ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সন্তানহীনা রমাসুন্দরীর হৃদয়ের যত সঞ্চিত স্নেহ, উমাই সমস্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সেই যে দিন উমা ও রমা মাতৃহীনা হইয়াছিল, তখন রমা সাত বৎসরের বালিকা, উমার বয়স আড়াই বৎসর মাত্র। সেই সাত বৎসর বয়সেই রমা ভগিনীর প্রতিপালন, পিতার তত্ত্বাবধান ও গৃহিণীপনার ভার—সমস্তই লইয়াছিল; সে আজ দশ বৎসরের কথা। এই দশ বৎসরের ভিতর কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত ভাঙ্গা কত গড়া হইয়াছে, কিন্তু উমা ও রমা এক সূতায় গাঁথা দুটী ফুলের মত তেমনি স্নেহবন্ধনে বাঁধা আছে; এ স্নেহে দ্বেষ ও হিংসার ছায়া মুহূর্ত্তের জন্যও পড়িতে পায় নাই।

মায়ের কথা উমার কিছুই মনে ছিল না। হরিহর বাবুর শয়ন গৃহে তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত দু'খানি খড়ম আছে, সেই খড়ম দু'খানি উমার জননী নিত্যপূজার সময় প্রত্যহ পূজা করিতেন। এখনও হরিহর বাবু স্নানান্তে একবার সেই খড়ম দু'খানির নিকট গিয়া দাঁড়ান, গৃহিণীর একখানি পুরাতন গাত্রমার্জ্জনী সেখানে সযত্নে ভাজ করা আছে, কখনও বা সেইখানি লইয়া কপালের উপর চাপিয়া ধরেন। তাহার পর সেখানি ধীরে ধীরে যথাস্থানে রাখিয়া গৃহের বাহিরে আসেন। উমা সেই খড়ম দু'খানি দেখিয়া মায়ের মুখ মনে করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু মায়ের মুখ মনে করিতে গেলে তাহার দিদির সেই সদাপ্রফুল্ল মুখখানি মনে পড়িত।

দিদির উপর উমার কথায় কথায় রাগ হইত, তখন দিদিকে কত সাধ্য-সাধনা করিয়া মানভঞ্জন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন উমার আরও অনেক দোষ ছিল। শিশুকাল হইতে দিদি আর ক্ষান্ত ঝি ভিন্ন তাহার কোন সঙ্গী ছিল না, এজন্য সে লৌকিক লজ্জা শিক্ষা করিতে পারে নাই। বিবাহের কথায় যে কেন লজ্জা করিতে হয়, তাহা তাহার বুদ্ধিতে কোনমতেই প্রবেশ করিত না। কাজেই প্রতিবাসিনী রমণীরা নাক তুলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেন "মেয়েটা কি বেহায়া!"

(৪)

নাতির শোকে উমা জানলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল এ সংবাদ পিতার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। পিতার আহ্বানে উমা ঘরের কোণে লুকাইলে, রমা তাহাকে পিতার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিতা তাহাদের খেলিবার সঙ্গী, তাই পিতার নিকট তাহাদের কোন

ভয় কি লজ্জা ছিল না। আজ সহসা উমাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া হরিহর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "রমা একটা নূতন খবর শোন্, বুলবুল রাণীর আজকাল লজ্জা হয়েছে।" তাহার পরে দুই হাতে উমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "রমা, উমার বিয়ে তো আর না দিলে নয়।"

রমা হাসিয়া বলিল, "এই যে বলেছিলে উমার বিয়ে দেবে না!"

"দিতে তো এখনও ইচ্ছা নাই—"বলিয়া হরিহর বাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। খড়ম দু'খানির নিকট অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, হয়ত সেই দু'খানি কাষ্ঠ পাদুকায় কত ভক্তি, কত প্রীতি কত স্নেহ ও সেবার ইতিহাস লিখিত ছিল, হরিহর বাবু প্রতিদিন তাহাই পাঠ করিতেন, নহিলে খড়মের গায়ে এমন কিছু কাককার্য্য ছিল না—যে প্রতিদিন দেখিয়াও তবু দেখা শেষ হয় না।

রমা সন্ধ্যা দিবার জন্য ঘরের দুয়ারে আসিয়া প্রদীপ হাতে লইয়া ফিরিয়া গেল, তাহার আর ঘরে প্রদীপ দেওয়া হইল না। ফিরিয়া গিয়া প্রদীপ রাখিয়া সে রন্ধন গৃহের দুয়ারে বসিয়া পড়িল, মায়ের কথা মনে পড়িয়া সহসা তাহার দুই চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল।

দিদিকে রান্নাঘরের দুয়ারে বসিতে দেখিয়া উমা আসিয়া তাহার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল, কিন্তু দিদি যে চুপ করিয়া আছে ইহা তাহার কিছুতেই ভাল লাগিল না। এমন সময় দিদির এক ফোঁটা চোখের জল তাহার হাতের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল।

"একি দিদি, তুই কাঁদছিস কেন?"

দিদির প্রতি উমার এই অযথা 'তুই' সম্বোধনের জন্য সে অনেকের নিকট অনেকবার তিরস্কৃত হইয়াছে, অবশেষে একবার উমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল নিশ্চয়ই সে দিদিকে আর তুই বলিবে না—এবার হইতে তুমি বলিবে। কিন্তু যখন সে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে গেল, তখন তাহার বিষম কষ্ট উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ও দিদি, দিদিরে, তোকে কি আমি 'তুমি' বলতে পারিনিরে।"

উমার কথার উত্তরে দিদি হাসিয়া বলিল "তুই কেন দুপুর বেলায় কাঁদছিলি?"

উমা অনুনয় করিয়া বলিল "না দিদি তোর পায়ে পড়ি, কি হয়েছে।"

রমা বলিল "তোর 'মুখুয্যে মশায়' বকেচেন।"

উমা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল। এ কথাটা এত অসম্ভব যে তাহার বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। সে নিশ্চয়ই জানিত 'মুখুয্যে মশায়' দিদিকে কখনই বকিবেন না, বরং দিদিই সুবিধা পাইলে তাঁহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়ে না।

তখন দিদি বলিলেন "কাঁদছি কেন জানিস্ তোর বিয়ে হবে,তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি তাই।"

উমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। দেখিয়া দিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মেয়েটার হ'ল কি?"

৫

জানালার উপর উমা তাহার পুতুলের ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছিল। সেখানে প্রতিদিন কতই যে জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ ঘটিত তাহার ঠিক নাই।

উমার বাড়ীতে নানারূপ ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার বাবার নিমন্ত্রণ হইত, দিদির নিমন্ত্রণ হইত, ক্ষান্ত ঝি ও বাদ যাইত না। কিন্তু আজকাল তাহার পুতুলগুলি অষ্টপ্রহর লেপমুড়ি দিয়া ঘুমায়, আর সে সমস্ত দুপুরবেলা কাঠের গরাদের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরে বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। রমা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া উপন্যাস হাতে লইয়া মাদুর বিছাইয়া শয়ন করে, দুই চারি ছত্র পড়িতে না পড়িতে ঘুমে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসে। নীচের উঠান হইতে ক্ষান্তকালীর বাসনের ঝন্ ঝন্ ও ঝাঁটার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোথাও একটু খট্ খট্ শব্দ হইলেই উমা কড়ানাড়ার শব্দ মনে করিয়া চমকিয়া উঠে।

গলিটীতে বেশী লোকের চলাফিরা নাই। হয়তো কখন একটা চুড়িওয়ালা 'বেলোয়ারী চুড়ি' হাঁকিয়া যায়, হয়তো দু'টী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক পরস্পরের সুখদুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে চলিয়াছে, হয়তো দুটী তিনটী ছেলে একসঙ্গে গোলমাল করিতে করিতে চলিয়া গেল, তাহার মধ্যে কখন যে একটী লোক আসিয়া সম্মুখের দুয়ারে দাঁড়াইবে সেই প্রত্যাশায় উমা একাগ্রমনে পথের দিকে চাহিয়া থাকে।

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে থাকে ততই তাহার মনের অস্থিরতাও বাড়িতে থাকে। এত বেলায় লোকের কতই ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইতে পারে, মনে ক্রমাগত এই কথার আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে হয় তো বেলা হওয়ার জন্য ঝি

আজ কতই বকিবে, হয় তো এতক্ষণ বিড়ালে ভাত খাইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ভাবনায় ভয়ের সঞ্চার হয়। রমানাথের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে অনুমানে বুঝিতে পারিলে উমার সে দিনটী সার্থক মনে হইত।

উমা যে এমন দিনদিন ধ্যানে তন্ময় হইয়া তপস্বিনী হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাহার নিরীহ দিদি কোন ক্রমেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন নাই। দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাটীর পর তিনি সুস্থচিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বোনটীকে চুল বাঁধিতে ডাকিতে আসিতেন এবং উমার বাড়ীতে অনেকদিন কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম না হওয়ার জন্যও কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিতেন।

উমার এই প্রাত্যহিক ধ্যান একরূপ নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছিল সহসা তাহার মধ্যে বিবাহের কথা আসিয়া পড়িয়া তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। এইবাতায়নখানির সঙ্গে যদি কেহ তাহার বিবাহ দিত তাহাতে তাহার কোন আপত্তি ছিলনা।

রাত্রে ক্ষান্ত তাহাকে ভাত খাইতে ডাকিতে আসিয়া দেখিল উমা বালিসে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। দেখিবামাত্র ক্ষান্তর হৃদয়ে যে ভাবপ্রবাহ উপস্থিত হইল তাহা কণ্ঠনালীতে উপস্থিত হইয়া তড়িৎবেগে রন্ধনগৃহ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইল, অতএব রমা রন্ধনগৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ শয়নগৃহে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন।

রমা বিছানার পাশে গিয়া অশ্রুজলপ্লাবিতা উমাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল "পাগ্‌লি, সেই দুপুর থেকে কেঁদে কেঁদে যে চোখ রাঙ্গা কল্লি। হয়েছে কি তোর?"

উমা দিদির বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল "বাবাকে বোলো, আমি বিয়ে করব না।"

৬

কিন্তু পরদিনই হরিহর বাবু একটা বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিলেন। ছেলের বাপের পাটের কারবার আছে, সম্পত্তিও বিস্তর। বাপের একমাত্র ছেলে, ছেলেটী এলে পড়িতেছে। উমা যখন তাহার পিসীর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিল তখন পাত্রের পিতা তাহাকে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া তাঁহার মেয়েটীকে অতিশয় পছন্দ হইয়াছে, বৈশাখমাসের প্রথমেই তিনি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন।

হরিহর বাবু রমার নিকট শুভসংবাদ দিতে দিতে গৃহিণীকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ক্ষান্ত এই সংবাদ শুনিয়া এতই আনন্দিতা হইল যে

তৎক্ষণাৎ হরির লুট দিবার জন্য বাতাসা কিনিতে বাজারের অভিমুখে প্রস্থান করিল, অগত্যা তাহার অবশিষ্ট কাজগুলি রমাকে করিতে হইল।

সেদিন বাসন্তীদেবীর অষ্টমী পূজা, আফিষের ছুটী ছিল, হরিহর বাবু জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বিবাহের বাজার করিতে গেলেন।

রমা কাজ সারিয়া উমার নিকট আসিয়া বলিল "বুলুবুলি, জান্‌লায় কি. তোকে পেয়ে বস্‌ল নাকি। আয় চুল বেঁধে দি'।"

সম্মুখের বাড়ীতে সজোরে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

রমা বলিল "এবার যে মিত্তিররা খুব ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজো কর্‌ছে, এবার বোধ হয় উদ্‌যাপন হবে।"

বলিদানের বাজ্‌না কানে যাইবামাত্র উমার মনে একটী ভীত, কাতর, আর্ত্ত ছাগবৎসের চিত্র উদিত হইল। গত বৎসর উমা যে বলিদানের দৃশ্য দেখিয়াছিল,—চারিদিকে লোকের কোলাহল, তাহার মধ্যে স্নাত জবামাল্য পরিহিত সিন্দূরচর্চ্চিত উৎসর্গিত ছাগ বৎসটীকে হাড়িকাঠের কাছে আনা হই-য়াছে। সে এত ভয় পাইয়াছে যে 'মা' বলিয়া ডাকিতেও পারিতেছে না, কেবল অতি করুণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতেছে, সেই চাহনি দেখিয়া উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সকলে তখন তাহাকে কত নিন্দাই করিয়াছিল, বাবা তখন তাহাকে কত আদর করিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন্ সে-সমস্ত কথাই উমার মনে পড়িয়া গেল। সে দিদির কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া কাতরস্বরে বলিল "দিদি মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন? এই পূজা নিয়ে কি দেবতা প্রসন্ন হবেন?"

দিদি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল "ছিঃ, ও কথা বল্‌তে নাই।"

ক্ষান্তর হরির লুট দেওয়া শেষ হইলে সে প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইল। উমা রাজরাণী হইবে—ইহা যে ক্ষান্ত চক্ষে দেখিবে এত সুখ যে তাহার অদৃষ্টে ছিল এই চিন্তায় তাহার রোদন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

উমা দিদির দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "দিদি, বাবা বুঝি আমাকেও সিঁদুর মাখিয়ে বলি দেবেন?"

৭

রমা পিতার নিকট গিয়া বলিল "জ্বরটা বলির বাজনা শুনে ভয় পেয়েই হ'য়েছে, নহিলে এত প্রলাপ বক্‌বে কেন? যাহোক বাবা, তুমি একবার ডাক্তার জ্যাঠাকে ডাক্‌তে পাঠাও।"

কিছুক্ষণ পরে হরিহর বাবু ডাক্তার বাবু ও তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন।

ডাক্তার বাবুর সহিত এ পরিবারের বহুদিনের সম্বন্ধ, তিনি উমা ও রমাকে ছেলেবেলা কোলে করিয়াছেন, তাঁহার নিকট রমার কোনই সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে দেখিয়া সে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "ও ছেলেটী বড় ভাল, যদি তাড়াতাড়ি কোন ঔষধ আনাতে হয় তাই ওকে সঙ্গে করে এনেছি। ওকে দেখে কিছু লজ্জা করিতে হবে না।"

উমা শুষ্ক লতার মত বিছানায় পড়িয়াছিল, তাহার জ্বরক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথের প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল।

উমা তখন প্রলাপ বকিতেছিল "দিদি, দু'টো যে বেজে গেল, এখনও কেন কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে না? এত বেলায় মানুষের কতই ক্ষিধে পায়। তিনি এলে ঝি তাঁকে কত বক্‌বে।"

রমা উমার মুখের উপর মুখ নত করিয়া বলিল "উমা, উমা, কি বল্‌ছিস?" তাহার পর ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সমস্ত রাতই এম্‌নি বকেছে। বোধ হয় ভয় পে'য়ে জ্বরটা হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু হরিহরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "এত বেশী ব্যস্ত হইবেন না।"

উমা সহসা বিছানায় উঠিয়া বসিল, বলিল "দিদি, দেখ্, দেখ্, জান্‌লায় গিয়ে দেখ্, ওই বুঝি কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে।"

রমা অশ্রু মুছিয়া বলিল "জ্যাঠামহাশয়, জ্বরটা কি খুব বেশী হয়েছে? সমস্ত দিন জান্‌লায় থেকেই বুল্‌বুলি এই অসুখটি বাধালে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "জান্‌লাটা দেখি?" বলিয়া জান্‌লার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমানাথ ও হরিহর বাবুও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "রমা, ভয় পাওয়ার কথা বল্‌ছিলে, ভয় পাওয়ার কারণটা কি?"

"মিত্র বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হচ্ছিল, বুল্‌বুলি জানালায় বসে' বলিদানের বাজনা শুনেছিল।"

"মিত্র বাড়ী? ওঃ! রমানাথ এই বাড়ীতেই তুমি থাক না?"

রমানাথ মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উমার প্রলাপের সমস্ত অর্থই এখন তাহার নিকট অতিশয় স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "বুলবুলি কি সমস্ত দিন এই জান্‌লায় থাকৃত ?"

"সমস্ত দুপুর এই জান্‌লায় বসে খেলা করিত।"

"ওঃ, গলিটা কি কদর্য্য। এই গলির দূষিত বাতাসেই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে—" বলিয়া ডাক্তারবাবু হরিহরবাবুর হাত ধরিয়া পাশের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হরিহর বাবু অবসন্ন ভাবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রোগটী কি কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে ?"

ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর শান্তস্বরে বলিলেন, "বিপদের সময় অধৈর্য্য হওয়া পুরুষের উচিত নয়। জ্বর অতি কঠিন, বিকারে পরিণত হইয়াছে, তবে এখন অবধি নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখা যায় নাই।"

* * * * *

মিত্র বাড়ী হইতে সজোরে অন্নপূর্ণার বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল; গলিতে একটা ছেলে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"শুধু পথের দেখা দু'দণ্ডেরি তরে।"

শ্রীসরলাবালা দাসী।

লুকোচুরি।

আমি, যেমন করেই পারি,
ধরিব তোমারে ধরিব;
ওগো গর্ব্বিত কামচারী!

খুঁজিব তোমারে কক্ষে কক্ষে,
গোপন-নগন বক্ষে বক্ষে,
কোথায় করিবে আপনা রক্ষে
খোলা যে সকল দ্বার-ই
ওগো গর্ব্বিত কামচারী!

বিবিধ বরণে মধুর ছন্দে,
উতল মধুতে, উথল গন্ধে,
প্রকাশ-কিরণ, পূর্ণ-চন্দ্রে,
হৃদয়-মানস-হারী ;

নবীন শাদ্বলে নীল সিন্ধুজলে—
সতত ও রঙ্গ-তরঙ্গ উছলে,—
প্রতীপ-সমীরে ধীরে ধীরে ধীরে
পরশে পরাণ চুরি।

শত অশ্রু-কণা, নিশির শিশিরে,
প্রবাহিত প্রেম-উৎস নিঝরে,
ধ্বনিত বজ্রে, রণিত মন্দ্রে ;—
ধরিতে বলিছ ডাকি
দিয়া তমসে আবরি আঁখি !

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

স্বপ্ন।

"ইন্দ্রিয় নিস্পন্দ হ'লে সুপ্ত দেহীগণ।" (কৈবল্য) উপনিষদ গ্রন্থাবলী ; নব্যভারত।

যে নিদ্রায় স্বপ্ন দর্শন হয় তাহা গাঢ় নিদ্রা নহে। তাহাতে কেবল ইন্দ্রিয়গণ নিস্পন্দ হয়, এইমাত্র। অর্থাৎ তাহারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে না। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ মনে প্রবেশ করে। এই সময় মন পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ একটী মিথ্যা জগৎ প্রস্তুত করে ; এবং সেই মিথ্যা জগতেই নানাবিধ কর্ম্ম করত সুখ-দুঃখের অধীন হয়। যতক্ষণ স্বপ্ন দর্শন হয়, ততক্ষণ ঐ সমস্ত কর্ম্মকে সত্য এবং ঐ সুখদুঃখকে প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গ হইলেও কিয়ৎকাল ঐ স্বপ্নকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে পারে ; এবং তজ্জনিত সুখ দুঃখকেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে। স্বপ্নে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে না সত্য ; কিন্তু মনঃকল্পিত অন্তর্জগতে ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কর্ম্ম করে। মুদিত চক্ষু দর্শন করে, অপ্রযুক্ত কর্ণ শ্রবণ করে। যাহার বাহ্য অস্তিত্ব নাই, তাহাই দেখে, ও তাহাই শুনে। বাহ্য বস্তু হইতে আলোক-তরঙ্গ চক্ষুতে, এবং বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গ কর্ণে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত শিরা-সংযোগে মস্তিষ্কে নীত হইলে দর্শন বা শ্রবণ ব্যাপার

নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যখন চক্ষু মুদিত, কর্ণ অপ্রযুক্ত, বাহ্যবস্তু অথবা বায়ুমণ্ডল হইতে কোনরূপ তরঙ্গ চক্ষুকর্ণে প্রবেশ করে না, এবং উপযুক্ত শিরাযোগে মস্তিষ্কেও নীত হয় না, তখন দর্শন ও শ্রবণ কার্য্য কিরূপে হয়? শারীর তন্ত্র ইহার কোনই উত্তর দেয় না। যদি বা কিঞ্চিৎ উত্তর দিবার চেষ্টা করে, তাহাও মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম তন্তুর পূর্ব্বানুভূত স্পন্দনের সহিত সংযুক্ত করিয়া একরূপ দুর্ব্বোধ ও নিষ্ফল করিয়া তোলে। তাহার মর্ম্ম এইরূপ যে, আমরা মস্তিষ্কে যে সকল ভাব পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছি, তাহারই স্পন্দন যেন মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে; স্বপ্নাবস্থায় উহাই উদ্গীরিত হয় মাত্র। এ কথায় কিছুই বুঝা যায় না; এবং অনেক ঘটনার সদুত্তর হয় না। প্রথমতঃ একটী সর্ব্বজন-জ্ঞাত বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে। সকলেই জানেন অনেক স্বপ্ন সত্য হয়। যাহা (ভূতকালে) ঘটিয়াছে, কিন্তু আমার জানা নাই, তাহাই হয়ত স্বপ্নে দর্শন করিলাম। অথবা যাহা এখনও ঘটে নাই, তাহাই দর্শন করিলাম। তৎপরে জ্ঞাত হইলাম যে, ঐ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা প্রকৃত পক্ষেই ঘটিল। এরূপ স্বপ্ন অনেকেই দর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এরূপ হয় কেন? আমার মস্তিষ্কে ঐরূপ ঘটনার কোনই অনুভূতি অথবা প্রতীতি নাই, তথাপি উহা আমি স্বপ্নে দর্শন করিলাম, আর ঐ স্বপ্ন সত্য হইল! এই অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপারের মূল কি?

স্বপ্নকে, আমার বোধ হয়, দুইভাগে বিভাগ করা যায়; (১) দেহজ ও (২) মনোজ। অনেক সময় দেখা যায় যে দেহের ভাবান্তর হইলে স্বপ্ন দর্শন হয়। গুরুতর ভোজনের পর নিদ্রিত হইয়া দেখিয়াছি যে, যদি উদর স্ফীত হইয়াছে অথবা স্ফীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে নানারূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। বৈকারিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তির মস্তকে অধিক রক্ত উঠিলে, কিংবা রক্তহীনতা হইলেও রোগী নানারূপ দৃশ্য দর্শন করে। উহাকে ঠিক স্বপ্ন না বলিলেও একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে উদরের অজীর্ণাবস্থা এবং শরীর-যন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থায় নিদ্রাযোগে নানারূপ স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে। ইহাই দেহজ স্বপ্ন। আর যে স্বপ্নের সহিত দেহের কোন সংশ্রব নাই, কেবল মনেরই কার্য্য, তাহাই মনোজ স্বপ্ন। ইহা সম্পূর্ণরূপে মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু মনের স্বীয় অনুভূত পদার্থ স্বপ্নে দৃষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা স্বীয় অনুভূত ও নহে, তাহাও দৃষ্ট হইতে পারে। এই শেষোক্ত স্বপ্নগুলিই আমার আলোচ্য বিষয়। যে সকল স্বপ্ন আমার পূর্ব্বানুভূত

বিষয়ের নহে, তাহা কিরূপ সত্য হয়—অনেকেই নিজ নিজ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা আলোচনা করিলে স্মরণ করিতে পারিবেন যে এই শ্রেণীর স্বপ্নের প্রায়ই কোন নিকট আত্মীয় অথবা বন্ধুর সহিত সংস্রব থাকে। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, অমুক বন্ধুকে মৃত অবস্থায় আঙ্গিনাতে বাহির করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত পক্ষেই অত্যল্প কাল পরে সংবাদ পাইলাম যে সেই বন্ধু ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সময়েই মৃত হইয়াছেন। রংপুর জেলার পুলিস্ আফিসের হেড ক্লার্ক শ্রীমান রজনী-কান্ত মৈত্রেয় তাহার পিতৃবিয়োগ সময়ে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল; এবং পরে সেই স্বপ্ন সত্য বলিয়া জানা গিয়াছিল। একটী ভদ্রমহিলা আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বামী কখনই সুরাপান করিতেন না; কিন্তু যে দিন দূরদেশে বন্ধুবর্গের অনুরোধে তিনি প্রথম সুরাপান করেন সেই দিনই রাত্রে ঐ মহিলা সেই বিষয় স্বপ্ন দেখেন, এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পতিকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে ঐ স্বপ্ন সত্য। পাঠকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এইরূপ দুই একটী কিংবা ততোধিক সত্য স্বপ্নের বিষয় স্মরণ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ইহারই মূল অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এইরূপ স্বপ্ন সকল বিশ্বস্ত সূত্রে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। আমি আশা করি, এবং অনুরোধ করি, যে পাঠক ও লেখকগণের মধ্যে যিনি যত সত্য স্বপ্ন স্বয়ং দেখিয়াছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। আমি বারান্তরে ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। সম্প্রতি এই মাত্র বলিতেছি যে, এই শ্রেণীর সত্য স্বপ্ন প্রায়শঃ আত্মীয় বন্ধুগণের সম্বন্ধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীশশধর রায়।

ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর।*

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ Government Art School এর শিক্ষা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকগুলা ভুল রটনা এবং কুটিল জল্পনা গোটাকতক ধূমকেতুর মত আমাদের শিল্পজগতের চারিদিকে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং বাজে পুচ্ছ আস্ফালন ও অনেক ধূমোদ্গীরণ করিয়া আমাদের এক প্রকার দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে, ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের মনে নানারূপ অলীক আশঙ্কা উৎপাদন করাইয়া এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল করিতেছে যে যদিও এই স্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ Mr. Havell ভারতের একজন প্রকৃত

* কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পঠিত।

বন্ধু, তথাপি এই স্কুলে শিক্ষা এবং পরিচালনাপদ্ধতির কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি নিজের অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন এবং আমাদের স্কুকুমার শিল্পশিক্ষার ও শিল্প বিষয়ে উন্নতির পথ একবারে রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের যে ক্ষতি করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে এই Art Gallery হইতে পাশ্চাত্য চিত্রকলার সমস্ত আদর্শগুলিকে বিদায় করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় শিল্প-সম্ভারগুলিকে আশ্রয় দেওয়াকেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি; এবং সেজন্য ঘরে-পরে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছি ও খবরের কাগজে অতি রূঢ় ভাষায় তাঁহাকে গালিগালাজ দিতেও ক্রটি করি নাই, এমন কি লাট কর্জ্জনকেও বাদ দিই নাই।

আমরা লিখিয়াছি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিল্প-মহারথী এবং বড়লাটগণ উপযুক্ত বোধে এই Art Schoolএর জন্য সে সকল বিলাতী চিত্রসমষ্টি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, Havell সাহেবের মত অগণ্য চিত্রকর এবং কর্জ্জনের মত অজ্ঞ বড়লাট কোন্ সাহসে সেই শিল্পজগতের মহার্ঘ মণিগুলি নিলামে চড়াইলেন। এই ধারণা কতনা ভ্রমাত্মক এবং দেশীয় শিল্পকলা এই Art School এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস যে একান্ত মঙ্গলজনক এবং স্বদেশী শিল্পচর্চ্চা ব্যতীত যে আমাদের উন্নতির অন্য উপায় নাই, নিম্নোদ্ধৃত পত্র দুইখানিই তাহার প্রমাণ প্রথমখানি এই স্কুলেরই একজন ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্যামবাবু তৎকালীন অধ্যক্ষ Locke সাহেবকে লিখিতেছেন, এবং দ্বিতীয়খানি Locke সাহেব শ্যাম বাবুকে লিখিতেছেন।

সকলের বোধগম্য করিবার জন্য নিম্নে ইংরাজি পত্র দুই খানির আংশিক বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

শ্যামবাবু লিখিতেছেন—

আমি আপনার নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহারই ফলস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। আমার আশা যে, এই পুস্তিকা আমার দেশবাসীগণের মনে আর্য্যজাতির শিল্পকলার সৌন্দর্য্যপ্রভা কিঞ্চিন্মাত্রও বিকীর্ণ করুক, যে ভারতীয় শিল্পের আপনি এত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত চর্চ্চা করিতেন।

পত্রোত্তরে Locke সাহেব—যাঁহার সহিত তুলনা করিয়া Havell সাহেবকে আমরা অনেক সময় অপরিণামদর্শী এবং শিল্পশিক্ষার মহা অন্তরায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকি—কি বলিতেছেন দেখা যাক—

প্রিয় শ্যাম বাবু—

তোমার উপহৃত পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিলাম—আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরী সম্যক্ ভাবে আলোচনা করিতে হইলে, যে সুযোগ, তত্ত্বানুসন্ধান এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এপর্য্যন্ত তোমার স্বদেশীয়গণের নিকট সুপ্রাপ্য ছিলনা, এবং সেই কারণেই বঙ্গবাসীগণ একদিকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পথে যেমন অধ্যবসায় এবং প্রশংসার সহিত অগ্রসর হইতেছেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পচর্চ্চা সম্বন্ধে একেবারে মনোযোগ দিতেছেন না। ভারতের পুরাতন শিল্পকলার সম্যক্ চর্চ্চা করিতে হইলে যে অবকাশ এবং সুযোগ ও শিক্ষার প্রয়োজন আমি জানি, তাহা তোমার নাই; তথাপি তুমি তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তাহাদের মাতৃ-ভাষায় তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব শিল্পকলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার জন্য এই যে পুস্তক রচনা করিয়াছ, ইহার জন্য ভারতীয় শিল্পের বহুল প্রচারেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট তোমার এই স্বল্প চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।

এ সম্বন্ধে আরও বহুতর পণ্ডিত মণ্ডলীর মত প্রমাণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা বহুকাল এই স্কুলের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদের ভালমন্দ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই কথায় আমরা অধিকতর আস্থা স্থাপন করিব নিশ্চয়।

পত্রান্তরে Locke সাহেব বারংবার সুযোগ কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পত্রখানি আগাগোড়া পড়িলে এই মনে হয় যে, এতকাল Art School না থাকায় আমাদের ভারতীয় শিল্পচর্চ্চার সুযোগ ছিল না। এখন এই নব প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিদ্যালয় সেই সুযোগ আনিয়া দিল, এবং এখন হইতে বঙ্গবাসী নব শিক্ষার গুণে ভারতবর্ষে শিল্পচর্চ্চার নবযুগ উপস্থিত করুক। কিন্তু হায় তাঁহার আশা কতদূর সফল হইল! সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আসিয়া যে মহাত্মা আমাদের শিল্পশিক্ষার ভার লইয়াছিলেন তাঁহার সেই মহৎ আশা আমরা কতদূর পূর্ণ করিলাম! এত বৎসরের রীতিমত শিক্ষার পর ও এত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত আমাদের সমস্ত উদ্যম মরীচিকা মুগ্ধ মৃগচেষ্টিতের মত নিষ্ফল হইয়া গেল, যে সুযোগের অভাব তাহাই রহিল, বরং Locke সাহেব যাহাকে সুযোগ বলিয়া ভাবিলেন সেই সুযোগ আমাদের কপালে কুযোগ হইয়া দিনে দিনে পাশ্চাত্য মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের নিজের শিল্প ভুলাইয়া দিল। আমরা বিলাতী আদর্শপূর্ণ এই শিল্পশালার মধ্যস্থলে অহিফেনগ্রস্তের মত

দিব্য-বিভোর হইয়া আরামে রহিলাম ও নেশার ঝোঁকে কেবলই র‍্যাফেল টিসিয়ান্ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। আমরা একপ্রকার সুখেই ছিলাম; প্রতিদিন স্কুলে আসিতেছিলাম, ঘরে যাইতেছিলাম, বিস্ময়ের সহিত Gallery'তে সাজান বড় বড় ছবির দিকে চাহিয়া থাকিতাম ও তাহার নিখুঁত Copy লইতাম এবং ভাবিতাম র‍্যাফেল টিসিয়ান্ না হই এই ভাবে চলিলে বিলাতের যে একটা কিছু মিছু হইব, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাস্তি। বেশ সুখেই ছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে Havell সাহেব আসিয়া আমাদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলেন! বিষম আঘাতে বিলাতি সমস্ত চূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কঠোর সত্যের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। আমরা অন্তরে বিষম ব্যথা পাইলাম। আমাদের চোখের সম্মুখে দেশীয় স্রোতে বিদেশীয় ও পাশ্চাত্য ভাসিয়া গেল। আমাদের সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ বুঝিলাম। বুঝিলাম আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া শিখিতে হইবে, স্রোতের ঘর ভাসিয়া গেল, আবার নূতন ঘর বাঁধিতে হইবে, কাট কাটিতে হইবে, দেওয়াল গাঁথিতে হইবে। আমাদের আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সেই সাবেকি চালের পদানত হইতে হইবে। ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতার চেষ্টা, ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার দম্ভ দূরে রাখিয়া—সহস্র সহস্র বৎসরের দেব-মন্দির সকলের মুখে ভক্তিভরে তীর্থ যাত্রায় বাহির হইতে হইবে। কি বিড়ম্বনা—যে শিল্পকে আমরা এতকাল অনাদরে নির্ব্বাসিত রাখিয়াছি, যে হতাদরে দীনের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার আবার আদর করিতে হইবে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে বসাইতে হইবে, এবং যে সকল শিল্পীকে আমরা মুটে মজুর জ্ঞানে ঘৃণা করিয়া আসিতেছি তাহাদেরই গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সুখসুপ্তকে হঠাৎ জাগাইলে যেরূপ হয়, আমাদেরও অবস্থা সেইরূপ হইয়া উঠিল; সহসা নিদ্রোত্থিতের মত আমরা ন্যায় অন্যায় বিচারে অক্ষম হইলাম, নিজের ভাল মন্দ এবং শত্রু মিত্র কিছুই চিনিতে পারিলাম না, কেবল পাগলের মত "সব গেল সব গেল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমরা একবার যদি ভাবিয়া দেখিতাম তবেই বুঝিতাম, এই যে আর্য্যবর্ত্তের শিল্প-স্রোত মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় আমাদের মধ্যে আজ পুনরায় উপস্থিত হইল ইহা আমাদের মঙ্গলের জন্য, ধ্বংসের জন্য নহে। আজ যে স্রোত আমাদের সাধের বিলাতি আসবাব চূর্ণ করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই সোতই কালে আমাদের সন্তান-

সন্ততিকে, আমাদেরই জন্মভূমিকে সুখ-সৌন্দর্য্যে, ধন-ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিবে।

আমাদের যে জাগিতেই হইবে, পুরাতনের দিকে ফিরিতেই হইবে—এ কথা যে আজ Havell সাহেব বলিতেছেন তাহা নয়; ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই একজন এই ভাবে আমাদের জাগাইবার জন্য উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন—তিনি আর কেহই নহেন, এই স্কুলেরই ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্যাম বাবু। শ্যামাচরণ শ্রীমাণী মহাশয় তাঁহার "আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরী" নামক পুস্তকের শেষ ভাগে বলিতেছেন—"ইউরোপ খণ্ডে যদিও অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মাদিগের অবিরাম পরিশ্রম দ্বারা আমরা স্বদেশীয় অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তথাচ এই মহাদেশের অনেক অংশে এরূপ অমর কীর্ত্তি সকল বিদ্যমান আছে, যেখানে অদ্যাপিও উক্ত পুরাবৃত্ত্যানুসন্ধায়িদিগের পদধূলিও পড়ে নাই—অনেক নিরপেক্ষ ইউরোপীয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এত দিনে আমরা (ইউরোপীয়েরা) পুরাকালীন হিন্দুদিগের স্থপতি প্রভৃতি শিল্প-কার্য্যের দ্বারদেশে মাত্র পদার্পণ করিয়াছি। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই সুবিস্তীর্ণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবে কে? এই প্রশ্নের উত্তর দান কালে আমাকে কলিকাতাবাসী মহোদয়গণের মুখের প্রতি আগ্রহ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে হইতেছে—যেহেতু তাঁহারাই দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জন্মভূমিরূপ জননীর প্রিয় সন্তানের যোগ্য—তবে কেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। কায়মনে যত্ন করিয়া মায়ের ভগ্ন অলঙ্কারের শোভা বিস্তার করিতে যত্নবান হউন—" এই শিল্পশালায় ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটিবে শ্যামবাবু যেন পূর্ব্বেই তাহার আভাষ পাইয়াছিলেন, এবং সেই জন্য কলিকাতা-বাসীদিগকে জাগিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, আমরা যদি তখন জাগিতাম তবে এখন এত গোলে পড়িতে হইত না, এবং আজ আমাদের সম্বলশূন্যের মত অকূল পাথারে পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে হইত না। আমাদের শিল্প জগতে এই বিপ্লবের পুরাকালের আর একটি মহৎ ঘটনার সহিত তুলনা হয়। দেবলোক ভেদ করিয়া হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া, কত গ্রাম নগর স্রোতে ভাসাইয়া উত্তাল তরঙ্গে গঙ্গা স্রোত এক দিন আমাদের ভারতবর্ষে উপস্থিত—জহ্নু মুনি তখন তপোবনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; পবিত্র জলস্রোত তাঁহার কুটীর কমণ্ডলু ভাসাইয়া লইল, সহসা ধ্যান-

ভঙ্গে ক্রুদ্ধ মুনি সেই বহু তপস্যার ফল, বহুজনের মঙ্গল-কারিণী ভাগিরথীকে নিমেষমধ্যে নিরুদ্ধ করিলেন এবং মহাত্মা ভগীরথকে অভিসম্পাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহাতপা নিজের ভ্রম যেমনি বুঝিলেন, অমনি সেই পুণ্য-বাহিনী ভাগিরথীকে পুনরায় জগতের মঙ্গলের জন্য সোৎসাহে প্রবাহিত হইতে দিলেন। ঋষি বুঝিয়াছিলেন একটা বৃহৎ মঙ্গল অনুষ্ঠানের মুখে ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া দণ্ডায়মান হওয়া কি অন্যায়, ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে স্রোত সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া চলিয়াছে, কারণ তাহা যে মঙ্গল প্রসব করিবে তাহার কাছে সামান্য গ্রাম নগর কিম্বা তাঁহার এই কুটীর কমণ্ডলুর মূল্য কত তুচ্ছ—তাই সেই দূরদর্শী মহাযোগী নিজের শরীর বিদীর্ণ করিয়াও সেই স্বর্গীয় পবিত্র স্রোতস্বতীর গমন-পথ স্বহস্তে মুক্ত করিলেন। আজ হইতে আমরাও যেন সেই মহর্ষির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি। শিল্পজগতের এই মহাস্রোত স্বার্থলোভে যেন রোধ না করি, এবং জহ্নু-কন্যা জাহ্নবী বলিয়া ভাগিরথী যেমন জগতে বিদিতা তেমনি এই নূতন স্রোত বঙ্গদেশ-লালিতা বলিয়া যাহাতে প্রসিদ্ধিলাভ করে, আমরা যেন প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করি।

কাচের বদলে মণি অথবা নূতন প্রদীপের বিনিময়ে অভিষ্ট-বর্ষি পুরাতন মায়া-প্রদীপের ন্যায় তুচ্ছ বিলাতী চিত্রপটের বদলে আমাদের জন্য যে অমূল্য শিল্পসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে তাহার যথার্থ মূল্য আমরাই যেন বুঝি। যে সুযোগ আজ উপস্থিত তাহা যেন আর হাত ছাড়া না হয়। আর যেন আমরা বিলাতী চাকচিক্যে ভুলি না—কেহ যেন আর বৃথা তর্কজালে আমাদের দৃষ্টিরোধ না করে—আমরা যেন দিনে দিনে মাতৃ-দুগ্ধের ন্যায় আমাদের চির পুরাতন শিল্প-সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিয়া সবল, কর্ম্মক্ষম এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকি। আজ গ্রীষ্মাবকাশে আমরা গৃহে ফিরিতেছি; এই অবকাশ আমাদের যেন বৃথা না যায়। যে গ্রীষ্মের মাধুরী ভারতের অমর কবি কালিদাস উপভোগ করিয়া একদিন মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন "প্রচণ্ড সূর্য্য স্পৃহনীয় চন্দ্রমা," আমরাও ভারতসন্তান ঋতুরাজের সেই প্রচণ্ড সৌন্দর্য্য যেন সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে প্রয়াস পাই, এবং কবির মত যথার্থ শিল্পীর ভাষায় এই নিদাঘ বর্ণনের চেষ্টা পাই; আমরা যেন আধুনিক পাঁচালীর ছন্দে কেবলি না লিখি—

পাকিল কাঁঠাল আম।
লিচু আর গোলাপ জাম॥

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

মঞ্জুষা—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ছোট ছোট ত্রয়োদশটী গল্প লইয়া সুধীন্দ্র বাবু মঞ্জুষা সাজাইয়াছেন। সমস্ত গল্পগুলিই অল্পের মধ্যে বেশ গুছাইয়া লেখা হইয়াছে। ছোট গল্প লিখিতে হইলে যে সমস্ত মালমসলার প্রয়োজন, লেখকের ভাণ্ডারে সে সমস্তই আছে; উপরন্তু সেই সমস্ত মালমসলা প্রয়োগের বন্দোবস্ত ও বড় সুন্দর হইয়াছে। এক "রসভঙ্গ" গল্পটী ব্যতীত আমাদের সমস্ত গল্পই বেশ ভাল লাগিয়াছে। "বুড়ী" গল্পটীতে করুণার ছবি জাগ্রত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অল্পের মধ্যে এমন করুণ গল্প আমরা খুব কমই পাঠ করিয়াছি। ইহাতে আড়ম্বর নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা অপূর্ব্ব, এবং সে অপূর্ব্বত্ব উপভোগ করিবার জিনিষ। "খ্রীষ্টানের আত্মকথা"—একজন নেটিভ খ্রীষ্টানের আত্ম-কাহিনী। ভ্রাতৃস্নেহ যে কি অপূর্ব্ব জিনিস, তাহা আমরা "জলাঞ্জলির"—হৈমাবতীর চরিত্রে দেখিলাম। শত অত্যাচারে অত্যাচারিতা হইয়াও হৈমবতী ভ্রাতা হেমচন্দ্রের প্রতি যে নিঃস্বার্থপরতা দেখাইয়াছেন—তাহা হিন্দুর গৃহেই সম্ভবে। "সহধর্ম্মিণী" গল্পটীতে একটু বিদ্রূপাত্মক শিক্ষা আছে। উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু তাহা পালন করা বড় কঠিন। উপেন বিমলের শিষ্য। উপেন বিবাহিত, বিমল অবিবাহিত। বিমলের শিক্ষানুযায়ী উপেন স্ত্রীর কাছে রাত্রে শাস্ত্র আওড়ান আর বলেন, "কামিনী-কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যজ্য"। স্ত্রী যে সাজসজ্জা করে, রঙের ফিতা দিয়া চুল বাঁধে, ভিনোলিয়া সাবান মাখে, উপেনের তাহা ভাল লাগে না? গুরুর উপদেশে তাহার বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে। উপেনের তিরস্কারে উপেনের স্ত্রী শৈল স্বামীর মতে মত দিতে বাধ্য হইল। এদিকে বিমল গয়ায় গিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিল। একটী মৃতপ্রায় সুন্দরী বালিকার সেবা করিতে যাইয়া, তাহাকে নিজের সেবাদাসী করিয়া ফেলিল। তারপর সালঙ্কারা সুবাসস্নাতা বিলাসিনী স্ত্রীকে লইয়া একদিন শিষ্য উপেনের গৃহে উপস্থিত। উপেন ত অবাক্, নিজের ভুল বুঝিল, আবেগ কম্পিত বক্ষে শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে গেল। কিন্তু শৈল আর পূর্ব্বের শৈল নয়—এখন বিরসবদনা দীননয়না তৈলহীন রুক্ষকেশী সহধর্ম্মিণী,—তাই দুইহাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিল,—"আমি তোমার সহ-ধর্ম্মিণী, কুহকিনী বা মায়াবিনী নহি।" লাঠীর কথা নূতনভাবে লিখিত, বড় সুন্দর হইয়াছে। স্নেহের বন্ধন যে পশুকে মানুষ করিয়া তোলে, তাহা "পুরাতন ভৃত্যে" দেখান হইয়াছে। "সেবিকা"র রাধাকান্তের মত অনেক হুজুকে স্বদেশী—নিজেদের ম্যাজিনি গ্যারিবল্ডি ভাবিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও মাতৃপূজার মন্দিরে "বলি দিব" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠে। এ ক্ষেপামিতে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা এ নেশা কাটিলে অবসাদের সময় তাহারা বুঝিতে পারে। হিন্দু-বিধবা রুগ্ন উপকারীর সেবা করিতে যাইয়া নিজের এবং সন্তানের জীবন উৎসর্গ করিল। এ উৎসর্গে প্রকৃত দেবীভাব,—যাহা হিন্দু-বিধাবার একমাত্র সৌন্দর্য্য পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত বলিতেছি—সুধা যথার্থ

সেবিকা। "সন্তোষিনীর ডায়ারি" কয়েকটী দৈনন্দিন ঘটনা লইয়া লিখিত। রকমটা নূতন হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি "মঞ্জুষার" এই ডায়ারি"ই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। ইহাতে অনেক খাঁটি কথা আছে। লেখকের সহিত আমরাও অন্তরের সহিত বলিতেছি "আমার মেয়ে যদি গৃহধর্ম্ম পালন না করে, অথচ বি-এ কিম্বা এম-এ তে ফাষ্ট হয়, তাতে আমার মনে সুখ হয় না, কিন্তু সে যদি কোন পাশ না করে', ধর্ম্মেকর্ম্মে বিপদে সেবা শুশ্রূষায় ঘরকন্নায় আপনার ক্ষুদ্র সংসারকে মহিমান্বিত ক'রে তুলতে পারে তা হ'লে আমাদের আর সুখের অবধি থাকে না।" এমন সুন্দর জিনিস আপাতত শেষ করা হইয়াছে। ভরসা করি মঞ্জুষায় দ্বিতীয় সংস্করণে সুধীন্দ্রবাবু "ডায়রির" আকার পরিবর্দ্ধিত করিবেন।

কাহিনী—শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইহা একখানি ছোট গল্পের বহি। সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার একটী সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছেন। লেখিকা কবিতাতে সিদ্ধহস্তা, তাঁহার কাহিনী পাঠ করিয়া দেখিলাম গদ্য রচনাতেও তিনি সুনিপুনা। ভাবে ও বর্ণনার পারিপাট্যে কাহিনীর গল্পগুলি বেশ মনোরম হইয়াছে। তাঁহার "প্রেমের জয়" গল্প রত্ন—কাহিনীর কোহিনূর। "বিসর্জ্জন" গল্পটী বড় করুণ, হিন্দু বাল বিধবার যন্ত্রণাময় জীবনের একখানি সুন্দর পরিস্ফুট আলেখ্য। অন্যান্য গল্পগুলিও ভাল; তবে ভুল গল্পটীকে আবশ্যক অপেক্ষা বড় করিয়া লেখিকা প্রথমেই ভুল করিয়াছেন।

স্বদেশিনী—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

আমরা বড়ই আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। অষ্টাদশটী কবিতা লইয়া লেখিকা "স্বদেশিনী"র আকার গঠন করিয়াছেন। এক একটী কবিতা পাঠ করিলে স্বদেশ প্রেম হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া এক বিরাট শক্তির প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমেই লেখিকা আমাদের—

"এস শিরে লয়ে আশীষ মাতার
পর আঁটি অঙ্গে বর্ম্ম একতার
ধরহ একতা কিসের ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়।"

বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। তাঁর এ আহ্বানে আমরা কর্ণপাত করিব কি? তাঁহার "অঙ্গচ্ছেদ" বড় প্রাণস্পর্শী। "রাখীমন্ত্র" শীর্ষক কবিতায় তিনি যে তেজময়ী মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। "কৃষকের গান" "মাতৃস্তোত্র" "শিবাজী উৎসব" "সমুদ্রগর্জ্জন শ্রবণে" প্রভৃতি কবিতাগুলির ঝঙ্কারময়ী ভাষায় ও তেজোময়ী ভাবে আমাদের জড়প্রায় নির্জ্জীব হৃদয়ে যে অনন্ত একতার শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। যে দেশের স্ত্রীলোকের লেখনীমুখে এমন লেখার উদ্ভব হয়, সে দেশ ধন্য। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে যে কয়েকখানি কবিতা পুস্তক আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছে "স্বদেশিনী" তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার অধিকারিণী।

অকিঞ্চনের নিবেদন—মূল্য ৵০ দুই আনা ; ২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, জয়ন্তী-প্রেস হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকে লেখকের নাম নাই ; কিন্তু তিনি 'অকিঞ্চন'নাম গ্রহণ করিলেও আমাদের পরম আরাধ্য ব্যক্তি। 'নিবেদন' বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। স্বদেশসম্বন্ধে অল্পের মধ্যে এরূপ প্রাণস্পর্শী ভাবের সমাবেশ আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই। কি করিলে দেশের প্রকৃত উপকার হয় তাহা লেখক বিশিষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বদেশবাসী-মাত্রেরই এবং বিশেষতঃ যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলন লইয়া "ক্ষেপিয়াছেন" তাঁহাদের শুনিবার ও ভাবিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ স্বদেশসেবায় নিয়োজিত হইবে এবং সেই ভার ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্তের উপর অর্পিত হইয়াছে। আশা করি আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ প্রত্যেকেই পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করেন এবং দেশের কণামাত্রও উপকার করিতে ব্রতী হয়েন।

—o—

গান।

ভৈরবী।

তোর কোলে, আর তোর ধূলে,
জন্মেছি আমি ধন্য তাই!
ধন্য আমি, তোর শ্মশানে
হবরে হবরে হবরে ছাই!

পিয়ে বাঁচলেম তোর স্তনের দুধ,
খেয়ে মানুষ তোর ঘরের খুদ ;
হউক তুচ্ছ, হউক উচ্চ,
ভুলি নাই, তা ভুলি নাই!

বিভুঁই বিদেশ ঘুরে-ফিরে
আমি যখন তোর কুটীরে,
তোরই ছায়ায়, তোরই মায়ায়,
মন ভুলাই আর প্রাণ জুড়াই!

তোরই বায়ু, তোরই জল,
তোরই আলো, তোরই ফল,
তোরই ভাব, তোরই ভাষা
জনমে জনমে যেন পাই!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

প্রার্থনা।

দুঃখং সুখং বা গণয়ামি নাহং
ন জীবনং বা মরণং ন বাপি।
বিশ্বেশ! মে মাতৃভুবো হিতায়
মৃত্যুর্যদি স্যাদমৃতং তদেব ॥ ১ ॥

সুখ দুঃখ কিছু যেন না করি গণন,
না ভাবি যেন হে নাথ! জীবন মরণ;
বিশ্বনাথ! মাতৃভূমি-মঙ্গল-সাধনে
মৃত্যুকে অমৃত জ্ঞান করি যেন মনে। ১।

শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং
কর্ত্তুং প্রিয়ং জন্মভুবঃ প্রযচ্ছ।
জ্ঞানং চ মহ্যং জগদীশ! দেহি
কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ ॥ ২ ॥

জন্মভূমি-প্রিয় কার্য্য সাধিতে কেবল
হৃদে দাও ভক্তি মোর দেহে দাও বল;
ত্রুটি যেন নাহি ঘটে কর্ত্তব্য-পালনে,
সেই জ্ঞান ভগবান্! চাহি ও চরণে। ২।

নবং নবং মে ব্যসনং ভবেঽস্মিন্
স্বদেশ-ভক্তিং সুদৃঢ়ীকরোতু।
দুঃখানি মে দেশহিতায় নাথ!
যথৈব পুষ্পাণি পতন্তু মূর্দ্ধ্নি ॥ ৩ ॥

এ সংসারে নিত্য নিত্য নূতন নূতন
আপদ বিপদ কত আসে অগণন;
সে সকলে কভু আমি না হ'য়ে কাতর,
স্বদেশেই ভক্তি যেন করি দৃঢ়তর;
সমস্ত বিপদ নাথ! স্বদেশ-সেবায়
পুষ্পবৃষ্টি সম যেন ধরি হে! মাথায়। ৩।

পুণ্যপূর্ণমশোকং চ দেশং শান্তিময়ং বিভো ! ।
ত্বয়ি লীয়ে যথা পশ্যন্ করুণাং কুরু মে তথা ॥ ৪ ॥

পুণ্যপূর্ণ শোকশূন্য শান্তির আধার
হেরি যেন বিশ্বনাথ ! স্বদেশ আমার ;
অন্তিমে তোমারি পদে পাই যেন স্থান,
হেন দয়া এ সন্তানে কর ভগবান্ ! । ৪ ।

অন্তর্দ্রোহানলৈর্দগ্ধং ভারতং প্রলয়োন্মুখম্ ।
দত্ত্বা শান্তিসুধাধারাং বিশ্বজীবন ! জীবয় ॥ ৫ ॥

ভাই ভাই ঘরাঘরি বিচ্ছেদ অনলে
ছারখার এ ভারত যায় রসাতলে ;
এ ভারতে শান্তি-সুধা করি' বরিষণ,
নব প্রাণ কর দান হে বিশ্বজীবন ! । ৫ ।

ত্বং বিশ্বমাতা করুণানিধানং
পদাশ্রিতাঃ পুত্রগণা বয়ং তে ।
মাতা কুপুত্রে বিমুখী ভবেৎ কিং
হে পাপিনাং তারক ! রক্ষ রক্ষ ॥ ৬ ॥

জগতজননী তুমি করুণানিধান,
তোমারি আশ্রিত মোরা তোমারি সন্তান ;
কুপুত্র বলিয়া মাতা করে কি বর্জ্জন ?
রক্ষ রক্ষ এ ভারত পাতকিতারণ ! । ৬ ।

অভিন্নমারাধ্যতমং মমাস্তাং
দ্বয়ং বিভো ! ত্বং মম জন্মভূশ্চ ।
প্রাণা যথা জন্মভুবো হিতায়
গচ্ছন্ত্যমী দেহি বরং তথা মে ॥ ৭ ॥

তুমি আর জন্মভূমি—এ দু'টী আমার—
হউক অভিন্নভাবে আরাধ্যের সার ;
জন্মভূমি-হিতে যেন দিতে পারি প্রাণ,
এই বর ভগবান্ ! কর মোরে দান । ৭ ।

পরাধীনান্ মগ্নানতিবিপুলদুঃখাম্বুধিজলে
বলক্ষীণান্ হীনান্ সকলসুখসৌভাগ্যনিচয়ৈঃ।
কৃপাসিন্ধো! নাথ! ত্রিভুবনগুরো! ভারতজনান্
সকৃদ্দীনানেতান্ প্রতি বিতর কারুণ্যকণিকাম্ ॥ ৮ ॥

অতল দুর্গতিসিন্ধু-সলিলে মগন,
নাহি অন্ন নাহি বস্ত্র সহায়-সাধন;
নাহি সুখ নাহি শান্তি, অশ্রুমাত্র সার,
পরাধীন দীনহীন ক্ষীণ শবাকার;
কৃপাসিন্ধু! বিশ্বপতি! পতিততারণ!
এ ভারতে শান্তি-সুধা কর বিতরণ। ৮।

ক্ষয়িতসকলবাধঃ শাশ্বতোৎসাহবহ্নিঃ
জ্বলতু হৃদি জনানাং জন্মভূভূতিযজ্ঞে।
ব্রজতু স সফলত্বং সর্ব্বসর্ব্বস্বদানৈঃ
শিবময়! কৃপয়া তে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরস্য ॥ ৯ ॥

জন্মভূমি-হিত-যজ্ঞে উৎসাহ-অনল
জ্বলুক দহিয়া বিঘ্নবিপত্তি সকল;
বিধূম নির্ব্বাণশূন্য সে পুণ্য অনলে
সর্ব্বস্ব আহুতি দান করুক সকলে;
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি! ওহে শিবময়!
তোমার কৃপায় যজ্ঞ যেন পূর্ণ হয়। ৯।

দশনধৃততৃণোঽহং প্রার্থয়ে ভ্রাতৃবন্ধূন্
স্বহৃদয়রুধিরৌঘৈঃ ক্ষালয়িত্বাত্মবৈরম্।
পতিতশরণমীশং বজ্রবদ্ধারয়ন্তো
নিপতিতপরমার্থং সংহতিং সাধয়ধ্বম্ ॥ ১০ ॥

যে যেখানে আছ ওহে ভাই-বন্ধুগণ!
দন্তে তৃণ ধরি' করি এই নিবেদন;—
নিজ নিজ হৃদয়ের রক্তধারা দিয়া
ভ্রাতৃদ্রোহ পাপপঙ্ক ফেলহ ধুইয়া;

বজ্রসম দৃঢ়ভাবে করিয়া ধারণ
পতিততারণ সেই বিভুর চরণ ;
পতিত জাতির গতি পরমার্থ ধন—
জাতীয় একতা সবে করহ সাধন। ১০।

আবালবৃদ্ধবনিতাখিলভারতীয়া—
আয়াত্বভিন্নহৃদয়াঃ সমমেব সর্ব্বে।
সোদর্য্যসখ্যমিলিতা জননীমখেঽস্মিন্
আত্মানমেব হি বয়ং বলিমুৎসৃজাম ॥ ১১।

নর-নারী যেবা আছ ভারত-সন্তান,
বাল-বৃদ্ধ-যুবা এস ! হ'য়ে সমপ্রাণ ;
(এ মা তো আমারি নয় অথবা তোমারি,
জন্মভূমি এ ধরণী জননী সবারি ;)
আমরা সোদর-প্রেমে হ'য়ে গলাগলি,
মাতৃযজ্ঞে সবে মেলি দিব আত্মবলি। ১১।

গঙ্গা হিমাদ্রিকুহরাদিব ধূতপাপা
ভক্তিঃ স্বজন্মভুবি শাশ্বতপুণ্যপূর্ণা।
বাধা বিধূয় রভসাপি গিরিপ্রমাণাঃ
প্রত্যেকলোকহৃদয়াৎ প্রবহত্বজস্রম্ ॥ ১২ ॥

ভেদিয়া হিমাদ্রি-গুহা অনিবার্য্য-গতি—
পতিতপাবনী গঙ্গা বহিছে যেমতি,
তেমতি শাশ্বত পুণ্যে ধরা পবিত্রিয়া,
পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা বিচূর্ণ করিয়া,
বহুক স্বদেশ-ভক্তি ভারত-ধরায়,
প্রত্যেক হৃদয় হৈতে অজস্র ধারায়। ১২।

* ॥ শিবমস্তু ওঁ তৎসৎ ॥ *

আমাদের একমাত্র উপায়।

[২]

সকল দেশেই মধ্যবিত্ত লোক সমগ্র জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ। মধ্যবিত্ত লোকের উপরেই দেশের মঙ্গলামঙ্গল এবং উন্নতিঅধোগতির সম্বন্ধে চিন্তার ও ভাবনার ভার থাকে। তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীর লোকের পথপ্রদর্শক এবং উপরস্থ শ্রেণীর সাহায্যকারী। ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত লোকই ভারতের জীবন। কি বাঙ্গালা, কি পশ্চিমোত্তর, কি বোম্বাই, কি মান্দ্রাজ সকল প্রদেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই দেশের সর্ব্বসাধারণের সম্পর্কীয় অধিকাংশ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু-শাসনকালে, মুসলমান-শাসনকালে, এমন কি কোম্পানীর শাসনকালেও ভারতের মধ্যশ্রেণীর লোকই ভারতকে জীবিত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সেই মধ্যশ্রেণীর লোকের বর্ত্তমান অবস্থা কি? ইহা কেহই ভাল করিয়া দেখেন না। যে কেহ হউক একটু দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ভারতের মধ্যশ্রেণীর লোকের ধ্বংসকাল অতি সন্নিকট। সহরে, বাজারে ধোয়া-কাপড় পরা, জামাওয়ালা, জুতাপায়ে এবং অনেক ছাতাওয়ালা মধ্যবিত্ত লোক দেখা যায় বটে; কিন্তু ভারতবর্ষে সহর বাজার কয়টী? ভারত একটী মহাপ্রদেশ এবং সেই মহাপ্রদেশ প্রায় সমস্তই পল্লীগ্রাম-সম্ভূত! বলিতে গেলে পল্লীগ্রাম লইয়াই ভারত। ভারতের শিরা-ধমনী সবই পল্লীগ্রাম, আর মধ্যবিত্ত লোকই সেই কোটী কোটী পল্লীগ্রামের জীবনস্বরূপ ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে আপনারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কি লক্ষ্য করিয়া থাকেন? যে সমস্ত পল্লী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ ছিল, বঙ্গদেশে যে সকল গ্রামে শত সহস্র ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থপরিবার সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় বাস করিতেন, যে সকল গ্রামে দোলদুর্গোৎসব ইত্যাদি পূজাপার্ব্বণের ঘটাতে হুলস্থূল বাধিয়া যাইত, যে সকল গ্রামে আমোদআহ্লাদ গানবাজনার ধূমে সমস্ত লোক প্রথম রাত্রিভাগে পুলকিত থাকিত, সে সকল গ্রামের অবস্থা এখন কি? তাহা সমস্তই প্রায় শ্মশানতুল্য হইয়াছে। যেখানে ৫০০ ঘর ভদ্রলোক ছিলেন, সেখানে কেবল কুড়ি ঘর আছেন, ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আর গ্রামের অবশিষ্ট বাসস্থান বনজঙ্গলে আবৃত হইয়া ব্যাঘ্র-শৃগালাদির আবাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। ধনী ও সমৃদ্ধিশালী পরিবার সকল যে সমস্ত অট্টালিকায় বাস করিতেন, তাহাও ভগ্নাবশেষ এবং জঙ্গলাবৃত হইয়া

মনুষ্যের অগম্য হইয়াছে। ৫০০ ঘরের মধ্যে যেখানে ২০।২৫ ঘর ভদ্র পরিবার আছেন, তাহার মধ্যেও বাছাই করিতে গেলে, দেখা যায় যে, অনেক স্থলে কেবল একটী বিধবা বা দুই চারিটী বিধবা ও দুই চারিটী শিশু সন্তান পরিবারের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

তবে এই বর্ণনা সহর কিম্বা সহরের নিকটস্থ পল্লী সম্বন্ধে ঠিক খাটে না বটে, সহরে ধোয়া-কাপড়জামা পরা, ছাতাজুতাওয়ালা অনেক মধ্যবিত্ত লোক দেখা যায় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদেরও প্রকৃত আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি? যে কিছু চাকচিক্য তাহা বাহিরে, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই অন্তর অন্নচিন্তায় জর্জ্জরিত। তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই মুখে হাসি দেখিতে পাওয়া যায়। কিসে পরিবারের পোষণ হইবে, এই চিন্তায় প্রায় সকলেই দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। সেই পুরাতন ধর্ম্মভাব, সেই পুরাতন চিত্তের প্রশস্ততা ও শান্তি এক্ষণে দুর্লভ বস্তু হইয়াছে। এই দুরবস্থার মূল কারণ কি, ইহা আলোচনা করা সকলের কর্ত্তব্য। ইহার স্থূল কারণ বাহির করিবার জন্য বিশেষ খুঁজিতে হয় না। একটু দৃষ্টি করিলে এই কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত লোকের এ দুর্দ্দশার কারণ এই,—চাষী লোকের টাকাকড়ির আয় পূর্ব্ব হইতে কাল-সহকারে বৃদ্ধি হইয়াছে; শ্রমজীবি-লোকের আয়ও এইরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে। যে চাষী পূর্ব্বে একটী টাকার মুখ দেখে নাই, তাহার হস্তে হয়ত এখন দশ টাকা আসিতেছে। যে শ্রমজীবির পূর্ব্বে মাসিক বেতন এক টাকা ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহার মাসিক বেতন হয়ত সাত টাকা হইয়াছে। ইহাদের এইরূপে টাকাকড়ি বৃদ্ধি হওয়ার জন্য প্রকৃত বস্তুগত সম্পত্তি যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নহে। ইহারাও প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইয়াছে। এ বিষয়েরও তত্ত্ব এস্থলে বুঝাইয়া বলা সহজ নয়; সুতরাং তাহার বিচার করিতেছি না; কিন্তু ইহাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা দেখুন। মধ্যবিত্ত লোকের আয় কোন বস্তুগত ধনের সহিত সম্পর্ক রাখে না। তাহা চিরকালই টাকাকড়ির আকারে হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোকের আয় (Fixed in money) টাকার আকারে সীমাবদ্ধ। ধরুন কোন একটী ভদ্র পরিবার দশ বিঘা জমীর অধিকারী, তাঁহারা পূর্ব্বেও হয়ত চাষীর নিকট সেই জমীর জন্য দশ টাকা খাজনা পাইতেন, এখনও নূন্যাধিক সেই দশ টাকাই প্রাপ্ত হয়েন। মান্ধাতার আমলে অথবা

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে যে দশ টাকা ছিল, এখনও ন্যূনাধিক সেই দশ টাকাই আছে, হয়ত মেরে-কেটে দুই এক টাকার বৃদ্ধি হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় কেরাণী বাবুদের যে কুড়ি টাকা কি পঞ্চাশ টাকা মাহিনা ছিল, এক্ষণে পরবর্ত্তীদিগের দুই একটী পদের মাহিনা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলেও সাধারণতঃ সেই কুড়ি টাকা কি পঞ্চাশ টাকার বেশী পাওয়ার পন্থা নাই। কিন্তু পূর্ব্বে দশ টাকায় যে পরিমাণ চাউল, তৈল, দুগ্ধ, মৎস্য, তরকারী পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহার দশ ভাগেরও একভাগ পাওয়া দায়। পূর্ব্বে পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া আরও উদ্বৃত্ত টাকা থাকিত, তাহাতে পূজাপার্ব্বণ এবং আতিথ্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মও নির্ব্বাহ হইত; কিন্তু এক্ষণে তাহাতে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ হওয়াই কঠিন। ইহার উপর আবার অনেক নূতন খরচের আবশ্যক হইয়াছে। ছেলেদের শিক্ষার খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, কন্যাদায়ের ত কথাই নাই। পথ-খরচের বাব (Item) ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে মধ্যবিত্ত লোক কিরূপে টিকে? চাউল, তৈল, মাছ, শাক, দুগ্ধ, ঘৃত সকলেরই মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে; শিক্ষা খরচ, বিবাহের খরচ, পোষাক-পরিচ্ছদের খরচ পূর্ব্বকালের অপেক্ষা অনেকগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের গরীব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, যাঁহারা গ্রামের কর্ত্তা ছিলেন, নিকটস্থ সকলের নিকট 'বাবু' ছিলেন, এখনকার দিনে কিরূপে তাঁহারা এই সকল আবশ্যকীয় বর্দ্ধিতহারের খরচ চালাইয়া সমস্ত পরিবারের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন? ইহার উপর আর একটী ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে দেশে জলকষ্ট ছিল না; এক্ষণে ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত। পল্লীগ্রামের লোকের সাধ্য নাই যে, পুরাতন দীঘি-পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইয়া ভাল জলের সংস্থান করে; সুতরাং পচা জল ব্যবহার করিতে হইতেছে এবং তজ্জন্য ভীষণ ম্যালেরিয়ায় নিত্য উৎপীড়িত হইতেছে। এ অবস্থায় মধ্যবিত্ত লোকের ধ্বংস হওয়া ব্যতীত আর গতি কি? এক্ষণে বোধ হয় পাঠক পরিষ্কার বুঝিবেন, মধ্যবিত্ত লোকের দুরবস্থার প্রধান কারণ এই যে টাকার মূল্য ভয়ানক কম হইয়া গিয়াছে। ইহাকেই Depreciation of money বলা যায়। যে টাকায় হয়ত দেড় মণ চাউল পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহাতে হয়ত আট সের মাত্র পাওয়া যায়; যে টাকায় পূর্ব্বে এক মণ দুগ্ধ পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহাতে ৫ সের পাওয়া যায় না অথচ দেশের সেই গরীব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পকেটে পূর্ব্বে যে পাঁচ টাকা ছিল, এক্ষণে সেই পাঁচ

টাকাই আছে; কিন্তু পূর্ব্বে একটী দোয়ানীতে যে কাজ হইত, এক্ষণে এক টাকায় সে কাজ হয় না; সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকের ধ্বংসকাল উপস্থিত।

এক্ষণে দেখা যাক্ টাকার মূল্য এত কমিল কেন? ইহা কাহারও কার্য্যবশতঃ হইয়াছে কি না? ইহা যে মনুষ্যের কার্য্যবশতঃ তাহার কোনও সন্দেহ নাই, ইহা কোন দৈব কারণবশতঃ নয়। টাকার মূল্য হ্রাস কিসে হয়, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, রাজনৈতিক অর্থতত্ত্বের (Political economy) দুই একটী কথার আবশ্যক। দেশে যে পরিমাণ পণ্য দ্রব্য থাকে অর্থাৎ বিক্রেয় জিনিষ থাকে এবং দেশের বাজারে যে পরিমাণ টাকাকড়ি অর্থাৎ করেন্সি সঞ্চালিত থাকে, এই দু'য়ের পরস্পর তুলনায় জিনিষের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণীত হয়। মনে করুন যে, কোন এক দেশে লক্ষ মণ চাউল আছে এবং চাউলই সেই দেশের একমাত্র পণ্য দ্রব্য; আবার মনে করুন সেই দেশে এক লক্ষ টাকা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়োজিত আছে। এ অবস্থায় এক মণ চাউলের মূল্য এক টাকা হইবে; কিন্তু যদি ওই এক লক্ষ মণ চাউলের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মণ চাউল কেহ দস্যুবৃত্তি দ্বারা অন্য দেশে লইয়া যায়। তবে ঐ দেশে কেবল পঞ্চাশ হাজার মণ চাউল থাকিবে অথচ এক লক্ষ টাকাই রহিল। ইহা দ্বারা এক মণ চাউলের দাম দ্বিগুণ হইয়া দুই টাকা হইল। ইহারই নাম Depreciation of money অর্থাৎ টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ার এক প্রকার কারণ। ইহা ব্যতীত টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ার অন্যপ্রকার কারণও আছে; তাহা এইরূপ,—যদি দেশের শাসনকর্ত্তা দেশে যত টাকা আছে, তত টাকার করেন্সি নোট চালান; তাহা হইলে ওই দেশে করেন্সির পরিমাণ দ্বিগুণ হইল অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা হইল। ইহাতে এক মণ চাউলের দাম এক টাকা স্থলে দুই টাকা হইল।

পাঠকগণ ইহাতে দেখিলেন যে কোন দেশের জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির একটী কারণ অস্বাভাবিক ভাবে সেই পণ্য দ্রব্য অন্য দেশ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া এবং অপর কারণ দেশের করেন্সির অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সম্পাদনের মধ্যবিদ্ বস্তুর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি করণ। আমাদের দেশে মূল্যবৃদ্ধির এই দু'টী কারণই ঘটিয়াছে। প্রতি বৎসর আমাদের দেশে যে ধান্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহা দেশে থাকিলে কখনই ধান্যাদির মূল্য এত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। আমাদের উৎপন্ন ধান্যাদির মধ্য হইতে রাশি রাশি ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের প্রাপ্য পরিশোধ জন্য ইংলণ্ডাদি দেশে পাঠাইতে হয়; অর্থাৎ যাহাকে drain

বলে তাহাই দুর্মূল্যের একটী প্রধান কারণ। দ্বিতীয় প্রকারের কারণটীও প্রবলরূপে এদেশে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করাইতেছে। দেশের করেন্সি অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সাধনের মধ্যবিদ্ বস্তু অতি অল্প অংশই দেশী লোকের হাতে অথচ সেই করেন্সির পরিমাণ নানা কারণে বৃদ্ধি হইয়াছে। করেন্সি নোট একটি প্রধান কারণ, প্রমিসরী নোট আর একটী কারণ, বিদেশীয় মূলধন বদ্দারা বিদেশীয়গণ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন, তাহাও একটী কারণ। ইহাতে এই হইতেছে যে, যে স্থলে আমাদের দেশে হয়ত একলক্ষ টাকা থাকিত, তাহার পরিবর্ত্তে দশ লক্ষ টাকা বেশী চালিত হইতেছে অথচ সেই এক মণ বিক্রেয় দ্রব্য থাকিতেছে; আবার প্রথমোক্ত কারণে সেই একলক্ষ মণ বিক্রেয় দ্রব্যও থাকিতেছে না—পঞ্চাশ হাজার মণ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং একদিকে পঞ্চাশ হাজার মণ জিনিষ এবং অপর দিকে দশ লক্ষ টাকা। ইহাতে অস্বাভাবিকরূপে জিনিষের মূল্য কুড়ি গুণ বৃদ্ধি হইতেছে। অন্যান্য স্বাধীনদেশে স্বাভাবিকরূপে করেন্সি বাড়িয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে দেশের লোকের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। স্বাভাবিকরূপে করেন্সি অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সাধনের মধ্যবিদ্ বস্তু বৃদ্ধি হইলে, জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু তেমনি প্রত্যেক লোকের পকেটে টাকাও বৃদ্ধি হয়। আমাদের অবস্থা এই যে করেন্সি বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু আমাদের পকেটে যাহা ছিল তাহাই রহিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল; গভর্মেণ্ট দর্প করিয়া বলিয়াছিলেন আমরা টেক্স্ বৃদ্ধি করি নাই অথচ আমাদের ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ; কিন্তু করেন্সি নোট ও প্রমিসরী নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায়, লোকের পকেটের টাকার সারত্ব 'ডাইনে খাওয়ার' মত কমিয়া যাইতেছে অর্থাৎ করেন্সি নোট ইত্যাদি দ্বারা দেশের ক্রয়-বিক্রয়ের Medium (ক্রয় বিক্রয় সম্পাদনের মধ্যবিদ্ বস্তু) যেই বৃদ্ধি হইবে মনে করুন দ্বিগুণ হইবে অমনি আমাদের পকেটের টাকার মূল্য আধাআধি হইয়া যাইবে। ইহাতে টেক্স্ লওয়ার কম হইল কি? করেন্সি নোট বিষয়ে গভর্মেণ্ট পক্ষেও দুই চারিটী কথা বলিবার আছে গভর্মেণ্ট রৌপ্য ইত্যাদি মজুদ রাখার কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু এই সকল কথার উত্তরও আছে। তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত বিষয় নহে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত লোকের দুরবস্থা বর্ণন করা, এমন কি মধ্যবিত্ত লোকের ধ্বংস যে অতি সন্নিকট তাহাই দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; বোধ হয়, তাহা বিশদরূপে দেখান হইয়াছে।

ফলে মধ্যবিত্ত লোক এই দুরবস্থা হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারেন, যদি তাঁহারা শরীর খাটাইয়া দেশের পণ্যদ্রব্য বৃদ্ধি করেন অর্থাৎ এই বর্ত্তমান স্বদেশী ব্যাপার যাহাতে আমাদের মধ্যবিৎ লোকেরা মনোনিবেশ করিতেছেন, তাহার চালনা করাই তাঁহাদের একমাত্র উপায়। বিলাতে চল্লিশ হাজার লোকের কাজকর্ম্ম নাই বলিয়া তাহাদের অন্নকষ্ট হইতেছে, ইহা লইয়া তথায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, অথচ এদেশে সমস্ত মধ্য-বিত্ত লোকের কোন কাজকর্ম্ম নাই এবং তাঁহারা অন্নকষ্ট ভোগ করিতেছেন; ইহা লইয়া গভমেণ্ট একটী কথাও বলেন না। এতদিন গভর্মেণ্ট হইতে দুই চারিটী চাকরী পাওয়া যাইত এবং সেই দুই চারিটী চাকরীর জন্য অসংখ্য মধ্যবিত্তলোক মানসম্ভ্রম, ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লালায়িত হইতেন; কিন্তু গভর্মেণ্ট চাকরীর দরজাও ক্রমে রুদ্ধ করিতেছেন আর দুই চারিটী চাকরী দিলেই বা কি? মধ্যবিত্ত লোকশ্রেণী যদি অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাহেন, তবে তাহার একমাত্র উপায়—এই স্বদেশী ব্যাপারে মনপ্রাণ সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা; আর অন্য কিছুই উপায় নাই। এই বিটিশ শাসনকালে নান্যেব গতিরন্যথা।

শ্রীকিশোরীলাল সরকার।

একান্নভুক্ত পরিবার।

একান্নভুক্ত পরিবার আর এদেশে টেঁকে না—বিলাতি সভ্যতার ঝড়ে উহার স্তম্ভগুলি ধসিয়া পড়িয়াছে,—এই প্রাচীন প্রথার এখন ধ্বংস-শেষ মাত্র আছে।

এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। পূর্ব্বে পিসি, মাসী, পিসতুত ভাই, মাসতুত ভাই, পিতার মামাত ভাই প্রভৃতি নানা বিচিত্র সম্পর্কযুক্ত লোকগুলি এক জায়গায় মাথা গুঁজিয়া পরস্পরের শিরোচর্ব্বণ করিত বা কি করিত ভগবানই বলিতে পারেন; কেহ হয়ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিত, কথাটী বলিতে পারিত না,—বউগুলি ত ঘরে গুমরিয়া মরিত এবং ত্রিসন্ধ্যা অকথ্য গালাগালি হজম করিয়া পোষা গরুর মত হইয়া গিয়াছিল। এইত হিন্দুর একান্নভুক্ত পরিবারের সুখ! নিজের স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা বলিতে হইলে, রাতদুপহরের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইত, দাম্পত্য-মিলন যেন একটা মহাপাতকের বিষয়! স্বামী দিনের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিয়াছে—এই সংবাদে সমস্ত পল্লীর

লোক দাঁতে জীব কাটিত এবং নিজেরা যে কত সতর্ক তাহার বাহাদুরী করিতে ছাড়িত না। আর কি এসকল কুপ্রথা চালাইতে পারিবেন?—নব্য হিন্দু মহাশয়, আর কি ভ্রাতার গোলাম হইয়া তাঁহার প্রদত্ত ভাত মুখে তুলিতে রুচি হইবে? যত বড় টিকিই রাখুন না কেন মহাশয়, একান্নভুক্ত পরিবার এদেশ হইতে গিয়াছে, বিলাতি সভ্যতার আলো ঘরে ঘরে ঢুকিয়াছে, এ আলোতে সেই প্রাচীন অন্ধতা আর আনিতে পারিবেন না!

পূর্ব্বেকার লোকগুলি কি এতই নিরেট মূর্খ ছিল যে, স্ত্রীকে লইয়া যে প্রকৃত গৃহস্থালী এ কথাটা তাহারা বুঝিত না? দাম্পত্য রস যে সকল রসের সার· ইহার আস্বাদ কি তাহারা পায় নাই?—এই রস এত স্বাভাবিক যে সে কালের বিবাহিত ব্যক্তিগণ ইহা বুঝেন নাই, তাহাই বা বলি কিরূপে? অথচ যেরূপ বহু অনাবশ্যক বাহুল্য, গলগ্রহ ও আবর্জ্জনা জোটাইয়া তাহারা দাম্পত্য রসটি কণ্টকিত এবং এরূপ বিঘ্নবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা উহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলাও শক্ত।

আপনারা যাহাই মনে করুন না কেন, আমার সরল বিশ্বাস—সেই অতি অধম, আধুনিক সভ্যতায় ধিকৃত একান্নভুক্ত পরিবার-প্রথা পুনশ্চ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নতুবা আমরা বিনাশপ্রাপ্ত হইব। সেকেলে লোকেরা যে আমোদ বুঝিত না,—একথা বলা ভুল; আমোদ বুঝিতে না পারে, এমন বর্ব্বর নাই। ইন্দ্রিয়গুলি ত সর্ব্বদা মানুষকে সেই দিকেই টানিতেছে, বরং যে আমোদ উপেক্ষা করিয়া সংযত হইতে পারে, সেই বাহাদুর। দাম্পত্য সুখকে প্রাধান্য দিয়া অন্য কর্ত্তব্যগুলি হিন্দু খাটো করে নাই—এজন্য হিন্দু বর্ব্বর নহে, হিন্দু সুসভ্য।

হিন্দু যে কারণে শত শত বৎসর যাবৎ এই একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথা যত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে,—সেই কারণগুলি এখনও সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই; বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তি যতই মনে করুন না কেন,যে দেশের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, এই ভারতবর্ষ—এই মহাদেশ প্রাচীন ভাব হইতে এখনও এক তিলও নড়ে নাই;—সেই প্রাচীন ভাবের মূল বহু সহস্র বৎসর এই দেশের গভীরতম প্রদেশে প্রোথিত রহিয়াছে,—তাহা নাড়িতে পারে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সে শক্তি নাই। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন তাহা পত্রপল্লবের। ডগার একটী কচি পাতা হাওয়ায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তরুর মূল নড়ান বড় শক্ত কথা—এবং তাহা সর্ব্বদাই

কল্যাণের কথা নহে; কারণ মূলে বিচলিত হইলে তরু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

আমরা যে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে বাস করিতেছি, তাহা বিরাট বিটপীর ন্যায় আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছে—তাহার কোন একটী ডাল ভাঙ্গিলেই, চমকিয়া উঠিবার কথা নাই। সংস্কারক কুঠার হস্তে ছেদন করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিবেন, তিনি স্বয়ং ফাঁকা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত,—বহুলোক চিরদিনের আশ্রয় ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে ফাঁকা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইবে না।

একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথা যদি শুধু ব্রাহ্মণগণের একটা খেয়ালের সৃষ্টি হইত, তবে কবে ইহা উড়িয়া যাইত—ইহার চিহ্নমাত্রও থাকিত না; কিন্তু ইহার একটা গুরুতর সার্থকতা আছে—যাহার জন্য এই প্রথা ধ্বংস হইলে তৎসঙ্গে হিন্দুজাতির ধ্বংসমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

অন্যদেশে বোর্ডিং ও হাঁসপাতালের বিপুল অনুষ্ঠান নানা বিষয়ে সার্থক। বড় বড় আমীরওমরাহের ছেলেরাও পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে থাকিতে কোনই অসুবিধা বোধ করে না, বোর্ডিংগুলি গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করিয়া থাকে। সে সকল স্থানে গৃহটী শুধুই আমোদের জন্য। পীড়ার সময় হাঁসপাতাল,—দুঃখের সময়ের জন্য গৃহ মনে পড়ে না, হাঁসপাতালের শয্যাই অবলম্বনীয় হয়। সুতরাং দাম্পত্য সুখের অনাবিল প্রবাহ সুস্থ শরীরে ভোগ করিবার জন্যই গৃহ—উহা তাহাদের সুখের নিলয়।

আমাদের দেশে সেরূপ হাঁসপাতাল বা বোর্ডিং গৃহের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, যে বিপুল অর্থব্যয়ে উহা হওয়া সম্ভবপর, এ দরিদ্র দেশ তাহা কখনই সংকুলান করিতে পারিবে না,—পারিলেও যে পীড়িত শিশুটিকে ধরিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবে, এদেশের লোকের সে প্রকার রুচি হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই অবস্থায় পিসি, মাসী, ভাই ভগ্নীদিগকে তাড়াইয়া দম্পতী যে গৃহে বাস করিবেন, তাহা বিলাতি আদর্শ রক্ষা করিতে পারিবে না। শিশুদিগের এবং নিজের ব্যাধি হইলে, সেই গৃহখানিই আশ্রয়স্থল থাকিবে। এখন যে ব্যক্তির আয় ২৫।৩০ টাকা, তাহার স্ত্রীর অসুখ করিলে, একটী আট টাকা মাহিয়ানার রাঁধুনীর সন্ধান তাহাকে করিতে হইবে,—একা সে নিজে আফিসে যাইবে না স্ত্রীর শুশ্রূষা করিবে? পীড়া দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, সে ব্যক্তির বিপদের পরিমাণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ইহার পর শিশুদের অসুখ হইলে,

তাহার কি বিপদ তাহাও কল্পনা করা যায়। যদি সে ধার করিয়া অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক লোকজন নিযুক্ত করিয়া গৃহের ভার অর্পণ করে, তবুও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না; যেহেতু বেতনভুক্ ব্যক্তির হস্তে স্ত্রী-পুত্রের শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিয়া এই দেশে কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

বিলাতের গৃহের পশ্চাতে তাহার এক বিপুল আশ্রয় আছে—তাহা হাঁসপাতাল, অনাথাশ্রম প্রভৃতি। আমাদের সে আশ্রয় নাই, কিন্তু অপর একরূপ আশ্রয় আছে, তাহা আত্মীয়অন্তরঙ্গদের নিঃস্বার্থ প্রেম; তাহাদের সেই বহু-ব্যয়-সাধ্য সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, গৃহটী শুধু দাম্পত্যাগারের মত পোষাকী জিনিষ করিয়া রাখিলে আমাদের চলিবে না,—তাহার প্রসার আরও বাড়াইতে হইবে, তাহাতে আটপৌরে অনেক জিনিষের সংগ্রহ করিতে হইবে। একান্নভুক্ত পরিবারের যে সকল সুবিধা, তাহা দূর করিয়া ফেলিলে, আমরা প্রধান আশ্রয়চ্যুত হইব। অন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান না করিলে আমরা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিব না। নানাপ্রকার পীড়া দুঃখ ও কষ্টময় সংসার,—এই কষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগের স্বজনবর্গের সঙ্গে একত্র থাকাই সুবিধাজনক—অতি অল্প ব্যয়ে সেরূপ নিঃস্বার্থ সেবা, সেরূপ অমিত সহায় আর কোথা হইতে পাইব? দরিদ্র ভারতবর্ষে একান্নভুক্ত পরিবার সভ্যতার একটা চরম সমস্যা পূরণ করিয়াছে। যে শৃঙ্খলা, সংযম ও বশ্যতার দ্বারা বহু গোষ্ঠী একত্র থাকিতে পারে, য়ুরোপের তাহা শিক্ষা করিতে বহুযুগ দরকার হইবে, কারণ তথায় দম্পতিই একত্র টিঁকিতে পারে না—ছুতা ধরিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন পূর্ব্বক দণ্ডে দণ্ডে আদালতে হাজির হয়।

তাহাদের গৃহের অভাব পূরণ করিবার জন্য বহু অনুষ্ঠান আছে,—বিপদের দিনে দুঃখের দিনে তাহারা অনাথাশ্রম হাঁসপাতাল প্রভৃতির জন্য হাঁফাইয়া উঠে,—আমাদের প্রাণ কিন্তু সকল দুঃখের সময়ই গৃহের জন্য হাঁফাইয়া উঠে সেই গৃহ শুধু দম্পতির সুখ-ভোগের জন্য কল্পিত হইলে দুঃখের সময় তাহারা দাঁড়াইবে কোথায়? শুধু পেটভাতে খাইয়া কে আর তাহার শিশুটিকে সারা রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিবে? কে শুধু পেটভাতে খাইয়া ঝগড়ার সময় তাহার জন্য প্রাণ দিতে দাঁড়াইবে, ভাল খাবার, ভাল পরিবার জিনিষ দেখিলে ছুটিয়া যাইয়া তাহার জন্য মাথায় বহন করিয়া আনিবে? নিঃস্বার্থ প্রীতিভক্তিই এ সমাজের প্রধান অবলম্বন, তাহাই নির্ভর করিয়া হিন্দুর গৃহস্থালী

দাঁড়াইয়া আছে, তাহা বিচ্যুত হইলে তাহার অস্তিত্ব আকাশ-কুসুমের মত হইয়া পড়িবে।

এতগুলি লোক একত্র থাকে কি করিয়া? তাহার উত্তরের জন্য বেশী দূরে যাইতে হইবে না,—তাহা এককালে ভারতবর্ষ বিশেষরূপে জানিত; ধর্ম্মের বলই গৃহস্থালীকে সুশৃঙ্খল ও সংযত রাখিয়াছে। এই ধর্ম্ম-বন্ধনের নিকট দূর-আত্মীয়ও স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা পড়িত। এখন যাহা বড় কষ্টকর মনে হইতেছে, তাহা স্বেচ্ছায়,হেলায় ও সুখের সহিত লোকেরা বহন করিত, তজ্জন্য কুমীরের মত কষ্টের ভাণ করিয়া চক্ষের জল না ফেলিলেও চলিতে পারে। সেই ধর্ম্ম দাম্পত্যকে লালসার মুখ হইতে দূরে একটা পবিত্র স্থানে স্থির রাখিত,—গৃহস্থালীর কর্ত্তার আদর্শ ভোলানাথ শিব, এবং কর্ত্রীর আদর্শ অন্নপূর্ণা, সেখানে কোথাকার নন্দী ভৃঙ্গী জুটিয়া কার্ত্তিক গণেশের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া এক-থালায় খাইত, কর্ত্তার কুবের ভাণ্ডারী থাকিলেও তিনি বৈরাগ্যের ধূলিভস্ম গায় মাখিয়া অন্তরঙ্গ স্বগণের রক্ষার জন্য বিষ কণ্ঠগত করিয়া ডমরু বাজাইয়া নাচিতেন—তাঁহার পরম আনন্দের কণাপাতে গৃহস্থালী উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, এবং কর্ত্রী অন্নপূর্ণা তাঁহার পারিবারিক বিশ্বের নিমিত্ত পরমান্নের ব্যবস্থা করিয়া অপরাহ্নে স্বয়ং শাকান্ন খাইয়া যে মধুর হাসি হাসিতেন, তাহাতে বিশ্বের সকলে তাঁহার পদনখরের প্রভায় প্রাণমন বিকাইয়া ফেলিত।

এই ধর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিয়া দাম্পত্য-রস নামক দিল্লীর লাড্ডুর লোভে পতিত হইলে, দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, অনেক কথা ফৌজদারী আদালত ভিন্ন সহজে মীমাংসিত হইবে না এবং প্রতিবেশীরা অবিরত টিটকারী দিতে থাকিবে।

এখন একান্নভুক্ত পরিবার অনেকস্থলে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের জাতিকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে হইলে ধীরে ধীরে পুনশ্চ এক অন্নসত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—এই মুহূর্ত্তেই আমার জানা আছে, কোন কোন পাশ্চাত্য সভ্যতা-ভক্ত ও দাম্পত্যরস-দীক্ষিত পণ্ডিত বিদেশে নিজের স্ত্রীকে আনিয়া ব্যাধি ও অপরাপর যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া পিসি মাসীকে আনিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন; একা গৃহস্থালী করা এদেশে অসম্ভব, বহু অর্থ থাকিলেও বা তাহা কতকপরিমাণে সম্ভবপর হইতে পারে, রাজা মহারাজার পক্ষে অনেক প্রকার কল্পিত সুবিধার সৃষ্টি করা সহজ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তাহা আকাশকুসুম; অতি অল্পব্যয়ে স্নেহের দ্বারা সমস্ত অভাব উৎকৃষ্ট

রূপে পূরণ-পূর্ব্বক দরিদ্র গৃহস্থের গৃহস্থালী এদেশে বহু সহস্র বৎসর যাবৎ নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই পন্থা ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

যুরোপকে আমরা যতই নকল করি না কেন, সে নকল আসল হইতে বহুদূরবর্ত্তী থাকিবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের মালমসলা কিছুই নাই, শুধু বক্তৃতাবাজি আছে—তাহা দিয়া কি কখন দেশ উদ্ধার হয়?—সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধেও তাহাদের আসবাব পত্র আমাদের কিছুই নাই, অথচ আমাদের বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত পরম আশ্রয়ের নিকেতন একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব,—এ অবদার চলিবে কেন? নিজের স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া যখন সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে একা আর পথ দেখিতে পাইবে না—তখন ভাই ভাগিনেয় প্রভৃতি সকলের শরণ লইতে হইবে, এবং তাহারা গণ্ড মূর্খ হইলেও তাহাদের মন জোগাইতে চেষ্টা করিতে হইবে,—সমদর্শন নামক মন্ত্রবলে মূর্খ, পণ্ডিত, কোপন ও ভীরু সকলে এক গৃহে ধরা দিবে এবং গৃহস্থালীতে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও শান্তি আনয়ন করিবে,—বিলাতি সভ্যতা এই সমস্যা ভেদ করিবার উপায় কিছুমাত্র জানে না, কিন্তু এদেশের প্রত্যেক লোকই ভিতরে ভিতরে সেই মন্ত্রটী অবগত আছে যদিও অনেক সময় সে যাহা জানে, তাহার সন্ধান না রাখিয়া বিলাতি পণ্ডিতের নীতি আওড়াইয়া বাহাদুরী লইতে চাহে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ঘুঘু। *

১

হারে বধূ-ঘাতকিনি পুরাণ কালের
সকরুণ মর্ম্মভেদী ওই কণ্ঠস্বর—
অভিশপ্ত সে কাহিনী তব ললাটের
জাগায়ে তুলিছে মোর হৃদে নিরন্তর!

---

* পুরাকালে এক গৃহিনী ছিলেন। শারদীয় মহোৎসবের সময় তিনি তাঁহার কন্যা ও একমাত্র পুত্রবধূকে "তিল" বাছিতে নিযুক্ত করেন। তিল বাছা হইলে পক্ষপাতদুষ্টা গৃহিণীর মনে হইল বধূর বাছা তিল পরিমানে কম; তাহাতে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। নিকটে একখণ্ড শীলা ছিল, তাহার আঘাতে সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা নিরপরাধা বধূকে নিহত করিলেন। প্রতিবেশীনিরা আসিয়া দেখাইয়া দিল, বধূর বাছা তিল কমে নাই।

পুত্র আসিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিল ও স্বীয় জননীকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিল

২

কর্ম্মশীলা সত্যনিষ্ঠ-চিত্তবিমোহিনী
গৃহলক্ষ্মী বধূ ;—তারে করিলি হনন
কি ছার 'তিলের' তরে—হা পক্ষপাতিনি
শিলার নিষ্ঠুরাঘাতে নাশিলি জীবন !

৩

সন্তানের অভিশাপে তাই আজি তোর
হেন দশা ! পুণ্যবতী জননী গৃহিণী
আছিলি সংসার মাঝে, সে সুখের ওর
নাহি ছিল, আর আজ তুই বিহঙ্গিনী !

৪

অমঙ্গলা, পরিত্যক্তা, বিষাদবিধুরা ;—
গৃহস্থ আবাস-ভূমে নাহি তোর স্থান,
পোড়ো বাড়ী, বৃক্ষশাখা, হায়রে নিঠুরা
এবে তোরে করিতেছে আশ্রয় প্রদান !

৫

কতকাল ধরি কত যুগ যুগান্তর
আজো তবু প্রায়শ্চিত্ত হ'লনা প্রচুর ;
বিহঙ্গিনি, তাই ডাক ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর ;—
উঠ চিত, উঠ চিত—পূর পূর পূর !

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

"বিনাপরাধে বধূকে হত্যা করার জন্য তোমাকে জন্ম জন্ম ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; পক্ষী জন্ম হইবে। বধূর শোণিত তিল তিল ছিটার মত তোমার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া থাকিবে। গৃহস্থের ঘরে তুমি অমঙ্গলা, অলক্ষণা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বধূর নাম তোমাকে সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া অনুতাপ করিতে হইবে।" বধূর নাম ছিল চিত্রাবতী, প্রতিবেশীনিরা দেখাইয়া দিয়াছিল বধূর বাছা তিলের পরিমাণ ভরপুর ; তাই কবিতাটীর শেষ ছত্রে লিখিত "উঠ চিত, উঠ চিত, পুর, পুর, পুর !" ঘুঘুর সকরুণ কণ্ঠধ্বনি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। লেখক

কৌলীন্য ও সমাজ।

"আচারোবিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।"

ইহাই কুলীনের লক্ষণ; এবং এই গুণগুলি থাকিলেই কুলীন হওয়ার নিয়ম বা প্রথা ছিল। যিনি উল্লিখিত নয়টী গুণসম্পন্ন ছিলেন, মহাত্মা বল্লাল তাঁহাকেই "কুলীন" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি ঐ সকল গুণের মধ্যে দু-একটী গুণে হীন ছিলেন, তিনি কুলীন উপাধিভূষণে ভূষিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে 'মৌলিক' থাকিতে হইয়াছে এবং ঐ মত এখন পর্য্যন্তও সমাজে ষোল আনা প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। যে সকল গুণ দেখিয়া কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখন—আজ কালকার দিনে কি তাহা দেখিতে পাওয়া যায়? আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে, এখনকার দিনে ঐ নবগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আদৌ নাই। যদি না থাকে, তবে আমরা কেমন করিয়া কুলের বড়াই করি? কেহ কি আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন যে, আচারাদি-গুণসম্পন্ন পুরুষ-প্রবর এখনও বঙ্গে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই! কৌলীন্যাভিমানিন্! একবার বুকে হাত দিয়া পরম পিতার নাম লইয়া বলত ভাই! তুমি কি এখনও কুলীন রহিয়াছ? উল্লিখিত নবগুণের কোন গুণই তোমাতে ঊণ হয় নাই? যদি সাহস করিয়া বলিতে পার, তবে আমরাও সাহস সহকারে শতবার বলিব কৌলীন্য বজায় থাকুক; এবং ইহাও বলিব যে, কৌলীন্য আমাদের মুখোজ্জ্বল ও মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিতেছে। আর যদি তাহা না হয়, তবে বৃথা বাহাদুরী লইবার প্রয়োজন দেখি না—ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অকারণে লোক ঠকাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না—মুখে মধু অন্তরে হলাহল পোষণ করিবার কোনই আবশ্যকতা অনুভব করি না; আর অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করাইবার চেষ্টা অথবা কার্য্যতঃ তদ্রূপ করাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় বটে!

যাহা নয় তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা অথবা লোক ভুলাইয়া—অপরের চক্ষে ধূলি দিয়া কুলীন বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করা বড়ই নিন্দনীয়, বড়ই দোষাবহ, বড়ই বিবেক-বিরুদ্ধ; আমাদের আচারাদি বহুদিন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, বহুদিন হইতে আমরা নবগুণহীন হইয়া পড়িয়াছি, সুচির কাল হইতে আমরা বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া সাজিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বার্থ-

সিদ্ধি করিয়া আসিতেছি এবং সেই জন্যই অভ্যাস বশে এখন আর "কুলীন" আখ্যা ভুলিতে পারিতেছি না। এককালে বেচারা মৌলিকের উপর যে আধিপত্য করিয়াছিলাম, এখন তাহাই অক্ষুণ্ণ রাখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া কুলীনত্বের মুখোস লাগাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

সত্য বটে, সে কালের মুনি-ঋষিগণ কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন ও কুলীন-করে কন্যা দান করাকেই প্রশস্ত ও বিধেয় মনে করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের ন্যায় নাম মাত্র সম্বল কুলীনকে তাঁহারা কুলীন বলিতেন? না গ্রাহ্য করিতেন? কৌলীন্য সম্পন্ন পুরুষের সহযোগে তাঁহাদের কন্যাগণও আচারাদি বিভূষিতা হইতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহারা কুলীন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করতঃ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন-জনিত বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—

"যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতী সমুদ্রেণেব নিম্নগা।

অর্থাৎ নদী যেমন অর্ণব সহযোগে লবণাক্ততা প্রাপ্ত হয়, তেমনি স্ত্রী যেরূপ পুরুষের সহিত সম্মিলিত হয়, তদ্রূপ গুণবিশিষ্টা হইয়া থাকে। এই রূপ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই, তাঁহারা কুলীন-করে কন্যা দান করিতেন; আমাদের ন্যায় অর্থ-গৃধ্নুতা ও স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা কন্যা বা পুত্রের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত করিতেন না; সুতবাং সে কালে ও একালে স্বর্গ মর্ত্ত্য তফাৎ দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমাদের স্বর্গ নরক পার্থক্য! এ সকল দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়াও সমাজ অন্ধের ন্যায়, বধিরের ন্যায়, মূকের ন্যায়, পশুর ন্যায় কার্য্য করিয়া পাপের স্রোত বর্দ্ধিত করিতেছে। হায় কাল! হায় সমাজ!! হায় স্বার্থলুব্ধ মদোন্মত্ত আমরা!!!

যিনি সর্ব্ব প্রথম কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক—যিনি সর্ব্ব প্রথম গুণবানের গুণের সম্মান রক্ষা করিবার পন্থার সৃষ্টিকারক, সেই মহারাজ বল্লাল সেন কি বলিয়াছেন যে, কুলীননন্দন অকুলীন না হইয়া কুলীনই হইবে? গুণবান না হইলেও গুণবানের সম্মান লাভ করিতে পারিবে? ঢাল না লইয়া—তলোয়ার না লইয়া নিধিরাম সর্দ্দার সাজিয়া বীরের মর্য্যাদালাভ করিতে পারিবে? নয়টী গুণের একটীও যাহার নাই—কুলীনাখ্যাধারীর ঔরসজাত ভিন্ন কুলীনের কুল-গন্ধ পর্য্যন্ত যাহার শরীরে নাই, কোন্ বেদ, কোন্ পুরাণ, কোন্ শাস্ত্র তাহাকে কুলীন বলিতে উপদেশ দিয়াছে, আমাদিগকে

কি কেহ তাহা বলিয়া দিতে পারেন? অথবা অন্য কোন রাজা, মহারাজ ঈদৃশ কুলীনকুলপাবনকে কৌলীন্য দিতে সমুৎসুক, কেহ কি তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন? আমরা বলি, কুলীন উপাধিধারীর ঔরসজাত এই সার্টি-ফিকেট মাত্র সার করিয়া যাহারা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার শোণিতরাশি শোষণ করিতে সচেষ্টিত, তাহারা যে কোন্ শ্রেণীর জীব, অভিধান তাহার নির্ণয় করিতে অক্ষম।

"খালি হাঁড়ির শব্দ বেশী" এই প্রবাদ বাক্য এখন আমাদের উপর বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। আমাদের এখন জাতীয়ত্ব আছে বলিতে কিছুই নাই; আমাদের অস্তিত্বের অনুসন্ধান হওয়াও সুকঠিন; সুতরাং আমরা কেমন করিয়া, কোন্ সাহসে, কোন্ বিবেক বলে, আপনাদিগকে কুলীনের উচ্চ আসনে সমাসীন করাইতে, কুলীনের মর্য্যাদালাভ করাইতে, কুলীনের খ্যাতি প্রতিপত্তির অধিকার লাভ করাইতে ব্যতিব্যস্ত, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। আমরা কৌলীন্যের শোভনসুন্দর উচ্চগ্রাম হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে এইরূপ ন্যক্কারজনক নিরয়ে নিমগ্ন হইয়াছি, একবার ভ্রমেও তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। ভ্রমেও একবার সমাজ কু-লীন কুলীনের সর্ব্বগুণ হীনতারূপ কলঙ্ককালিমা হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দেন না। সকলেই এক-পথাবলম্বী, এক-মতাবলম্বী হইতে পারে, সেই জন্যই সমাজের উচ্চবাচ্য নাই, সাড়াশব্দ নাই, চিরদিনের জন্য মোহের, স্বার্থলোভের চির-তমসাচ্ছন্ন আবিলতা পূর্ণ সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ।

স্বার্থপরতাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; কুলীনকুলের আত্মাভিমানই দেশের মৌলিকবর্গের সহস্র নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। অন্ধ সমাজ চক্ষু চাহিবার অপারকতা নিবন্ধন ধীর, স্থির, অচল অটল নির্ব্বাক্ ভাবে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে; তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংহারকীট প্রবেশ করিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে উৎসন্নের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা সে দেখিতে পাইতেছে না। ভগবান! আমাদের এই পাপ চক্ষু কি উন্মীলিত হইবে না? আমরা কুলীনকুল কি চিরদিনই সমাজের বক্ষে প্রেতের অভিনয় করিব! যে সমাজে এমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্মবহির্ভূত ন্যায়ের অননুমোদিত বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হইতে পারে, সে সমাজের অস্তিত্ব থাকা অপেক্ষা না থাকাই সকলেরই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। সামাজিকগণ! একবার সমাজের অধোগতির বিষয় চিন্তা করুন; কৌলীন্যাভিমানিগণ! একবার

সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তার বিষয়ীভূত করিবার অবসর অনুসন্ধান করুন; সমাজের লোক যথাকথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হউক।

উন্মুক্ত-দ্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাসের কল্যাণে আজ কাল কৌলীন্য-মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা আবশ্যকানুযায়ী নহে। তাহাতে যতটুকু উপকার আনয়ন করিতেছে, সে টুকু ধনবান অথবা মান্যমানগণের নিকট ব্যয়িত হইতেছে; সুতরাং সাধারণের নিকট সে সুবিধা-টুকু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, তাহা অদৃশ্য হইয়া পড়ে, কাজেই গরীবেরা তাহার উপসত্ত্ব উপভোগ করিবার সুবিধা বা অবসর পায় না। বর্ত্তমানে সমাজের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, কুলীন কুলমর্য্যাদার স্রোত যেরূপ বর্দ্ধিত, বরকর্ত্তার পণ-গ্রহণরূপ পৈশাচিক বৃত্তির যেরূপ প্রসারতা; বরের বাজার যেরূপ দুর্মূল্যতা দোষে দূষিত, তাহাতে আর ভদ্রস্থতা নাই। লোকে একবারে জীর্ণ, শীর্ণ, অবসন্ন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে। তদুপরি আবার অসার কৌলীন্যের কঠিনতর প্রাণহর চাপ থাকায় অচিরে যে সমাজ-শরীর ক্ষত বিক্ষত চূর্ণ বিচূর্ণিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ মাত্র নাই। সেই জন্যই আজ আমাদের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য নামমাত্রঅবলম্বী কুলীন-কুলসর্ব্বস্বগণকে তারস্বরে কাতর-কণ্ঠে বলি, মহোদয়গণ! আর অনর্থকরী কৌলীনের বড়াই করিবেন না; আর অকারণে কৌলীন্যের আস্ফালন করিয়া ধর্ম্মকে ও সমাজকে কলুষ-কলঙ্কিত করিবেন না! কৌলীন্যের ধুয়া ধরিয়া আর সমাজকে উৎসন্নের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দিবেন না। একবার প্রাণ খুলিয়া চক্ষু মেলিয়া সমাজের বিভীষণ দুরবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন! কন্যার বিবাহে পণ-গ্রহণ মহাপাপে সমাজ কিরূপ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে, সামাজিকগণ পণ-প্রথার কঠিন আলানে সমাবদ্ধ হইয়া কিরূপ মর্ম্মভেদী কাতর চিৎকারে হৃদয়বানের হৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করিতেছে! এই সকল সমাজানিষ্টকর বিষয়ের প্রতিকারকল্পে দণ্ডায়মান হইবার—পণপ্রথার অবাধগতির অপ্রতিহত তেজ প্রশমিত করিবার—মানব-সমাজকে দানব-সমাজে পরিণত না করাই-বার জন্য, যদি কাহারও প্রাণ না টলে, মন না গলে, তাহা হইলে, এবম্বিধ পাশবিক অত্যাচার-জর্জ্জরিত, প্রাণহীন, শোণিতশূন্য সমাজের নিদারুণ বক্ষে অশনিসম্পাত হউক।

কন্যার বিবাহে পিতৃকুল দুর্ভাবনায় কিরূপ আকুল, অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপারে কিরূপ মর্ম্মাহত, অল্প টাকায় বর জুটাইবার জন্য কিরূপ মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায়

অস্থির হইয়া পড়িতেছেন তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ-স্বনামধন্য-আসুরিক ব্যাপার। এই জ্বালায় জ্বলিতেছেন, সকলেই, কিন্তু কাহারও চেতনা নাই। একে কাঁদে অপরে হাঁসে; যে সমাজের নির্ম্মম বক্ষে এমন সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর নিত্য লীলা সে সমাজের ভদ্রস্থতা কোথায়? যে সমাজে পুত্র-কন্যা ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্য প্রত্যেক সংসার পাপ-বিপণিতে পরিণত, সে সমাজে মানুষ নাই! মানুষ নাই!! মানুষ নাই!!! সে সমাজ নির্দ্দয়তার নিত্য-নিকেতন—পাপের প্রেত-পুরী—অধর্ম্মের লীলাস্থল! হায় সামাজিকগণ! চক্ষু থাকেত একবার চাহিয়া দেখ, চিন্তাশক্তি থাকেত সমাজের এই দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া পণ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে সচেষ্ট হও।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী

অরণ্য।

ঘনশ্যাম পত্রাচ্ছন্ন হে অরণ্য ভূমি!
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি,
নির্ব্বাক নিস্পন্দ নহ, নও মৌন ম্লান
তোমার সঙ্গীতে মুগ্ধ কর্কশ পাষাণ।
তোমার মাধুরী দেখি নিত্যই নূতন
নিতি নিতি পর তুমি নব আভরণ,
নব কিশলয় মাঝে বসিয়া পাপিয়া
অশ্রান্ত অতৃপ্ত স্বর সদা বরষিয়া,
আনি দেয় নব ভাব—সজীব সচল
সুধীর সমীরে দুলে তোমার অঞ্চল।
ফল তব সুধামাখা, ছায়া স্নেহময়,
স্বাধীনতা দাও তুমি, তুমিই আশ্রয়!
পত্রের মর্ম্মরে তব কি মহা সঙ্গীত
কিবা উদ্বোধন বাণী—বচন অতীত।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুহূর্ত্তের তরে।

সেই একদিন নাথ মুহূর্ত্তের তরে,
স্মরণ করিয়াছিলে দাসী,
দেখিনু তোমারি ছবি প্রসন্ন অম্বরে,
জলে স্থলে ওই রূপরাশি!
দেখিনু তোমার রূপ অন্তরে বাহিরে,
ভাবিনু কি ল'য়ে ছিনু ভোর,
এতদিন সুখ দুঃখ মিছা খেলা লয়ে
বৃথায় জীবন গেছে মোর!

সেই একদিন নাথ মুহূর্ত্তের তরে,
সে মুহূর্ত্ত কত সাধনার;—
হেরিনু তোমারি ছবি অন্তরে বাহিরে,
অন্তরের অন্তরে আমার!
কি আনন্দ উথলিল প্লাবিয়া জগত,
এ ধরণী সুখ-নিকেতন,
মনে হল জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে
আজি মোর সার্থক জীবন!

শ্রীসরলাবালা দাসী।

কালো মেয়ে।

(১)

রামকানাই বসু রাইপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। জমাজমি যাহা আছে, তাহার আয়ে সংসার চলিয়া যায়, বৎসরান্তে কালীপূজার খরচও জমির আয় হইতেই চলে। তাহা ছাড়া বসুজার লগ্নী কারবারও আছে. তাহাতেও বিলক্ষণ দশটাকা আয়; সুতরাং গ্রামের মধ্যে বসু মহাশয়েরা দশজনের একজন।

রামকানাই বসু ইংরাজী লেখাপড়া জানেন না; অল্প বয়সে সামান্য কিতাবতি লেখা পড়া শেষ করিয়াই হরিপুরের বাবুদের জমিদারী-সরকারে প্রথমে তিনি তহসিলদার হন, ক্রমে ক্রমে প্রমোশন পাইয়া নবাবগঞ্জ পরগণার নায়েব পর্য্যন্তও হন। শেষ-বয়সে আর চাকুরী ভাল না লাগায়, বসু মহাশয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া বসেন।

সংসারে স্ত্রী ও একটী পুত্র ব্যতীত রামকানাইয়ের আর কেহ ছিল না। নায়েবী করিয়া যাহা সংস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে সংসার বেশই চলিত।

ছেলের নাম হরিপদ। রামকানাই নিজে ভাল লেখাপড়া জানিতেন না; এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও ছেলেটিকে মানুষ করিবেন।

যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেই যদি ছেলে মানুষ হইত, তাহা হইলে অনেক বড়মানুষের ঔরসজাত ছেলেগুলি এতদিনে মানুষ হইয়া যাইত। হরিপদের শিক্ষার জন্য রামকানাই যথাসর্ব্বস্ব না হউক, যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু নবাবগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সহিত হরিপদের এমন মিত্রতা হইয়াছিল যে, সে চারি বৎসরেও সে শ্রেণীর উপরে যাইতে পারিল না—চারি বৎসর পরে বোধ হয়, মনোমালিন্য হওয়ায় হরিপদ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী হইতে একেবারে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিপদ যে কোন বিদ্যাই শেখে নাই, তাহা বলিতে পারি না। আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মা সরস্বতীর আরাধনা করিয়া সে ঐ নিষ্ঠুরা দেবীর প্রসাদ-লাভে যদিও বঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু দেবীরও পূজনীয় কৈলাসনাথের অনুচর-গণের মধ্যে স্থানলাভ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা সে পাইয়াছিল। প্রথমে হরিপদ সিদ্ধির ক্লাশে ভর্ত্তি হইল, (তখন সিগারেট দেশে চলে নাই), তিন মাস না যাইতেই সে গাঁজার ক্লাশে প্রমোশন পাইল। তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যেই সে সরকারী আবকারী বিভাগের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় নবাবগঞ্জের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর সহিত তাহার মিত্রতা যে দূর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

বাপমায়ের এক মাত্র ছেলে, সুতরাং বাপ-মা প্রথম যখন হরিপদের শিক্ষানবিশীর অবস্থা জানিতে পারিলেন, তখন সে দিকে তেমন মনোযোগ করিলেন না;—ছেলেমানুষ বলিয়াই উড়াইয়া দিলেন। বয়স হইলে ও সব দোষ দূর হইবে! কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদের শিক্ষাও বাড়িতে লাগিল। শেষে যখন রামকানাই পুত্রকে শাসন করিতে গেলেন, তখন পুত্র হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ রামকানাইয়ের গৃহিণী যখন পুত্রের উপর পিতার তাড়না দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখন বেচারী রামকানাই একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন।

"আমার ঐ একই ছেলে, কত টাকাই উড়াইবে" বলিয়া গৃহিণী যখন মনকে প্রবোধ দিলেন, নবাবগঞ্জের জমিদারের নায়েব মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। মনের দুঃখে নায়েব মহাশয় ছেলেকে স্কুল ছাড়াইয়া এবং নিজেও চাকুরী ছাড়িয়া দেশে আসিলেন।

(২)

হরিপদের এখন বড়ই অসুবিধা। রাইগঞ্জ তেমন একটা সহর নহে,

সামান্য গ্রাম। সে গ্রামে বৃটিশ-রাজের গৌরব-বাহিনী মদের দোকান স্থাপিত হইবার কোনই সুবিধা হয় নাই। ছোট বাজার—সেখানে একখানি গাঁজা ও আফিনের দোকান ছাড়া দেশী বা বিলাতি মদের দোকান ছিল না; কাজেই শ্রীমান হরিপদ মদ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে গাঁজার মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল এবং আফিনের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। হরির মা ইহাতে আনন্দিত হইলেন। কর্ত্তাকে বলিলেন, "দেখেছ, ছেলে আমার ভাল হইয়াছে; মদের নেশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন ছেলের একটা বিবাহ দাও; তাহা হইলেই সামান্য যে একটু তাঁমাক খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহাও থাকিবে না।"

রামকানাই গৃহিণীর বাক্য চিরদিনই বেদবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, স্ত্রীর ভাগ্যেই তাঁহার অবস্থা এরূপ সচ্ছল হইয়াছে। এ হেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীর কোন আদেশ অবহেলা করা, হেলায় লক্ষ্মী হারাইবার মতই তিনি মনে করিতেন।

হরিপদের বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; কিন্তু যে সকল মেয়ের বাপের সামান্য একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁহারা কেহই রামকানাইয়ের জোত-জমা দেখিয়া ভুলিলেন না—ছেলের অতুলনীয় গুণরাশি দেখিয়াই তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। অবশেষে কানাইনগরের পশুপতি মিত্রের কন্যার সহিত হরি-পদের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পশুপতির অবস্থা বড়ই শোচনীয়; তিন চারিটী মেয়ে পার করিতে হইবে। ছেলের অত শত খুঁত দেখিলে কি তাহার চলে। বিশেষতঃ তাহার মেয়েগুলির শরীরের রংয়ের সহিত মসীর রংয়ের কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না; আজকালকার ছেলেরা কি সহজে এমন মেয়ে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। এই রকম সাত পাঁচ ভাবিয়াই পশুপতি বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। রামকানাই টাকাকড়ির জন্য বিশেষ আগ্রহ করিলেন না;—গৃহিণীর নিষেধ।

হাল ফেসানের ছেলে হইলেও হরিপদ স্বয়ং ক'নে দেখিতে গেল না—তাহার বিবাহে মোটেই মত ছিল না। অগত্যা যে কাজ করিতে হইতেছে, তাহাতে আর দেখা-শুনা কেন? যথাসময়ে হরিপদের সহিত পশুপতির মেয়ে উমাকালীর বিবাহ হইয়া গেল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

(৩)

বউ ঘরে আসিল, কিন্তু হরিপদ ঘরে মন দিল না। বধূর মসী-বিনিন্দিত

রং দেখিয়াই তাহার মন চটিয়া গেল। বাপ-মা যাহা মনে করিয়া তাড়াতাড়ি হরিপদের বিবাহ দিলেন, তাহার কিছুই হইল না; লাভের মধ্যে হরিপদ বাড়ীতে রাত্রিবাস ত্যাগ করিল। নিশাযাপনের জন্য সে অন্য ব্যবস্থা করিয়া লইল।

রামকানাই এবং তস্য গৃহিণী ইহাতে বড়ই চটিয়া গেলেন; কিন্তু সে চোটটা যেখানে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল, সেখানে না পড়িয়া অতি নির্দ্দোষী এক বেচারীর স্কন্ধে গিয়া পড়িল। তাঁহাদের যত রাগ সব ঐ অলক্ষ্ণে বউটীর উপর পড়িল। পশুপতির কন্যা নিতান্ত নাবালিকা ছিল না—উমাকালীর বয়স যখন কোষ্ঠীতে পনর বৎসর, তখনই পশুপতি তাহাকে 'এই সবে বারতে পা দিয়াছে' বলিয়া পার করিয়াছিল। স্বামী কি পদার্থ, তাহা উমাকালী বুঝিতে পারিয়াছিল। স্বামীর অনাদর ও অবজ্ঞা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিতে লাগিল। তাহার পর শ্বশুর শাশুড়ী যখন গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে বুঝিতে পারিল না - তাহার কি অপরাধ। তাহার চেহারা ভাল নহে --কিন্তু সেজন্য ত সে দায়ী নহে। কে যে দায়ী, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার পিতা যে কোন প্রকার প্রতারণা করিয়া তাহার মত কালো মেয়ে পার করিয়াছে, তাহাও ত সে বুঝিতে পারিল না। সে শুধু দেখে সকলেই তাহাকে তুচ্ছ করে। শাশুড়ী তাহাকে সকলের সমক্ষেই অলক্ষুণে বলিয়া গালি দেয়। সত্য সত্যই কি সে অলক্ষুণে! কিসে তাহার লক্ষণের অভাব হইল, অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা সে আবিষ্কার করিতে পারিল না।

উমাকালী বুঝিল, চির জীবন এই প্রকার দুঃখের বোঝা বহিয়াই তাহাকে জীবনযাপন করিতে হইবে। ইহা হইতেও অধিকতর দুঃখ যে তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, তাহা সে কখন মনেও ভাবিতে পারে নাই।

(৫)

একদিন কর্ত্তা-গিন্নীতে মহা বিবাদ উপস্থিত। বিবাদ বলিলে বোধ হয়, কথাটা ঠিক বলা হয় না; কারণ বিবাদে দুই পক্ষই কথা বলে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এক পক্ষ নীরব, ধীর, অতি সহিষ্ণু শ্রোতা; অপর পক্ষ বক্তা। গৃহিণী বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহিণীর প্রধান অভিযোগ কর্ত্তা চক্ষুহীন ব্যক্তি; তিনি অনেক দিন হইতেই মানুষের পরম ধন চক্ষু দুইটির মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছেন; নতুবা তিনি কেমন করিয়া দেখিয়া শুনিয়া এমন কালো

ভূত, অলক্ষুণে মেয়ের সঙ্গে তাঁহার সোনারচাঁদ হরিপদের সম্বন্ধ করিলেন। রামকানাই এ ক্ষেত্রে জবাব দিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না; সুতরাং গৃহিণীর বাক্যসুধা নীরবে পরিপাক করা ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না।

প্রচুর বাক্যসুধা বর্ষণের পর গৃহিণী প্রস্তাব করিলেন যে, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এ বৌটাকে বাপের বাড়ী চিরদিনের মত পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তিনি ভাল একটী মেয়ে দেখিয়া সোনারচাঁদের আবার বিবাহ দিন; তাহা হইলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। রামকানাই এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কি করেন।

এমন কথাটা গোপনে থাকিবার নহে; বিশেষতঃ কর্ত্তা-গৃহিণীও ইহা গোপন করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। কথাটা উমাকালীরও কর্ণে পৌঁছিল। সে এতদিন মনে করিয়াছিল, স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী যাহাই করুন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে কিছুতেই পারিবেন না। গৃহের সকলের স্নেহে বঞ্চিত হইয়াও সে আশা করিয়াছিল, এক মুষ্টি অন্নে বঞ্চিত হইবে না। তাহার পিতা অতি দরিদ্র ব্যক্তি, তাঁহার উপর বোঝা হইতে যাওয়া তাহার পক্ষে অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল।

একবার উমাকালী মনে করিল, স্বামীর পায়ে ধরিয়া নিষেধ করে। স্বামী একটা কেন দশটা বিবাহ করুন, কিন্তু এই বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিবার অধিকার তাহাকে প্রদান করা হউক। কথাটা মনে হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বার আর সে এ কথাটা ভাবিতে পারিল না। তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিবে, অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে, একথা মনে করিতেও তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এই অল্প বয়সেই ভগবান তাহাকে এত কষ্ট দিতেছেন কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? সমস্ত রাত্রি উমাকালী এই সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন্ তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, তাহাও সে জানিতে পারে নাই।

(৪)

উমাকালী যে ঘরে ঘুমাইতেছিল, সে ঘরে আর কেহ ছিল না। সে একেলা ভিজা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে হরিপদ সে রাত্রে একটু অধিক পরিমাণে গঞ্জিকা সেবন করিয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার রাত্রিবাসের স্থানে নানাপ্রকার উপদ্রব করায় গৃহস্বামিনী তাহাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল।

হাজার হুউক ভদ্রলোকের ছেলে। এই ভাবে অবমানিত, ও গৃহ-বহিষ্কৃত হওয়ায় তাহার গাঁজার নেশা যেন ছুটিয়া গেল। সে অন্যমনস্কভাবে শেষরাত্রিতে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। মনটা যেন আজ কেমন করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখে, সকল ঘরের দ্বারই ভিতর হইতে বন্ধ, কেবল মাত্র একখানি ঘরের দ্বার খোলা পড়িয়া আছে। হত-ভাগিনী উমাকালী সে দিন ঘরের দ্বার বন্ধ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল। হরিপদ মনে করিল, এই ঘরে গিয়াই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইবে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে, একপার্শ্বে একটি প্রদীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। খাটের উপর বিছানায় কেহই নাই। সে যখন সেই বিছানায় শয়ন করিতে যাইবে, তখন দেখে ভূমিশয্যায় উমাকালী শয়ন করিয়া আছে; তাহার কেশপাশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইল। এতদিন পরে একবার সেই কালো, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, অলক্ষুণে মেয়েটির মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিল। দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। গাঁজাখোর হরিপদ সেই কালো মুখখানিতে যেন স্বর্গের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিল। ছেলেবেলায় সে পূজা দেখিতে গেলে, লক্ষ্মীর মুখে যে শোভা সে দেখিত, আজ তাহার অবমানিতা পত্নীর মুখে সেই শোভা দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঐ কালো রূপে যেন ঘরখানি আলো হইয়া আছে; তাহার মনে হইল, ঐ কালোরূপ যেন স্বর্গের অমৃত চারিদিকে বর্ষণ করিতেছে;—তাহার মনে হইল—এমন সুন্দর মুখ—এমন পবিত্র দৃশ্য—এমন স্বর্গীয় মাধুরীমাখা শ্রী, সে কখন দেখে নাই। এত রূপ, এত পবিত্রতা যে মানুষে থাকিতে পারে, তাহা সে জানিত না।

হরিপদ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল; এক একবার উমা-কালীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আর তাহার প্রাণ যেন শীতল হইয়া যায়। তাহার মনে হইতে লাগিল, কি এক আশ্চর্য্য অমানুষিক শক্তির প্রভাবে তাহার মনের সমস্ত মলিনতা যেন কাটিয়া যাইতেছে, তাহার সমস্ত নেশা যেন ছুটিয়া যাইতেছে। সে এতদিন যে জগতে বাস করিতেছিল, কে যেন তাহাকে সে জগৎ হইতে তুলিয়া আর কোথায় লইয়া যাইতেছে। অলক্ষ্যে তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার

বিগত জীবনের কার্য্য সকল মনে হইয়া, তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর কি অন্যায় কার্য্যেই সে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল; ঘরে যাহার এমন দেবী প্রতিমা বিদ্যমান, সে কিনা তাহাকে ছাড়িয়া আবার বিবাহ করিতে যাইতেছিল। হরিপদ অনুতাপের তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল—কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময় উমাকালী ঘুমের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিল; জোড়হস্তে বলিল—"ও গো আমাকে তাড়াইয়া দিও না।"

হরিপদ আর স্থির থাকিতে পারিল না, পাষাণ গলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবারে আর বাধা মানিল না। সে পাগলের মত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "না উমা, কে তোমাকে তাড়ায়?"

মানুষের গলার শব্দ শুনিয়াই ভীতা হইয়া উমাকালী ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল; চাহিয়া দেখে তাহার শিয়রে তাহার জীবনের দেবতা, তাহার সাধনার ধন, তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরিপদ বসিয়া আছে। তাহার মুখে আর কথা সরিল না; সে মনে করিল, তখনও বুঝি সে স্বপ্ন দেখিতেছে। তাই সে আবার কাতরকণ্ঠে বলিল "ঠাকুর, আমার এ স্বপন ভাঙ্গিও না।"

হরিপদ তখন সেই অনাদৃতা দুঃখিনী পত্নীকে কোলে জড়াইয়া ধরিল; বলিল "না উমা, এ স্বপ্ন নহে। সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। আর তোমাকে ছাড়িয়া থাকিব না। তোমার মুখ দেখিয়া আমার নূতন জীবন লাভ হইল।" উমাকালী আর কিছুই বলিতে পারিল না—তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

প্রত্যুষের আর বিলম্ব ছিল না; গাছে গাছে পাখী গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পূর্ব্বের দিকে ঈষৎ আলোকের রেখা দিয়াছিল। সেই শুভমুহূর্ত্তে এই দুঃখতাপক্লিষ্ট সংসারের একটী ক্ষুদ্র গৃহে স্বর্গের পবিত্র কিরণ নামিয়া আসিয়াছিল।

এমন সময়ে গ্রামের জগা পাগলা সেই রাস্তা দিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,

"তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা মনোমোহিনী এলোকেশী।"

শ্রীজলধর সেন।

শিবাজী উৎসব।

মহা সমারোহে এই কলিকাতা সহরে মহারাষ্ট্র-কুলতিলক, বীর-সমাজের বরণীয় ছত্রপতি শ্রীশ্রীশিবাজী মহারাজের পুণ্য-নাম, অতুলনীয় কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া দুর্ব্বল বঙ্গবাসী তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল। এ দৃশ্য দেখিবার বটে! ইহা বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি সূচিত করিতেছে।

উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষগণ মহারাষ্ট্র দেশ হইতে স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত খাপার্দ্দে ও শ্রীযুক্ত মুঞ্জিকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। উৎসবক্ষেত্রে স্বদেশী মেলা বসিয়াছিল। শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী মাতার পূজা হইয়াছিল। কুস্তী, লাঠি-খেলা; পুতুলনাচ হইয়াছিল, আর হইয়াছিল বক্তৃতা।

আমরা এ উৎসবে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুই একজন স্বদেশ-প্রেমিকের, আরও দুই একজন স্বদেশ-হিতে উৎসর্গীকৃত-জীবন মহাপুরুষের নাম আমাদের স্মরণ-পথে উদিত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—সেই

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ,

মনে হইয়াছিল—সেই শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর কথা,—মনে হইয়াছিল—মহম্মদপুরের রায় সীতারাম রায়ের কথা। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী মহাবীরের স্মৃতির পূজা আমরা ত করি না। এই ত সেদিন এই কলিকাতা সহরের এক প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র গৃহে প্রতাপাদিত্যের উৎসব হইয়া গেল, এই সহরের অতি সামান্য দুই চারিজনই তাহা জানিতে পারিলেন। আর কেহ এই বাঙ্গালী বীরের কথা শুনিল না, তাঁহার পবিত্র উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। গত বৎসর মহম্মদপুরের জঙ্গলে কয়েকজন মফঃস্বলবাসী ভদ্র-লোকের আগ্রহেও উদ্যোগে সীতারামের উৎসব হইল, কিন্তু যাঁহারা আমাদের দেশে নেতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অতীত গৌরবের পবিত্র ক্ষেত্র সেই মহম্মদপুরের জঙ্গলে গেলেন না। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য চিন্তার বিষয় বটে!

শোক সংবাদ।

বাঙ্গালায় বিদ্যাবতী রমণীর সংখ্যা অতি বিরল, তায় গ্রন্থকর্ত্রীর সংখ্যা অতিমাত্র অল্প, সুলেখিকা নাই বলিলেই চলে। যা' দুই চারিজন আছেন, গত বৈশাখ মাসে আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের একজনকে হারাইয়াছি। ৺নগেন্দ্রবালা সরস্বতী গদ্য-রচনায়, কবিতা-রচনায় সাধারণের প্রীতি ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, বসন্তগাথা প্রভৃতি কোষ-কাব্যগুলি অনেকের আদরের বস্তু। তিনি হিন্দুশাস্ত্রে, হিন্দু-আচার-ব্যবহারে ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নারীনীতির একান্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। পতিদেবতার প্রতি তাঁহার ভক্তি তাঁহার লেখায় বেশ প্রকাশ পাইত। তিনি সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তফীর পত্নী এবং মুন্সেফ ৺নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ দুঃখানুভব করিতেছি।

বিদ্বান্ বহু পাওয়া যায়, পণ্ডিতও অনেক মিলে; কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট লোক বড় দুর্লভ। ইংরাজী শিক্ষার ফলে, সেরূপ 'মানুষ' আজকাল আমাদের মধ্যে অতি অল্পই জন্মিতেছেন। এরূপ স্থলে, ভগবানের একান্ত অনুগ্রহে যদি আমরা দুই চারিজন 'মানুষ' দেখিতে পাই, তবে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করি, তাহা বলিতে পারি না। আবার কালরূপী ভগবানের নিয়মে যদি সেরূপ দু-একজন মানুষকে হঠাৎ আমাদের মধ্যে হইতে অপসৃত হইতে দেখি, তবে আমাদের আর শোকের অবধি থাকে না। বর্ত্তমান মাসে অকালে আমরা এইরূপ একটি 'মানুষ' হারাইয়াছি। অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন এম্ এ, ৩৭ বৎসর বয়সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল বিদ্বান্ ছিলেন না, বিদ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তদ্ভিন্ন, তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র, অমায়িক, বিনয়নম্র এবং প্রীতিভাজন ব্যক্তি অল্পই দেখা যায়। তিনি তাঁহার বহুবিধ সদ্‌গুণে অনেকের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি।

রত্নমালা। *

"রত্নমালা" যথার্থই রত্নমালা। ইহা অপূর্ব্ব না হইলেও অমূল্য। 'অপূর্ব্ব নহে' এই জন্য বলিলাম যে, ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু এই ভাবে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া "হিন্দুধর্ম্মনীতি" নামক পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে তাহার সমালোচনা প্রসঙ্গে অনুক্ষণ স্মরণীয় সম্পাদক বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "সঙ্কলন-কর্ত্তা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এইখানি দৃষ্ট করিয়া আমরা যে পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, প্রার্থনা করি, গ্রন্থপ্রণেতা সর্ব্বদা সেই পরিমাণে সুখী হউন, * * এই সঙ্কলন যে বহু পরিশ্রমের ফল এবং নানাশাস্ত্র দর্শনোৎপন্ন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।" আমরা মধুসূদন বাবুর সম্বন্ধেও সেই উক্তি নিঃসঙ্কোচে প্রয়োগ করিতে পারি। রত্নমালার এই ১ম খণ্ড, কেবল রাজনীতি-সম্বন্ধীয় সদুপদেশ-রত্ন রামায়ণ, মহাভারত হইতে এবং মনু, অত্রি, বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা নিচয় হইতে সংগৃহীত ও গ্রথিত হইয়াছে। সঙ্কলনকর্ত্তা মধুসূদন বাবু যে বলিয়াছেন, "প্রাচীন মহর্ষিদিগের সদুপদেশ-রত্ন শাস্ত্ররূপ আকারে নানাস্থানে বিরাজিত রহিয়াছে, আমি কেবল যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সঙ্কলিত করিয়া এই "রত্নমালা" গ্রন্থন করিলাম, সুতরাং ইহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতীত অন্য কৃতিত্ব কিছুই নাই।" তাহা ঠিক নহে। কয়জন তাঁহার ন্যায় যত্ন ও পরিশ্রম করিতে পারিয়াছেন? ইহাতে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, হৃদয়বান বঙ্গবাসীমাত্রেরই হৃদয়ে তাহা চিরদিন গাঁথা থাকিবে। অধুনা অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা বিষ্ণুসংহিতা ও অন্যান্য সংহিতাগুলি পড়িতেছেন বটে, কিন্তু এই রত্নরাজি অধিকাংশের দৃষ্টিপথে আসে নাই, চিন্তার বিষয় হয় নাই। দেখিতে ও চিনিতে, বুঝিতে ও ভাবিতে কয়জন জানে? কয়জনের সে শক্তি আছে; কয়জনের সে হৃদয়ভরা অনুরাগ আছে? তাই বলিতেছি, ইহা মধুসূদন বাবুর কেবল যত্ন ও পরিশ্রম নহে, বিশেষ কৃতিত্ব। ইহাতে তাঁহার অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; প্রাচীন হিন্দুজাতির রাজনীতিজ্ঞান কত গভীর, কত বিশাল, কত সূক্ষ্ম, কিরূপ সর্ব্বতোমুখী ৪০৮ পৃষ্ঠা পরিমিত এই পুস্তকে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। সভ্যতাভিমানী ইংরাজ যে হিন্দুজাতিকে 'অর্দ্ধ সভ্য' বলিয়া জ্ঞান করেন; প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার নিকট তাঁহাদের সভ্যতা অর্দ্ধাপেক্ষা যে অনেক ন্যূন, প্রত্যুত নগণ্য, এই পুস্তকপাঠে তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইবে। ইংরাজগণ যে রাজনীতির, যে রাজ্যশাসন প্রণালীর, যে যুদ্ধবিদ্যার, যে দুর্গ নির্ম্মাণ-রক্ষা, ব্যবহারাদির এত গর্ব্ব করেন, প্রাচীন হিন্দুর সেই সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার, সেই সকল কার্য্যকুশলতার নিকট তৎসমুদায় যে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য—যেন প্রবীণ জ্ঞানী, বৃদ্ধের নিকট শিশুবৎ—তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। যে রাজনৈতিক অর্থবাদের (political economy) গৌরবে আজ তাঁহারা দিশাহারা, তাহা প্রাচীন ভারতে কত উৎকর্ষ লাভ

---

* রত্নমালা ১ম খণ্ড। অর্থাৎ রাজনীতি; শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

করিয়াছিল, তাঁহারা এই পুস্তকে তাহার ও যথেষ্ট নিদর্শন পাইবেন। বৈজ্ঞানিক যুদ্ধপ্রণালী-প্রবর্ত্তক ইউরোপ প্রাচীন ভারতের স্ববৈজ্ঞানিক যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। অহঙ্কৃত ইউরোপ প্রাচীন ভারতের দৌত্যকার্য্যে অনেক শিক্ষা পাইবেন। আশা করি, তাঁহাদের diplomacyর সহিত ভারতের দূত-ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখিবেন। সাক্ষ্য বিষয়ক বিধি (Evidence Act) যে পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক হইতে নবোদ্ভূত নহে, প্রাচীন ভারতে তাহাও যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা এই পুস্তক পাঠে প্রতীত হইবে। প্রাচীন ভারতের বিচার প্রণালী ও অধুনাতন সুসভ্য ইংরাজের বিচারপ্রণালী তুলনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। ইহাতে তাঁহাদের কত অনুকরণীয় বিষয় আছে, জানিতে পারিবেন আর ফৌজদারী বিচারপ্রণালী কোন্ কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুসভ্য ইংরাজ-শাসনকালে প্রাচীনকালের অঙ্গচ্ছেদনাদি কঠোর দণ্ড তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া, সঙ্কলনকর্ত্তা হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন, যে সুসভ্য ইংরাজের বিষম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবন যে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, অনেকে অকালে প্রাণ হারায়, তাহা প্রাচীনকালে অতি গুরুতর অপরাধে অপরাধী দু'চারিজনের অঙ্গচ্ছেদ দণ্ডাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক ও অধিকতর শোচনীয়? যে প্রাচীন হিন্দুর বিচার-প্রণালীতে স্বয়ং রাজারও দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তদপেক্ষা পূর্ণতর, নিরপেক্ষ দণ্ড-প্রণালী কখন কোন সভ্যজাতি কল্পনাও করিতে পারিবেন কি? ইংরাজরাজ হিন্দুদায়ভাগ ব্যবস্থামত বিষয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারিত্বের বিচার করিয়া থাকেন, সে ব্যবস্থানিচয় যে চূড়ান্ত সভ্যতার নিদর্শন, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অধুনা অদূরদর্শী বিচারকগণকর্ত্তৃক হিন্দুদায়ভাগ প্রণালীর স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম সংঘটন অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ সন্দেহ নাই; তাহা জাতীয় পক্ষপাতিতা ও হীন-নৈতিক আদর্শের পরিচয় মাত্র। পরিশেষে বক্তব্য মধুসূদন বাবুর "রত্নমালা" পুস্তক বাস্তবিকই মহামূল্য রত্নের মালা। এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়া তিনি অধঃপতিত হিন্দুজাতির গৌরব শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তাঁহারা যে অর্দ্ধশিক্ষিত ও হেয় নহে. তাঁহাদের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে যে সকল অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইতেছে, তাহা যে অত্যন্ত অন্যায় "রত্নমালা" গ্রন্থ তাহা প্রমাণ করিবে। কালমাহাত্ম্যে আজ হিন্দুর এই দুর্দ্দশা, কালপ্রভাবে হিন্দু বিজিত, নীতিভ্রষ্ট! কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে পদানত হিন্দু, বিজেতা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠকবর্গকে গ্রন্থের ভূমিকায় জ্ঞাপন করাইয়াছেন, "রত্নমালা" ২য় খণ্ডে সমাজনীতি ও ৩য় খণ্ডে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক সদুপদেশ রত্ন সংগ্রথিত হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। আমরা সেই রত্নলাভের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত রহিলাম। ভগবান অচিরে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করুন।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

জাহ্নবী।

হে জাহ্নবি! গীতধারে কবে তুমি বিষ্ণুর চরণে
জন্মিলা না জানি—শুধু অতীতের কাহিনী-দর্পণে,
সে শুভক্ষণের ছায়া বিরাজিছে ক্ষীণ স্মৃতি সম ;
কিন্তু যবে হেরি তব পূর্ণ মূর্ত্তি মর্ত্ত্যে পুণ্যতম,
মহান্ আবেগে মোর সমস্ত হৃদয় ভরি উঠে,
পুরাণের বার্ত্তা যত চিত্তপটে সমুজ্জ্বল ফুটে।
নারদের গীতধারা শুনিছেন বিষ্ণু, বিষ্ণুজায়া ;
বিষ্ণুপাদ দ্রবি' তুমি সত্য দেবি! লভিতেছ কায়া।

মর্ত্ত্যে জহ্নু ধ্যানমগ্ন—তারি তপে তুমি আত্মহারা
জহ্নু-তপোবনে বুঝি রোধেছিলে নিম্নমুখী ধারা!
ঘেরি' সেই তপস্বীরে দেখেছিলে বহুক্ষণ ধরি'
ভক্তিরসে আর্দ্র হিয়া বিস্ময়-পুলকে চিত্ত ভরি'।
বিলম্বে বাহিরি' পথে প্লাবিলা যে সারা বিশ্বভূমি
আজিকে সম্মুখে মোর সে জাহ্নবী দাঁড়াইয়া তুমি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দেশীয় অর্থশাস্ত্র এবং স্বদেশী আন্দোলন।

দেশীয় অর্থশাস্ত্রের আলোচনা বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তিভূমি হওয়া উচিত ; দুর্ভাগ্যক্রমে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপারে দেশীয় অর্থশাস্ত্রের কথাবার্ত্তা কম শুনা যায়। ইংরাজীতে যাহাকে Political economy বলে, তাহাকেই আমি দেশীয় অর্থশাস্ত্র নামে অভিহিত করিতেছি। Political economy*—এই ইংরাজী শব্দটী এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় উপযুক্তরূপে অনুবাদিত হয় নাই। কেহ কেহ এই শব্দটী রাজনৈতিক অর্থবাদশাস্ত্র বলিয়া

---

* সংস্কৃতে ইহাকে বার্ত্তাশাস্ত্র বলে। জাঃ সং।

অনুবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই অনুবাদে উক্ত বাক্যটীর ভাব ও অর্থ সম্পূর্ণরূপ ব্যক্ত হয় না; দেশীয় অর্থশাস্ত্র বলিলে বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে প্রকৃত ভাবটী প্রকাশ হয়। 'অর্থ' শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'ধন' শব্দটী ব্যবহার করিলে আরও যেন ভাল হয়, কারণ অর্থ শব্দটী নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলে Political economy দেশীয় ধনশাস্ত্র।

জাহ্নবীর পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় "আমাদের একমাত্র উপায়" শীর্ষক যে দুইটী প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহাতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে দেখান হইয়াছে যে স্বদেশী আন্দোলনই দেশীয় সম্পদবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। কেবল ধনের উন্নতি হইলেই তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বলা যায় না; ভারতবর্ষীয় জাতিসমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষণের উপায়ও করিতে হইবে। ঐ দুইটী প্রবন্ধে জাতীয় ধনশাস্ত্রের কোন কোন মূল নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এ দেশেঐ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা না থাকায় যে নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হয় নাই। তজ্জন্য দেশীয় ধনশাস্ত্রের দু'একটী প্রধান নিয়ম এক্ষণে প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করা যাইতেছে।

দেশীয় ধনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত থাকা একটী অতি মঙ্গলজনক ব্যাপার। মনে করুন দুইটী দেশের মধ্যে 'ক' নামক দেশের লোকের পক্ষে লোহার জিনিষ অর্থাৎ ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত করা সহজ এবং 'খ' নামক দেশের লোকের পক্ষে মাটির জিনিষ অর্থাৎ হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি প্রস্তুত করাও সহজ। এ অবস্থায় 'ক' দেশের লোকের যদি 'খ' দেশের লোকের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকে, তবে 'ক' দেশের লোকের তাহাদের আবশ্যকীয় লৌহময় দ্রব্যাদি যাহা তাহারা সহজে প্রস্তুত করিতে পারে তাহা ত প্রস্তুত করিবেই, তদ্ভিন্ন তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর উৎপাদ্য মৃণ্ময় দ্রব্যাদিও তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তেমনি 'খ' দেশের লোকেরও দুই প্রকার জিনিসই প্রস্তুত করিতে হইবে। একটী সহজে প্রস্তুতের যোগ্য, অপরটী অধিকতর শ্রম ও ব্যয়সাধ্য। এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকিলে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে। কিন্তু যদি দুই দেশের লোকের মধ্যে ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত থাকে, তবে 'ক' দেশের লোকেরা যে জিনিষটী সহজে নির্ম্মাণ করে অর্থাৎ লৌহময় দ্রব্যই তাঁহারা দ্বিগুণ পরিমাণে কেবল প্রস্তুত করিতে থাকিবে। এবং 'খ' দেশের লোকেরা তাহাদিগের সহজসাধ্য মৃণ্ময় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকিবে 'ক' দেশের

লোকের হাঁড়ি কলসী আবশ্যক, তাহা তাহাদের সহজোৎপন্ন ছুরি, কাঁচি 'খ' দেশে বিক্রয় করিয়া, 'খ' দেশ হইতে তাহাদের ব্যবহারোপযোগী হাঁড়ি কলসী কিনিয়া আনিবে, এবং 'খ' দেশের লোকও তদ্রূপ তাহাদিগের সুলভ মৃণ্ময় দ্রব্যাদি 'ক' দেশে বিক্রয় করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় লৌহময় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিবে। ইহাতে কেবল স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ প্রক্রিয়াতে উভয় দেশের উপকার হইতেছে। উভয় প্রকার জিনিষ প্রস্তুত করণ সহজ হইলে 'ক' দেশের যেরূপ সুবিধা হইত, তাহার সেইরূপ সুবিধাই হইতেছে এবং 'খ' দেশেরও তদ্রূপ সুবিধা হইবে।

দুই দেশের মধ্যে পরস্পর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপে উভয়ের সুবিধা এবং মঙ্গল হয়, কিন্তু এই অবস্থা কোথায় ঘটে? যে স্থলে উভয় দেশ স্বাধীন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলে যদি 'ক' দেশের লোক 'খ' দেশের অধীন হয়, এবং 'খ' দেশের লোককে বার্ষিক কর প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে পরস্পরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রদর্শিতরূপ হিতকর না হইয়া 'খ' এর পক্ষে ভীষণ অহিতকর হইবে; তাহার পক্ষে অমৃতের স্থলে গরলের উদ্ভব হইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে মনে করুন 'ক' দেশ 'খ' দেশের অধীন হওয়ার পূর্ব্বে তাহার বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা ছিল; এবং 'খ' 'ক'কে অধীন করার পূর্ব্বে তাহারও ঐ ১ লক্ষ টাকা আয় ছিল। এই অবস্থায় থাকার সময়ে 'ক' যে এক লক্ষ টাকার লোহার জিনিষ প্রস্তুত করিত, তাহার যদি অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকার ঐ লৌহদ্রব্য 'খ' দেশে বিক্রয় করিত, তাহা হইলে 'খ' ও তাহার ১ লক্ষ টাকার মৃণ্ময় দ্রব্যের মধ্যে ৫০ হাজার টাকার মাল 'ক'য়ের নিকট বিক্রয় করিত। কাজেকাজেই কাহারও ঠকা বা জিতা ছিল না। এক্ষণে 'খ'য়ের 'ক' কে অধীন করার পরের অবস্থা মনে করুন। এই অবস্থায় 'খ' দ্বিতীয় বৎসরেই নিজের ১ লক্ষ টাকার স্থলে সওয়া লক্ষ টাকার অধিপতি হইল; এবং 'ক' নিজের ১ লক্ষ টাকার স্থলে কেবল ৭৫ হাজার টাকার স্বামী হইল। সুতরাং 'খ'য়ের ক্রয়ের শক্তি শতকরা ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইল এবং 'ক'য়ের ক্রয়শক্তি শতকরা ২৫৲ টাকা কম হইল। ইহার ফল এই হইবে যে 'খ' যে পরিমাণ লৌহদ্রব্য 'ক' হইতে কিনিয়া লইবে, 'ক' সেই পরিমাণ মৃণ্ময় দ্রব্য 'খ' হইতে কিনিতে পারিবে না। এইরূপ অসমতা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, অবশেষে এই দাঁড়াইবে যে 'ক' সমস্ত বৎসর দিনরাত্রি খাটিয়া যে লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা প্রায় সমস্তই 'খ' দেশে

যায়, হয়ত 'খ' সেই জিনিষ অন্য দেশে প্রকারান্তরে চালান করে, কিন্তু 'ক' তাহার আবশ্যকীয় যৎসামান্য মৃণ্ময় দ্রব্য ও 'খ' হইতে আনিতে অসমর্থ হয়, সুতরাং মৃণ্ময় দ্রব্যের অভাবে 'ক'কে কষ্ট পাইতে ত হয়ই, এমন কি তাহার নিজের সুলভ উৎপাদ্য লৌহময় জিনিষেরও অভাব ভোগ করিতে হয়; এবং 'ক'য়ের পক্ষে তাহার বার্ষিক কর প্রদান করা এত কঠিন হইয়া পড়ে যে লৌহময় জিনিষ প্রস্তুত করা যাহা তাহার পক্ষে সহজ ছিল, তাহাও অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

দেশীয় ধনশাস্ত্রের এই মূল নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জাহ্নবীর ১ম ও ২য় সংখ্যায় "আমাদের একমাত্র উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। অধুনা ভারতবর্ষের শস্যোৎপাদনশক্তি যেরূপ সহজ, ইউরোপ দেশীয় কল-কৌশলের নিপুণতানিবন্ধন শিল্পদ্রব্য উৎপাদন তত সহজ নয়; সুতরাং বিটিশ রাজ্যস্থাপনার কিছুকাল পর হইতেই ভারতবর্ষ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শস্যাদি পাঠাইতে আরম্ভ করেন এবং তদ্বিনিময়ে শিল্প দ্রব্যাদি আনিতেছেন। এই অবস্থায় 'ক'য়ের যেমন লৌহ দ্রব্য ভারতবর্ষে তেমনি শস্যাদি, 'খ'য়ের যেমন মৃণ্ময় দ্রব্য ইংলণ্ডাদি দেশের সেইরূপ শিল্প দ্রব্যাদি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ যে পরিমাণে শস্যাদি রপ্তানি করিতেন, প্রায় সেই পরিমাণ শিল্পদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার ক্রয়শক্তি কম হইতে হইতে এক্ষণে এত কম হইয়াছে, যে তিনি যে পরিমাণ শস্যের রপ্তানি করেন, তাহার বিনিময়ে ঐ পরিমাণের কিয়দংশও আমদানি করা কঠিন হইয়াছে; এবং ইহাও মনে রাখিবেন 'ক' যখন ভাল অবস্থায় স্বীয় নির্ম্মিত লৌহ দ্রব্য 'খ' দেশে পাঠাইতেন এবং খ দেশ হইতে মৃণ্ময় দ্রব্য আনিতেন, তখন যে তিনি সকল মৃণ্ময় দ্রব্য 'খ' দেশ হইতে আনিতেন এমন নয়; সহজে স্বদেশে যে সমস্ত মৃণ্ময় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিতেন, তাহা স্বদেশেই প্রস্তুত হইত। কিন্তু কাল সহকারে যখন তাহার আয় প্রতিবৎসর শতকরা ২৫৲ টাকা কমিতে লাগিল এবং প্রতিবৎসর 'খ'য়ের আয় প্রতিবৎসর ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন ঐ সহজ উৎপন্ন সামান্য মৃণ্ময় দ্রব্যগুলিও প্রস্তুত করিতে অক্ষম হইয়া সমস্তই 'খ' হইতে আনান আবশ্যক হইল, এবং 'ক' কেবল মাত্র লৌহদণ্ড লইয়া ঠোকাঠুকি করিতে লাগিলেন। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ যে, তাঁহার ক্রয়শক্তি এবং দেশীয় ধনের পরিমাণ তুলনায় এত কম হইয়াছে যে, সহজ উৎপাদ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পকার্য্যাদি

তাঁহার যাহা ছিল তাহাও সমস্ত নষ্ট হইয়াছে এবং তাহা প্রায় সমস্তই অন্যদেশ হইতে আনীত হইতেছে। 'ক'য়ের যেমন লোহার ঠোকাঠুকি তেমনি ভারতের মাটী কামড়া-কামড়ি। তাঁহার ঐ মাটী কামড়াকামড়ি করিয়া উদর পরিপূরণ করিতে হইতেছে এবং ঐ মাটী কামড়াকামড়ি করিয়াই তাঁহার লজ্জা-নিবারণের বস্ত্রের যোগাড় ভিন্ন দেশ হইতে করিতে হইতেছে, এই অবস্থায় একমাত্র প্রতীকার কেবল আত্মশক্তি বৃদ্ধি করা, এবং জিদ্ করিয়া দেশের প্রাচীন শিল্প নৈপুণ্যের পুনঃ প্রবর্ত্তন করা। ইহাই আমাদের একমাত্র উপায়। যদিও তাহাতে প্রতিবৎসর আমাদের অর্থশোষণের বিষময় ফলের কোন প্রতীকার হওয়ার উপায় নাই, তথাপি আমাদের আয়ত্ত যাহা কিছু আছে, তাহা আমাদের এই বর্ত্তমান **স্বদেশী আন্দোলন।**

শ্রীকিশোরীলাল সরকার।

নববর্ষায়।

আবার নূতন বরষা এসেছে ফিরে,
নবীন চপলা নূতন মেঘের শিরে!

আর্দ্র বাতাস তেমনি বহিছে বেগে,
তেমনি আকাশ ঢাকিয়াছে মেঘে মেঘে,
তেমনি উঠেছে স্তরের উপর স্তর,—
নবঘননীল মেঘগিরি মনোহর
ইন্দ্রধনুর মুকুট পরিয়া শিরে,
আবার নবীন বরষা এসেছে ফিরে।

আবার নবীন বরষা এসেছে ফিরে!
লেখা আছে কি গো মেঘের পাতায় তার—
কত ইতিহাস, কত নববরষার?
সেই যে পুখুরে কলমীলতার দল
বাতাসে ঢলিয়া করিতেছে দলমল,—

সেই যে বাগানে পূবের পুখুরপাড়ে
কত কেয়াফুল ফুটেছে কেয়ার ঝাড়ে,
সেই যে গাছের পাতায় রয়েছে ঢুলি
সলিলের ফোঁটা যেমন মুকুতাগুলি,
সেই যে পথের ধারের বকুল গাছে
কত ফুল, কত তলায় বিছায়ে আছে,
বাতাস যখন ছুটিয়া নিকটে আসে,
নাসা ভরি যায় বকুলফুলের বাসে।
সেই জলে ভিজি সারাটা ছ'পর বেলা,
বাগানে বাগানে ভাই বোনে কত খেলা,
ভেলা ভাসাইয়া হেলাফুল তোলা তীরে।
তেমনি নবীন বরষা এসেছে ফিরে!

আবার নবীন বরষা এসেছে ফিরে!
আঁকা আছে কি গো মেঘের পাতায় তার,
কত হাসিমুখ, কত নয়নের ধার!
সন্ধ্যা আঁধার মেঘের আঁধার মাঝে,
বধূ কাজ শেষে বসি বাতায়ন কাছে.
ঝর ঝর যত ঝরে বরষার জল,
তাহারো নয়ন জলভরে টলমল;
মায়ের পাশেতে বিছানা খানি সে তার,
ছোট ভাইটীরে মনে পড়ে বার বার!

নীরব নীশিথে শুনা যায় অবিরল,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝরে বরষার জল,
কত ব্যাকুলতা জাগিয়াছে সেই তানে,—
নিশি জানে শুধু, আর কেহ নাহি জানে।

আবার নবীন বরষা এসেছে ফিরে,
কদম্বমালা গাঁথিয়া পরেছে শিরে।
মেঘের ঘটেতে এনেছে শান্তিজল,
সিক্ত করিতে তপ্তধরণীতল।

সেই ঝম্ ঝম্, সেই ঝর্ ঝর্ ঝর্,
সেই বাতাসেতে ধ্বনি উঠে সর্ সর্,
পুরাতন বুঝি নববরষার মাঝে
এখনো লুকায়ে মিলিয়া-মিশিয়া আছে!
লেখা আছে বুঝি মেঘের পাতায় তার,
কত ইতিহাস, কত শত বরষার!

দর্পচূর্ণ।

১

কোন এক পল্লীগ্রামের বাগানবাটীর অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া দুই সখীতে কথোপকথন হইতেছিল। দ্বিপ্রহরের সুপ্ত পল্লীতে শুধু বিহঙ্গের অলস আকুল-কণ্ঠ শ্রুত হইতেছিল। মন্থর সমীরণ আলসে বহিয়া সুপ্ত পুষ্পমুকুলগুলিকে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস করিতেছিল, স্থির জলরাশিকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। আর মানবের মনে কি ভাব জাগাইতেছিল, কে জানে?

সরলা সেই বাটীর একমাত্র পুত্রবধূ, সরসীবালা তাহার বাল্যসখী ও দরিদ্র প্রতিবাসীর বধূ। নিভৃতে উভয়ের অনেক কথা হইতেছিল, অনেক কথার পর সরসীবালা বলিল—"কি ভাই, আজ কাল ভাব কেমন হ'ল? সুরেশ বাবু না এসেছেন!"

সরলা বড় ঘরের কন্যা, বড় ঘরের পুত্রবধূ, স্বভাবতঃই একটু দর্পিতা। তদ্ভিন্ন সে ভাবিত তাহার জন্য সকল দ্রব্যই ভগবান দিয়াছেন, সকলই তাহার ইচ্ছাধীন, সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। তাই সে স্বামীর অসীম প্রেম-আকুলতা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে না। সে ভাবিত এ বেশ মজা, বেশ খেলিবার সুযোগ হইয়াছে, কিন্তু সে যদি ভবিষ্যৎ দেখিত তাহা হইলে কখনো ইহা মনে করিত না।

সরসীর কথা শুনিয়া সরলা হাসিয়া বলিল—"এসেছেন, তবে ত আমায় রাজা করেছেন। তোর কথা শুনে অবাক হয়ে যাই। তোর বরও ত আজ আসবেন।

সরসী চমকিয়া বলিল—"ও কি কথা, এত দিন পরে স্বামী ঘরে এসে-ছেন তোর শুনে আহ্লাদ হয় না ?"

"কেন আহ্লাদ কিসের ? তোর বরের জন্য বুঝি তোর ঘুম হয় না। তা তোর বরকে কাজ ছেড়ে এখানে থাকতে বলিস্ নে কেন ?"

"আমার মন কেমন কল্লে কি হবে ? তিনি এই সবে নূতন চাকরী পেয়েছেন, কথায়-কথায় কি আ'সতে পারেন ? আর চাকরী ছেড়ে দিলে অন্নের উপায় কি হবে ?" সরসীবালার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। সরলা হাসিয়া বলিল—"তুই বুঝি তোর বরকে এত ভালবাসিস্ ? আমার ভাই কিন্তু একটুও মন কেমন করে না।"

সরসীবালা বিস্মিত হইয়া বলিল—"স্বামী বিদেশে গেলে মন কেমন করেনা সে কি ? তুই তোর স্বামীকে ভালবাসিস না ?"

"আমি অত ভালবাসার ধার ধারি না, আমার কিন্তু খেলাতে বেশ মজা লাগে।"

"একটু সামলে বোন, দেখিস্ যেন জাল ছেঁড়ে না। যত্নে ও ভালবাসায় পুরুষ বশ হয়, খেলাতে হয় না।"

"আমি খেলিয়ে বশ করে রাখ্‌বো দেখিস।"

"অত দর্প করিস নে, দর্পহারী মধুসূদন আছেন মনে রাখিস। শেষ খেলাতে গিয়ে যেন খেল্‌তে না হয়।"

"এ মুখের মায়া ছাড়তে হয় না, শেষে আমি বই গতি নাই।"

"ভুল,—তোর বিশ্বাস ভুল, স্বামীর স্ত্রী না হ'লে চলে, কিন্তু স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন গতি নাই। ভাগ্যে আমি বড় মানুষের ঘরে জন্মাইনি, তাহ'লে ঐ বুদ্ধিতে আমি যেতাম। আচ্ছা, কাল তোদের কি কথা হ'ল তা বল ?"

"কথার কি মাথা আছে ? সে কত বইয়ের কথা, কত বাজে কথা,—ভালবাসার কথা।"

"কত ভাগ্যে এমন স্বামীর স্ত্রী হ'য়েছিলে তা মনে রেখ।"

"কেন, তোর স্বামী কি তোকে ভালবাসে না ? তুইত এত যত্ন করিস্।"

সরসীবালার গম্ভীর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"ভাই, মুখে বলিতে নাই কাঙালের ওই সুখ-স্বর্গ হতে যে দিন বঞ্চিত হ'ব, সে দিন যেন আর এ পৃথিবীতে থাকিতে না হয়।" সরলা বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

সহসা সরসীবালা বলিয়া উঠিল—"ওই দেখ, তোর বর তোকে ঘরে না দেখে খুঁজতে বাহির হয়েছেন, যা শীঘ্র যা।"

"মরণ আর কি।" বলিয়া সরলা সরসীর হাত ধরিয়া টানিল।

১

সন্ধ্যার সময় শয়ন কক্ষের বাতায়নের নিকট বসিয়া সরলা একরাশি বকুলফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছিল। কক্ষের প্রদীপ নিভাইয়া সে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোকে বসিয়া অসীম আনন্দে মালা গাঁথিতে ব্যস্ত ছিল। সুরেশ যে কখন তাহার অজ্ঞাতে আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছেন, সে তাহা জানিতেও পারে নাই। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে তাহার সখীর কথা মনে পড়িল, সে হাসিয়া উঠিল ও আপনার মনে বলিল—"সরসীর যেমন কথা বরের জন্য ঘুম হচ্ছে না।"

সে হাসির লহরী ও কথার প্রতিধ্বনি সুরেশের বুকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত বিঁধিল। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি কথা সরলা?"

"ওমা, তুমি কখন চোরের মত এসেছ, আমি দেখতে পাইনিত।" বলিয়া সরলা উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি মালা গাঁথ, আমার খুব ভাল লাগিতেছে, গাঁথা হ'লে আমায় দিবে কি?"

"তবে আর আমি মালা গাঁথিব না।"

"আমি যা ভালবাসি, তুমি কি তাহা করিতে চাহ না?"

"আমি পরের মন যোগাতে পারি না"

"সরলা আমি কি তোমার পর?" সেই কণ্ঠের স্বরে শুধু অতৃপ্ত প্রেমের উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল।

সরলা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"আমি কি তা বলছি?"

"সরলা সত্য করিয়া বল তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

"আমি অত ভালবাসার ধার ধারি না।"

"তোমার মা বাবাকে, চারু সুরোকে ভালবাস না?"

"তা কেন বাসব না?"

"আমায়?"

সরলা নিরুত্তর।

"আমি এখানে এসেছি বলে কি বিরক্ত হচ্ছ? আমি তবে যাই?"

"তা কেন যাবে, এ তোমার ঘর, তুমি কেন যাবে ?"

"আমি এখানে থা'কলে তুমি ভাল থাক, না আমি ক'লকাতায় থাকলে ভাল ?

সরলা মৃদুকণ্ঠে বলিল "তা আমি বলব না।"

সুরেশ বলিলেন—"আমায় কেন চিঠি দিতে না ?"

"কি লিখিব ?"

"কেন সবাই ত লেখে, সরসী কি চারুকে চিঠি লেখে না।"

"তার ভিন্ন কথা, সে বরের জন্য পাগল।"

সুরেশ সরলার হাত ধরিয়া বলিলেন—' আহা, কবে তুমি আমার হবে।

সরলা হাত টানিয়া লইয়া বলিল "আমার অত ন্যাকামি আসে না।"

"কেন ভালবাসাটা কি ন্যাকামি ?"

"আমি অত বুঝি না।"

"আমি তোমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব, বুঝিবে কি ?"

এই বলিয়া পুনরায় সস্নেহে সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া নিকটে টানিতে গেলেন, সে দূরে সরিয়া গিয়া বলিল —"আমার এখন কাজ আছে, চলিলাম।"

সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশচন্দ্র শয্যায় শুইয়া ভাবিলেন —

"একি নিদারুণ যাতনা,
যার দরশন, যার পরশন
মোর জীবনের কামনা,
হৃদি-ফুল দ'লে, সে যে গেল চলে
সে ত মোরে কভু চাহে না।"

৩

সরসী বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে চারুচন্দ্র বাটী আসিলেন। জননীর নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন ; সরসীর সহিত চক্ষে চক্ষে কেবল দুইবার আলাপ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইল, সরসী বাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহ-প্রাঙ্গনের তুলসী মঞ্চের তলায় রাখিয়া করজোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর অন্যমনে আপনার শয়ন গৃহে প্রদীপ জ্বালিতে আসিল, তখন সহসা তাহার শয্যাপার্শ্ব হইতে চারুচন্দ্র আসিয়া হাসিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া তাহাকে বাহুপাশে

বন্দী করিলেন। সরসী অন্যমনে সখীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, সে স্বামীর আদর সোহাগে পুলকিত হইয়া কহিল,—"আজ তুমি বেড়াতে যাও নাই ?"

চারু সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"বেড়াই ত অনেক, আর কত বেড়াতে যাব ? দু'দিন বাড়ীতে এসেও বুঝি চোখে দেখ্‌তে পাব না ?"

"তাই বুঝি ঘর অন্ধকার করে দেখা হচ্ছে ? মা যদি দেখেন ঘর অন্ধকার, কি বলবেন ?"

"বলবেন আমার পুত্রবধূ এখন গুণবতী হয়েছেন।"

"ছিঃ ও কথা বলিও না।"

"তবে তুমি আলো জ্বাল, ও দরজাটা ভেজাইয়া দাও।"

সরসী পুনরায় প্রদীপ জ্বালিল, উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। চারু বলিলেন—"আজ এত হাসি কেন ?"

"কেন হাসিব না ? আর দু'দিন গেলেই ত এ হাসি বন্ধ হবে।"

"আমি তোমায় এবার যদি কলিকাতায় নিয়ে যাই ?"

"নিয়ে যাবে ?" আকুল আগ্রহে সরসীর আনন পূর্ণ হইল, সস্নেহে সরসীর হাত ধরিয়া চারুচন্দ্র কহিল—"এখন না, কিন্তু শীঘ্রই নিয়ে যাব ; বাসা ঠিক হলেই নিয়ে যাব, মাকে বলেছি।"

সরসীর চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল, তাহার এতদিনের সাধ পূর্ণ হইবে, সে তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

তাহার পর দুইজন অন্য কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন, সহসা সরসী বলিয়া উঠিল,—"তুমি আমার একটা কাজ করতে পারবে ?"

"আগে বল কি কাজ।"

"না তোমায় তা কর্ত্তে হবেই।"

"না জেনেই প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে হবে, এত রাণীর বড় কঠিন আজ্ঞা।"

"দেখ আজ আমার সরলার সঙ্গে অনেক কথা হ'ল, সে বোধ হয় সুরেশ বাবুর সহিত ভাল ব্যবহার করে না।"

"সত্যি, তাই বুঝি সুরেশের মুখের হাসি নিভে যাচ্ছে। আগের মত আর স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই না।"

"তুমি যদি একটী কাজ কর ত আমি সরলাকে ঠিক করতে পারি।"

"কি কাজ ?"

"সুরেশকে বলিও সরলা তাঁকে খুব ভালবাসে, সে শুধু স্বভাব দোষে প্রকাশ কর্ত্তে পারে না। যদি সুরেশ এবার ক'লকাতা যাবার সময় না বলে যান, আর দু'টী মাস চিঠি না লেখেন ত দেখ তাঁর সরলাকে তাঁর পায়ে ধরাতে পারি কি না।"

"সুরেশ কি রাজী হবে?"

"তুমি আমার নাম করে না হয় বলিও।"

"অন্যের প্রণয় ব্যাপারে কি হস্তক্ষেপ করা উচিত?"

"না সরলার দর্পচূর্ণ কর্ত্তেই হবে, সে বলে পুরুষ মানুষ খেলার জিনিস, শুধু খেলাতেই বেশ। তা ছাড়া তাদেরি উপকার হবে, সুখী হবে। এখন মনের মিল নাই, সে কি ভাল?"

"ওঃ তাহ'লে মজাটা দেখতে হচ্ছে।"

"তুমি সুরেশ বাবুকে বলিও শুধু দু'টা মাস একটু সাবধান হন, তাঁর প্রাণের সরলা তাঁরি থাক্‌বে কেউ কাড়িয়া লইবে না।"

"আচ্ছা, আমি আজই সুরেশকে এই অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিব, কিন্তু সরসী এরূপ পরীক্ষায় কি তুমি রাজী আছ?"

সরসী স্বামীর প্রতি নির্ভয়ে চাহিয়া বলিল -"তুমি রাজী হলেও না।"

"আমি এখন তবে যাই?"

'এই না আজ কোনখানে যাবে না ব'লে ছিলে?"

"ভুলে গিয়েছিলাম, আচ্ছা আজ আর যাব না।"

'না গো তুমি যাও, আমার কি কাজকর্ম্ম নাই? আজ কি আহার কর্ত্তে হবে না? আমার মুখ দেখে কি ক্ষুধাতৃষ্ণা সব দূর হবে?'

চারুচন্দ্র হাসিয়া চলিয়া গেলেন। সরসী অতৃপ্ত নয়নে স্বামীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

৪

চারুচন্দ্র সুরেশদের বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, সুরেশ বহিবাটীতে তাঁহার বসিবার কক্ষে একখানি বেত্রাসনে বসিয়া আছেন; চারুচন্দ্রের পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিলেন, বন্ধুকে দেখিয়া সাদরে আহ্বান করিলেন। উভয়ে বসিয়া দু'চারিটী কথাবার্ত্তা হইবার পর চারুচন্দ্র বলিলেন -- "কিহে এতক্ষণ কি করে দেবীর মান ভাঙ্‌বে তাই ভাবিতেছিলে বুঝি?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ বলিলেন—"তোমার যেমন কথা, অন্য চিন্তা নাই?"

"আপাততঃ নহে।"

"আচ্ছা ভাই, তুমিই না হয় আমার একটু প্রেম অভিনয় শিখিয়ে দাও"

"ও বুঝি শেখাতে হয়? যা'হোক এবার তোমাদের দু'জনের কেমন মনের মিল হ'ল তা বল?"

সুরেশচন্দ্র অন্য দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে কথায় আর কাজ নাই।"

"আমি ত তোমায় সব কথা বলি।"

"তুমি সুখী, তোমার সহিত আমার তুলনা হয় না"

"আচ্ছা আর বেশী কথার জালে আবশ্যক নাই; যদিও ভাই আমার এটা অনধিকার চর্চ্চা, তবু ক্ষমা করিও আমি সরসীর কাছে তোমাদের সব কথা শুনেছি।"

"কে বলিল, সরলা?"

"সরসী কি অন্ধ?"

"তবে আর আমায় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

"তোমার প্রেমব্যাধির চিকিৎসা কর্ত্তে হ'বে, তোমাদের প্রণয়পরীক্ষা হ'বে।"

"চিকিৎসক কে?"

"সরসী।"

"কি আজ্ঞা।"

চারুচন্দ্র তখন সুরেশকে আপনাদের পরামর্শের কথা বলিলেন। সুরেশচন্দ্র প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া এরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলেন, অবশেষে বন্ধুবরের তর্কে পরাজিত হইয়া সেই মতে মত দিলেন। সরলাকে কষ্ট দিতে বা পরীক্ষা করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তবে হৃদয় জ্বলিতেছিল তাই একটু প্রতিশোধ লইলে ক্ষতি-কি মনে করিয়া মত দিলেন।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, উভয়ে শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন।

সুরেশ সেই রাত্রে বহির্ব্বাটিতেই যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। সুরেশ কিন্তু মনে স্থির করিলেন, ইহা প্রণয়পরীক্ষা নহে—ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা।

এদিকে সরলা যখন দাসীর মুখে শুনিল যে দাদাবাবু আজ বৈঠকখানায় থাকিবেন, তখন তাহার হৃদয়ে সামান্য আঘাত লাগিল। দাসীর নিকট অপমানের কথা শুনিতে হইল, সরলার হৃদয়ে এই জন্য অভিমান আরও

উথলিয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল আর কখনও সে সুরেশের শত সাধ্য-সাধনাতেও কথা কহিবে না। এইভাবে দুইদিন কাটিল, সরসীরও আর দেখা নাই। দু'দিন পরে প্রভাতে সরলা শুনিল সুরেশ কলিকাতায় চলিয়া যাইতেছেন। তাহার হৃদয়ে যেন সে কিসের আঘাত অনুভব করিল; সে আঘাত প্রথমে রাগের মত—অভিমানের মত হৃদয়ে জাগিয়া রহিল, পরে সুরেশ চলিয়া যাইবার পর তাহা দারুণ দুঃখের মত তাহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। সে আপনার শয়ন কক্ষের দ্বাররুদ্ধ করিয়া শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেশ চলিয়া যাইবার পর সপ্তাহ অতীত হইল, সরলা সুরেশের কোনও সংবাদ পাইল না। সুরেশ কলিকাতায় গিয়াই তাহাকে কত আদর করিয়া পত্র দিতেন, এবার কোনও সংবাদ লইলেন না। সে লজ্জায় আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও পারে না। তাহার প্রাণের ভিতর উদাস হইয়া উঠিল, সে কতবার মনে করিত সুরেশের কথা মনে করিবে না, কিন্তু তাহার প্রাণের মধ্যে সততই যেন একটা অভাব - একটা আকুলতা জাগিয়া রহিল। কতদিনে সুরেশ ফিরিবে. আবার কবে দেখিবে, কেবল তাই মনে হইতে লাগিল। এবার দেখা হ'লে খুব রাগ করিবে, কথা কহিবে না, না না তা আর করিবেনা। সুরেশ নহিলে তাহার জীবন যে বিফল বোধ হইতেছে; সরসীর কথা বুঝি ফলিল, বুঝি দর্পচূর্ণ হইল, কেন সে ভাল ব্যবহার করে নাই, সে ত সুরেশকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, কেন সে ভালবাসা প্রকাশ করে নাই? যদি সুরেশ আর তেমনধারা ভাল না বাসে, যদি আর তেমন আদর সোহাগ না করে, যদি ভুলে যায়, ঘৃণা করে। তার চেয়ে মরণ ভাল। সরলার মনে এই কথা জাগিতে লাগিল। প্রত্যহ মনে করিত সরসী আসিবে, কোন প্রকারে সরসীর নিকট হইতে সুরেশের সংবাদ জানিবে, কিন্তু সরসী আসিল না। সে সরসীদের বাটী যাইবার জন্য অনুমতি চাহিল, সে ধনীর পুত্রবধূ তাহার সে স্বাধীনতা টুকু নাই, সে যাইবার অনুমতি পাইল না। সে গোপনে দাসীর দ্বারা সরসীকে ডাকাইয়া পাঠাইল, তাহার উত্তরে সংবাদ আসিল "শরীর অসুস্থ, পরে যাইব।" সরলার হৃদয় অভিমানে অপমানে জ্বলিতে লাগিল, সে নীরবে সময় কাটাইতে লাগিল। ধনী গৃহে সময়ও শীঘ্র কাটিতে চায় না, সংসারের কোন কাজও করিতে হয় না, দাসদাসীর অভাব নাই। শুধু অলসতার মধ্যে তাহার জীবন কাটিতেছিল। সে এখন কাজে ব্যস্ত

থাকিতে চায়, কিন্তু কাজ পায় না। তাহার জীবনের সুখ, আনন্দ তাহাকে যেন ফেলিয়া চলিয়া গেল। সে শূন্যমনে ম্লানমুখে বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া, শয্যায় শুইয়া সময় কাটাইত, আর হৃদয়ে শুধু সুরেশের প্রতিমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিত।

৫

কয়েকদিন পরে সরসী আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। সে যেন কোনও কথা জানে না, সে কোন প্রশ্ন করিল না। কয়েকটী কথার পর সরসী বলিল "কি ভাই, এবার সুরেশ বাবুর কি চিঠি এলো দেখাও না।"

সরসী বলিল, —"আগে তোমার চিঠি দেখি, এনেছ?

এখন আর সখীর সহিত আদর করিয়া 'তুই' 'তোর' বলিতে তাহার সাধ যাইতেছে না, হাসিতে তাহার অন্তরে ব্যথা লাগে, শুধু কারণে-অকারণে চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসে, কে জানে কেন? সরলা আগ্রহ সহকারে পত্র পড়িতে ব্যস্ত রহিল, তাহা আগ্রহপূর্ণ প্রেমপত্র; তাহার শেষ ভাগে লিখিত আছে "সুরেশের সঙ্গে ত প্রায় দেখা হয়, আজ কাল ত খুব স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। তোমার সখীর ভাব কিরূপ?"

সরলার হৃদয়ে যেন এই দুই ছত্র শেল সম বিদ্ধ হইল। সে পত্র সমাপ্ত করিয়া সরসীর হাতে দিয়া বলিল,—"বেশ চিঠি তোমার আসে।"

সরসী হাসিয়া বলিল,—"তোমার চেয়ে? এখন তোমার চিঠি দেখাও।" সরলা সে কথার উত্তর না দিয়া অন্য কথা পাড়িল। কিয়ৎক্ষণ বাদে সরসী চলিয়া গেল।

সে রাত্রে সরলার আর নিদ্রা হইল না, সে কেবল মনে করিতে লাগিল যদি কোনও উপায় থাকিত সে ছুটিয়া সুরেশের নিকট যাইত, জিজ্ঞাসা করিত কেন এমন হইল! সে আর কখনো কোন মন্দ ব্যবহার করিবে না, খুব শিক্ষা হইয়াছে, এইবার ক্ষমা কর, এইবার আবার ফিরে এস, আর কখনো এমন হইবে না।

রাত্রের অনিদ্রায় তাহার মাথা কেমন করিতে লাগিল, সকালে আর শয্যাত্যাগ করিতে পারে না। সুরেশের জননী আসিয়া দেখিলেন জ্বর হইয়াছে, সেদিন জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল, দু'চার দিন যাইতে না যাইতে অত্যন্ত বাড়িয়া বিকারের লক্ষণ দেখা দিল, চিকিৎসকের কথায় ভীত হইয়া সুরেশের পিতা সুরেশকে আসিতে টেলিগ্রাম করিলেন।

সরলার পীড়া হইবার পর সরসী প্রত্যহ আসিত, সরলাকে এই কয়দিনের পীড়ায় আর যেন চিনিতে পারা যায় না। সরলা সরসীকেও চিনিতে পারিল না, তাহার মুখে আকুল ভাব, চক্ষে কাতর দৃষ্টি। সরসী তাহার নিকট বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল, সহসা সরলা সরসীর হাত ধরিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "ফিরে এসো, ফিরে এসো, আর না, আর কিছু বলিব না ফিরে এসো।"

সরসীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল, ঘোর অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কেন তাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইল, কেন সে চারুকে এমন অনুরোধ করিল, তাহারি অনুরোধে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়, কে জানিত তাহা এমন ভীষণ হইবে।

সন্ধ্যার সময় সুরেশ আসিয়া পঁহুছিলেন, তাঁহার হৃদপিণ্ড যেন ছিন্ন হইতেছিল, চিকিৎসকের নিকট রোগের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে আর কিছু আশা রহিল না। তাঁহারি নিষ্ঠুরতায় তাঁহার আদরিণী সরলা বুঝি এমনি করিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়, যদি সরলা আর রক্ষা না পায়, যদি আর কথা না কয়, যদি ক্ষমা না করে, তাহা হইলে এ ভারবহ জীবন আর সুরেশ বহিতে পারিবে না। এই প্রায় মাসাবধি কোনও সংবাদ পর্য্যন্ত দেয় নাই, সে যে বড় অভিমানিনী, সে কি আর ক্ষমা করিবে। কেন সে চারুর অনুরোধে নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সুরেশ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, সুরেশের মা শিয়রে বসিয়াছিলেন। সুরেশকে দেখিয়া বলিলেন, "বসো বাছা, তুমি একটু কাছে বসো, সেই পর্য্যন্ত কেবল বলিতেছে,—'এখনো এলেনা ফিরে এসো, ফিরে এসো।"

সরলা আবার ব্যাকুল ভাবে চহিয়া বলিল,—"এসো তুমি, ফিরে এসো, এখনো এলেনা, আর বুঝি দেখা হ'ল না।"

সুরেশের মা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুরেশ ধীরে ধীরে সরলার নিকট গিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে সেই উত্তপ্ত কপালে আপনার হিম-শীতল হস্ত স্পর্শ করিলেন, তাহার উত্তপ্ত করতল আপনার করতলে ধারণ করিলেন। সে স্পর্শে সরলা চমকিত হইয়া উঠিল। সুরেশ ধীরে ধীরে কহিলেন,—"সরলা, আমি এসেছি।"

সরলা উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"এসেছ, তুমি এসেছ, ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর।"

তাহার পর সে অন্য কথা বলিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে শুধু "ফিরে এসো" "ফিরে এসো" বলিতে লাগিল।

সুরেশের চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল, তিনি আকুল হৃদয়ে কাতর স্বরে জগদীশ্বরের নিকট সেই ক্ষীণ প্রাণটুকু বাঁচাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন জীবন ও মৃত্যুর সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া সরলার বাঁচিবার আশা হইল। সুরেশচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সার্থক হইল।

যখন সরলার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল, সে সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিতে গেল, সুরেশ সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সরলা তুমি আমায় ক্ষমা কর, তোমার পরীক্ষা করিতে গিয়া আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে।"

তাহার পর তিনি চারুচন্দ্রের সহিত সমস্ত পরামর্শের কথা বলিলেন। সরলা হাসিয়া বলিল "যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আর পরীক্ষা করিও না।"

তাহার পর আর কি? জলন্ত অগ্নিতে স্বর্ণকে যেমন বিশুদ্ধ করিলে দ্বিগুণ কান্তি, দ্বিগুণ শ্রী হয়, তেমনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরলা আপনার হৃদয়ের নবীন শোভায় সুরেশকে মুগ্ধ করিল।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন।

সংসারের মায়ামোহ সকল ত্যেয়াগি,'
কোন শূন্যপথে তুমি করিলে প্রয়াণ,
সংসারী আছিলে, তবু স্বার্থত্যাগী যোগী
সংসারে বাঁধিতে তুমি পার নাই প্রাণ।
সরল শিশুর মত উদার হৃদয়,
স্নেহ, প্রেম পরিপূর্ণ, দয়ার আধার,
স্বরগের পুণ্য ছবি, অমর অজয়,
কেহ ত রাখিতে হেথা পারিল না আর।
কি অসীম বিশ্বাসেতে পূর্ণ ছিল হিয়া,
সংসার বাসনা সব করেছিলে জয়।

মৃত্যুরে করিলে জয় হেলায় হাসিয়া,
যেন মা'র কোলে শিশু লভিল অভয়।
শুধু যে লতিকা চারু তোমারে ঘেরিয়া
ছিল শান্তি সুখে, ভেঙ্গে গেলে তার হিয়া।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বরাহমিহির।

ভারতে যত জ্যোতির্বিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বরাহমিহিরকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সকলে মনে করেন। সাধারণের বিশ্বাস, বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এ সম্বন্ধে অনেকেই জ্যোতির্বিদাভরণের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য॥"

অনেকের বিশ্বাস,—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতির কবি কালিদাস উক্ত জ্যোতির্বিদাভরণের রচয়িতা, সুতরাং তিনি বরাহমিহিরের সমসাময়িক বটেন। প্রমাণ স্থলে অনেকে জ্যোতির্বিদাভরণ হইতে এই শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"বর্ষৈঃ সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈ (৩০৬৮) র্যাতে কলৌ সংমিতে
মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতোগ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ৩০৬৮ গত কল্যব্দে বা ২৪ বিক্রমসংবতে জ্যোতির্বিদাভরণের রচনাকাল হইতেছে, কিন্তু পরে জ্যোতির্বিদাভরণ মধ্যেই—

"শাকঃ শরাম্ভোধিযুগোনিতো হৃতো মানং খতর্কৈরয়নাংশকাঃ স্মৃতাঃ॥"

ইত্যাদি স্থলে ৪৪৫ শকের উল্লেখ এবং "মত্বা বরাহমিহিরাদিমতৈঃ" ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকায় জ্যোতির্বিদাভরণকে খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ অথবা এই গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে বরাহমিহিরকে নবরত্নের একটী রত্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

আবার কেহ কেহ ব্রহ্মগুপ্ত-টীকাকার পৃথুস্বামীর দোহাই দিয়া এই বচনটী বলিয়া থাকেন—

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ॥"

অর্থাৎ ৫০৯ শকে বরাহমিহিরাচার্য্য স্বর্গগমন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত বেবের (Weber) আমরাজের দোহাই দিয়া উক্ত ৫০৯ শক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে পৃথুস্বামী বা আমরাজের টীকায় ঐরূপ কোন কথার আভাস নাই। আবার হলমঞ্জরীর দোহাই দিয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র জ্যোতির্বিদ্ এই বচনটী পাঠ করিয়া থাকেন—

"স্বস্তি শ্রীনৃপসূর্য্যসূনুজশকে যাতে দ্বিবেদাম্বর-
ত্রৈমানাব্দমিতে ত্বনেহসি জয়ে বর্ষে বসন্তাদিকে।
চৈত্রে শ্বেতদলে শুভেবসুতিথাবাদিত্যদাসাদভূদ্
বেদাঙ্গে নিপুণো বরাহমিহিরো বিপ্রো রবেরাশিভিঃ॥"

অর্থাৎ ৩০৪২ যুধিষ্ঠিরের অব্দে বা ২ বিক্রম সংবতে চৈত্র মাসে আদিত্যদাসের ঔরসে সূর্য্যের আশীর্ব্বাদে বেদাঙ্গনিপুণ বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্লোকটীও কোন প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থে না থাকায় বিশ্বাসযোগ্য নহে।*

সুতরাং দেখা যাউক, বরাহমিহির আপনার গ্রন্থে কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন? তাঁহার বৃহজ্জাতকের উপসংহারাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্তবোধঃ
কাপিত্থকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যক্-
হোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস, তিনি অবন্তীবাসী, কাপিত্থ নামক স্থানে তিনি সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিয়া বরলাভ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় রোমকসিদ্ধান্তের অহর্গণ স্থির উপলক্ষে বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

"সপ্তাশ্বিবেদসংখ্যং শককালমপাস্য চৈত্রশুক্লাদৌ।
অর্দ্ধাস্তমিতে ভানৌ যবনপুরে ভৌমদিবসাদ্যঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে, ৪২৭ শক চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ মঙ্গলবার পাওয়া যাইতেছে। নিজ সময় ধরিয়াই জ্যোতির্বিদ্গণ অহর্গণ স্থির করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে আমরা বরাহমিহিরকে ঐ সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি।

---

* শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত রচিত "ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র" দ্রষ্টব্য।

এ দেশে বরাহমিহির ও খনা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কেহ কেহ খনাকে বরাহমিহিরের কন্যা, কেহ বা পত্নী কেহ বা পুত্রবধূ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ সকল অনুমান বা প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে করি না।

বরাহমিহির তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচখানি সিদ্ধান্তের আশ্রয় করিয়া পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন। এই পঞ্চসিদ্ধান্তের নাম —

"পৌলিশরোমকবাসিষ্ঠসৌরপৈতামহাস্তু পঞ্চসিদ্ধান্তাঃ॥"

পৌলিশ, রোমক, বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত।

বাসিষ্ঠ ও পৈতামহ এই দুইখানি সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত-লেখকগণ খৃঃ পূর্ব্ব ১৩শ শতাব্দীর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু পৌলিশ ও রোমক এই দুই খানির নাম দেখিয়া মনে হয় যে বরাহমিহির প্রাচীন পাশ্চাত্য জ্যোতিষেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌলিশ সিদ্ধান্তে যবনপুর বা আলেক্জান্দ্রিয়া হইতে দেশান্তর গৃহীত হইয়াছে।* এদিকে রোমকসিদ্ধান্তে গত দিনসংখ্যানির্ণয়ার্থ যবনপুরের মধ্যাহ্ন ধরা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল্‌বীরুণী লিখিয়াছেন, পৌলিশসিদ্ধান্ত যুনানীর পৌলসের রচনা। তাহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রীক ভাষায় Paulus Alexandrinusএর যে জ্যোতির্গ্রন্থ আছে পৌলিশসিদ্ধান্ত তাহারই সংস্কৃত অনুবাদ কিন্তু যাঁহারা উক্ত গ্রীকগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, গ্রীকগ্রন্থের সহিত উহার কিছুমাত্র মিল নাই। বিশেষতঃ পৌলিশসিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের টীকাকার পৃথূদক ও ভট্টোৎপল পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সকল শ্লোকের সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত পৌলিশসিদ্ধান্তের কোন ঐক্য নাই; সৌর ও আর্য্যভট সিদ্ধান্তের মতের সহিত বরং মিল আছে। রোমকসিদ্ধান্ত নাম শুনিয়াই অনেকে স্থির করিয়া বসিয়াছেন যে, আলেক্জান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ টলেমীর মূলগ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহা মনে

---

* "যবনাচ্চরজা নাড্যঃ সপ্তাবন্ত্যাস্ত্রিভাগসংযুক্তাঃ।
বারাণস্যাং ত্রিকৃতিঃ সাধনমন্যত্র বক্ষ্যামি॥"
(পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় পৌলিশ)

হয় না। লাট, বশিষ্ঠ, বিজয়নন্দী ও আর্য্যভট এই চারিজনের গণনা ভিত্তি করিয়া শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধান্ত রচনা করেন। ভট্টোৎপল ও অল্‌বেরুণীও তাহাই বলিয়াছেন।

বরাহমিহির যে পাঁচ খানি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত সমালোচনা করিয়া জ্যোতির্ষিগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে এই সিদ্ধান্তখানি শকাব্দারম্ভের সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে পৌলিশ এবং পৌলিশের পূর্ব্বে রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হয়। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কস্ প্রায় ১৫০ বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। তাঁহার পরিদশন কাল লইয়া টলেমি প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের সহিত রোমকসিদ্ধান্তের মিল নাই। এরূপ স্থলে তাঁহার বহুপূর্ব্বে রচিত রোমকসিদ্ধান্ত হিপার্কসের গ্রন্থ দেখিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে, এরূপ কথাও বলিতে পারা যায় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে বরাহমিহির যবনাচার্য্যগণের মতও উপেক্ষা করেন নাই, তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ব্যতীত তিনি বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক প্রভৃতি বহু জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

লক্ষ্ণৌ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকদিন পরে আবার লক্ষ্ণৌ-ভ্রমণের কাহিনী বলিতে বসিলাম। লক্ষ্ণৌ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ; এখানকার কথা বলিতে গেলে ইতিহাসের কথা অনেক বলিতে হয়। যিনি লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, তিনি যদি শুধু লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি সাহের কীর্ত্তি দেখিয়া আসেন, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে যদি আর কিছুই না পড়ে তাহা হইলে তাঁহার মত ভ্রমণকারীকে হতভাগ্য বলিতে ইচ্ছা করে। আমি ত বলিতে পারি, লক্ষ্ণৌয়ের নবাবগণের নবাবী, আর সেই নবাবীর পরিচায়ক গগনস্পর্শী সৌধরাজী আমি একেবারেই দেখিতে যাই নাই। কবিত্বেরও একটা কাল আছে। আমাদের বয়সের ভাটা পড়িয়াছে, এখন আর কিছুর বাহিরের শোভা দেখিয়া মনে তৃপ্তি অনুভব

করি না। একটা ফুল, একটা ফল, একটী সুন্দর অট্টালিকা, এ সকল আর তাহাদের সৌন্দর্য্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। ইহারা আমাদের মত নীরস গদ্যসেবী মানুষের কড়াক্রান্তি গণনার চিন্তা রোধ করিতে পারে না। সে দিন আর নাই! নদীর কলতানে, বিহঙ্গের ললিত-কূজনে মোহিত হইবার দিন চলিয়া গিয়াছে, এ জীবনে আর ফিরিবে না।

লক্ষ্ণৌয়ে যাঁহাদের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম, প্রথমেই তাঁহাদের অভিবাদন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্রলোকদিগের আদর আপ্যায়ন, আহারের বন্দোবস্ত, চেষ্টা যত্নের যদি একটা ধারাবাহিক ফর্দ্দ দাখিল করিতে যাই, তাহাহইলে শ্রীমান জাহ্নবী সম্পাদকের আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু জাহ্নবীর অতি বড় সহিষ্ণু শ্রোতারও ধৈর্য্যচ্যুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। জীবনে অনেক পাতক সঞ্চয় করা গিয়াছে, সে গুলির সহিত আর একটির সংযোগ নাই বা হইল?

এখন গৌর চন্দ্রিকা রাখিয়া একেবারে লক্ষ্ণৌয়ের ইতিহাস-সমুদ্রে অবতরণ করা যাউক। লক্ষ্ণৌয়ের সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় বস্তু বেলীগার্ড বা বেলী গারদ। যে দিন আমি লক্ষ্ণৌ পৌছি, তাহার পর দিনই অপরাহ্নে সর্ব্বপ্রথমে বেলীগার্ড দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা করি। পূর্ব্বে আরও দুই চারিবার লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়াছি, নবাবদিগের কীর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু জানি না কিসের জন্য শতবার দেখিলেও বেলীগার্ড দেখিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, সেই ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপের মধ্যে এমন কি আছে, যাহাতে পথিকের দৃষ্টি তাহাতেই আকৃষ্ট হইবে। এমন লোককে আমি বেলীগার্ডের ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেই ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার আর সকলেই ভুলিতে পারেন, কিন্তু শ্বেতকায় ইংরাজ সে দিনের কাহিনী, সে সময়ের অভিজ্ঞতা সহজে ভুলিবেন না। সেই সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যে মহা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার আলোড়নে ইংরাজের রাজ্য থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, যে দাবদাহে অসংখ্য শ্বেতকায় নরনারী প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, ভারতের ইতিহাস সে নিদারুণ কাহিনী মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। বেলীগার্ডের জীর্ণ অট্টালিকা স্তূপ সেই বিপ্লবের এক অংশের সাক্ষী প্রদান করিতেছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহের কথা স্মরণীয় করিবার জন্য অনেক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, লক্ষ্ণৌয়ের বেলীগার্ড সে

অপেক্ষা রাখে নাই। সেই জীর্ণ অট্টালিকার ভিত্তি সকল উন্মত্ত সিপাহীগণের অতুল বীরবিক্রম এবং মুষ্টিমেয় ইংরাজের অভূতপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যের সাক্ষী স্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ের এই পুণ্যক্ষেত্রই যে সর্ব্বাগ্রে দর্শনীয়, এ কথা আমি অসঙ্কুচিত-চিত্তে বলিতে পারি; সুতরাং লক্ষ্ণৌয়ের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বেলী গার্ড দেখিতে যাওয়ায় আমার অপরাধ হয় নাই। যিনি আমার সঙ্গী হইলেন, তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন আমি বুঝি আর কখনও বেলী গার্ড দেখি নাই। তিনি যখন শুনিলেন, যে লক্ষ্ণৌয়ে এই আমার প্রথম আগমন নহে; আমি পথঘাট চিনি, বেলী গার্ডের প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড আমি গভীর মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি; তখন তিনি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তবে আর এত তাড়াতাড়ি কেন? আমি বলিলাম তীর্থশ্রেষ্ঠ বারানসী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেহ কি বিশ্বেশ্বর দর্শনে বিলম্ব করিতে পারে? কাশীযাত্রীর বিশ্বেশ্বর দর্শনও যা, লক্ষ্ণৌয়ে বেলীগার্ড দর্শনও তাই।"

আমার সঙ্গী বন্ধুটী বেলী গার্ডের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তেমন সজাগ ছিলেন না। তিনি কেরাণী মানুষ; অল্পকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরীর উমেদারীতে দেশ ছাড়িয়া এই সুদূর লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়াছিলেন। এখন একটি আফিসে কাজ কর্ম্ম করেন, দশটা ছয়টা আফিস করেন, অবশিষ্ট সময় ঘরগৃহস্থালীতে কাটাইয়া দেন। প্রথম প্রথম তিনি যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন এটা ওটা দেখিয়া বেড়াইয়াছেন; এখন আর সে সকল উৎসাহ নাই, ইচ্ছাও নাই; তবে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা মুল্লুক হইতে কেহ এ সকল স্থানে আসিলে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে এই প্রকার পথপ্রদর্শক হওয়ার কর্ম্মভোগ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমার সহৃদয় বন্ধুটী আমাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, তিনি পথপ্রদর্শক হইলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আমার নিকট ইতিহাস বলিতে পারিবেন না; সে সকলের সহিত তাঁহার সহিত সম্বন্ধ অনেককাল ঘুচিয়া গিয়াছে; তাহার বদলে তিনি রেল আফিসের নাড়ী-নক্ষত্র সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলিতে পারেন। আমি আমার বন্ধুটিকে আশ্বস্ত করিলাম; বেলী গার্ডে যেখানে যাহা আছে, তাহা আমার অজ্ঞাত নাই; আমি তাহার প্রত্যেক অংশ অনেকবার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি এবং উপযুক্ত ঐতিহাসিকের সাহায্যে সে সকল বুঝিয়াও লইয়াছি। এবারে

বেলীগার্ড দর্শন নূতন কোন তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নহে—শুধু স্থানটী দেখিবার জন্য। অতএব বন্ধুটি আমার সঙ্গে যাইতে কোন প্রকারই আপত্তি করিলেন না।

দুই জনে বাসার বাহির হইলাম। এখন গাড়ীভাড়া করি, কি এক্কা ভাড়া করি, ইহাই মীমাংসার বিষয় হইল। এক্কা নামক অনিন্দ্য-সুন্দর যানের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল; একটানে ৪০।৫০ মাইল পথ ঐ ক্ষুদ্র অশ্ব যোজিত পুষ্পকরথে চড়িয়া আমি ভ্রমণ করিয়াছি। তাহাতে সে সময়ে তেমন কষ্ট হয় নাই; আর কষ্ট হইলেও তাহা সহ্য করিবার শক্তি সামর্থ্য তখন আমার ছিল; কিন্তু এতকাল পরে এ যানের সহিত পুনরায় সখ্যতা স্থাপন আমার এই প্রৌঢ় দেহের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। লোটাকম্বলধারী হিমালয়-যাত্রীর সে দেহ আর আমার নাই; এখন আমি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালী; এখন জ্বরে কাঁপি আর কুইনাইন খাই, ডি গুপ্ত সেবন করিয়া ফলেন পরিচীয়তের সাক্ষ্য প্রদান করি। এখন এক্কায় চড়িয়া দুই চারি মাইল ভ্রমণ করা আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব মনে হয়। কাজেই বন্ধুবরের ব্যয়-সঙ্কোচের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া আমি গাড়ী ভাড়া করিবারই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। বন্ধু কেরাণী মানুষ; সামান্য বেতনে এই দূরদেশে সপরিবারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; পয়সা জিনিসটা যে নিতান্তই গাছের ফল নহে, তাহা উপার্জ্জন করিতে যে দশঘণ্টাব্যাপী সংগ্রাম প্রতিদিন করিতে হয়, উপরিতন দশগণ্ডা মনিবের রক্তনেত্র ভ্রুকুটীভঙ্গী সহ্য করিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন; তাই তিনি সামান্য একটু অসুবিধার জন্য অত্যধিক অর্থ ব্যয় অপত্তি করিলেন। তাঁহার আপত্তি যে খুব সঙ্গত তাহা স্বীকার করিতে আমিও কুণ্ঠিত হইলামনা; নবাব ওয়াজিদ আলি সাহের রাজধানীতে আসিয়া আমি যে নবাব হই নাই, একথাও তাহাকে বলিলাম; কিন্তু এক্কার ঝাঁকুনীতে যদি এই প্রবাসে আমার সুপ্ত ম্যালেরিয়া জাগিয়া উঠে তাহা হইলে দুই টাকা বাঁচাইতে গিয়া আট টাকা ব্যয়ের বেশী সম্ভাবনা আছে; এবং তাঁহাদের ন্যায় সহৃদয় বন্ধুগণেরও যথেষ্ট কষ্টের কারণ আছে, এই সকল গুরুতর আপত্তি জানাইয়া একখানি গাড়ীই ভাড়া করা গেল। ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরের ভাড়াটিয়া গাড়ী অপেক্ষা এখানকার গাড়ীগুলি দেখিতেও ভাল, চলেও ভাল; আর এখানকার গাড়ীর অশ্বগুলির ক্লেশ

নিবারণের জন্য কলিকাতার ন্যায় পশু-ক্লেশ-নিবারণী সভারও কোন দরকার হয় না।

ঘণ্টা হিসাবে গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা বরাবর বেলীগার্ডে যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে হুকুম দিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। আমার বাসা গণেশগঞ্জ; সেখান হইতে বেলীগার্ড বড় কমদূর নহে। বেলা তিনটার সময়ে চুপ করিয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিলে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হয়; আমার বন্ধুটী সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি কিছুক্ষণ গাড়ীর জানালা দিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু রাস্তায় এমন ধূলা যে, আমার সহর দর্শনের সাধ অল্পক্ষণেই নিবৃত্ত হইল; আমিও বন্ধুবর মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিলাম।

প্রায় একঘণ্টা পরে গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বরে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; আমরা চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটী বৃদ্ধ সিপাহী। এই সিপাহীকে আমি পূর্ব্বেও এখানে দেখিয়াছি; এই লোকটী বেলীগার্ডের সমস্ত ইতিহাস জানে; এ তাহার পড়া-বিদ্যা নহে—শোনা কথা নহে; বৃদ্ধ সিপাহী এই রেসিডেন্সীতে বন্দুক হস্তে প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল—সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন তাহার জাত ভায়েরা বিদ্রোহীর দলে যোগদান করিয়াছিল, তখন এই বৃদ্ধ তাহার যৌবনের সামর্থ্য, ইংরেজের নিমকের সম্মান রক্ষার জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিল—সে বিদ্রোহী হয় নাই। পরে পুরস্কার স্বরূপ সে সরকার হইতে মাসিক বৃত্তি পায়; আর যে কেহ বেলীগার্ডের অতুল কীর্ত্তি দেখিতে আসে, তাহাকে ইহার প্রত্যেক স্থান দেখায়; এমন কি কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া কবে সে প্রথম বিদ্রোহীগণের আক্রমণ দেখিয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত দেখাইয়া দেয়। এমন জীবন্ত ইতিহাসের সহায়তা পাইয়া অনেকেই ধন্য হইয়া যান; আমিও ইতিপূর্ব্বে এই বৃদ্ধকেই আমার 'গাইড' করিয়াছিলাম।

গাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার এই পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধকে অভিবাদন ও মিষ্ট সম্ভাষণ করিলাম। বৃদ্ধ আমার পরিচিত হইলেও আমাকে চিনিতে পারিল না; প্রতিদিন কতশত যাত্রী এই তীর্থক্ষেত্রে আগমন করিয়া থাকেন, আর এই ৭২ বৎসর বয়সের বুড়া তাহাদিগের সহিত দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া সমস্ত দেখাইয়া এই গেটের নিকট বিদায় দান করে; সকলের মুখ কি তাহার মনে থাকিতে পারে? তবুও বৃদ্ধ যে আমার পরিচিত,

আমি যে পূর্ব্বে দুই একবার তাহারই সাহায্যে এই স্থান দর্শন করিয়াছি, একথা তাহাকে জানাইয়া দিলাম ; সেও তখন হৃষ্টচিত্তে আমাদের সহিত বেলীগার্ডে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

রমণীর প্রাণ।

১

লোকে বলে সুকোমল, কুসুমকোমল অতি
রমণীর হিয়া,
আমি বলি কি জানি কি, এমন কঠিন হৃদি
গঠিত কি দিয়া ?
নহিলে নহিলে বল, কুসুমে পাষাণ-ভার
কেমনেতে সহে,
নহিলে এ হৃদয়েতে এত গুরুভার জ্বালা
কেমনেতে বহে ?
জানি না এমন হৃদি কেমন পাষাণ দিয়া
কিসেতে নির্ম্মাণ ?
লতা কিশলয় নয় কুসুমকোমলা নয়
রমণীর প্রাণ !

২

কি দেখে জগত ব'লে কোমলতাময়ী নারী
হৃদয় অসহ।
তা হ'লে কেমন ক'রে, নীরবে গোপনে বহে
যাতনা দুর্ব্বহ।
অগ্নিমুখী ধূমকেতু শত শত ভীম চিতা
হৃদয়ে যাহার,
একটী সামান্য দুঃখ সাগরে শিশিরকণা
কি করে তাহার ?
উত্তাল তরঙ্গময়ী অগ্নি-প্রস্রবণ সদা
যাহার হৃদয়ে,
অসীম ধৈর্য্যের বাঁধে কেমনে বাঁধিয়া হৃদি
বেড়ায় হাসিয়ে।
যাতনা—যাতনা বল যাতনা কাহারে বলে
তোমরা জান না।
রমণী হৃদয় দেখ, বুঝিবে কাহারে বলে,—
কি যে সে যাতনা।

হৃদয় বালুকাপূর্ণ শূণ্য মরুভূমি যার,
ধূ ধূ ধূ ধূ করা,
মস্তকে স্থিরতা নাই চক্ষের সম্মুখে সদা
ঘূর্ণিত এ ধরা।
কালিমা নাহিক মুখে, ঢাকা তুষানল বুকে
জ্বলে নিরবধি,
গভীর—গভীরতম, গভীর কূপের সম
রমণীর হৃদি।
এমন পরাণ যার, অনন্ত অগমশূন্য
মুখে তার হাসি
লতা নয়, ফুল নয়, কুসুমকোমলা নয়,
শুধু ধৈর্য্যরাশি।

৩

চক্ষের সম্মুখে যার সহসা ছিঁড়িয়া গেছে
জীবন-বন্ধন,
পুষ্প সুকুমারী হ'য়ে কেমনে পাষাণী সেই
যাপিছে জীবন ?
কেমনে রাক্ষসী সেই জীবনের সরবস্ব
রহিয়াছে ভুলে,
তেমনি দিবস যায়, তেমনি তাহারো দিন,
কাটে হেসে খেলে।
গভীর প্রাণের ক্ষত, তার কি মুছিয়া গেছে
হৃদয় হইতে ?
অথবা ছিঁড়িয়া গেছে কুসুমকোমল প্রাণ,
না পারি সহিতে ?
বন্ধন ছিঁড়িয়া গেছে অবিশ্রাম প্রাণ মাঝে
শুধু হাহাকার,
জগৎ দেখিছে চে'য়ে কুসুমকোমলা নারী
মুখে হাসি তার।

স্বপ্ন।

(২)

স্বপ্ন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঐ বিষয় কোন কোন উপনিষদ এবং সিফাৎইসিরোজা নামক গ্রন্থে প্রাচ্য ও প্রাচীন মত আলোচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মত প্রাচীন কালে প্লেটো, সিসিরো প্রভৃতি বিবৃত্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে মরে, উন্ট্, কার্পেণ্টার, স্কানার, ভকেণ্ট প্রভৃতি এ বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান এবং শারীর বিজ্ঞানের দিক হইতে স্বপ্ন নানারূপেই বিবেচিত হইয়াছে। সে সকল কথার পুনরালোচনা করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। কেবল যে সকল স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়, তাহাই এ প্রবন্ধে বিবেচনা করিব। অনেক সময় দেখা যায় যে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, কিন্তু স্বপ্ন দ্রষ্টার জানা ছিল না; অথবা ঐ বৃত্তান্ত ভবিষ্যৎকালে প্রকৃত পক্ষেই ঘটিয়া গেল। এইরূপ হইবার কারণ কি? যাহা সত্যই ঘটিয়াছে অথবা ঘটিবে তাহা স্বপ্নে কেমন করিয়া জানা যায়? এই অতি আশ্চর্য্যজনক ঘটনার মূল অনুসন্ধান করিতে পারিলে জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে; এই জন্যই এ বিষয় অতীব গুরুতর, এবং এই জন্যই ইহার সম্যক্ আলোচনা হওয়া উচিত।

অনেকেই জীবনে সত্য-স্বপ্ন * দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপ বলিতে পারেন না। কিছু দিন হইল আমি একটী সত্য-স্বপ্নের তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলাম; উদ্দেশ্য এই ছিল যে বহুসংখ্যক সত্য-স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানা গেলে, এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিবার সুবিধা হইবে। একুশটী সত্য-স্বপ্নের বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছি। তন্মধ্যে দুইটী প্রথম প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অদ্য আর তিনটী উল্লেখ করিব।

রাজশাহী জেলার জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘটক স্বপ্ন দেখিলেন—যে তাঁহার পিতা ভিজা গায়ে, ভিজা কাপড়ে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পিতার আর্দ্র কেশ এবং আর্দ্র বস্ত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে; এবং তিনি শীতে পীড়িত হইয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিবার পর মোহিনীমোহনের নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরে তিনি জানিতে

---

* এইরূপ স্বপ্নকে "সত্য-স্বপ্ন" বলা যাইবে।

পারিলেন যে তাঁহার পিতা ঐ স্বপ্ন দৃষ্ট সময়েই নৌকা ডুবিয়া গোয়ালন্দের নিকট নদী মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন ; এবং তখনই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সত্য স্বপ্নটী এইরূপ। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী জেলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জের অধীন খেটুয়ানী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্রবধূ অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার একটী পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। সত্যই প্রায় একমাস পরে তাঁহার একটী পৌত্র জন্মিল। এই ব্যক্তি অল্প দিন হইল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার পৌত্রী আসিয়া বলিতেছে, "দাদা, তুমি আমাকে আনিলে না ; আমি একাই আসিলাম।" পৌত্রী তখন নিকটবর্ত্তী কান্‌শোনা গ্রামে বাস করিত। এই স্বপ্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভাত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দর্শন করেন। পরে, বেলা ৯।১০ টার সময় সংবাদ পাইলেন যে ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সময়ে তাঁহার পৌত্রীর অভাব হয়।

পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া যদি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সাহায্য করেন, তবে এ বিষয়ের আলোচনা সফল হইলে পারে। তত্ত্বনির্ণয় পরের কথা ; প্রথমে বৃত্তান্ত সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। আমি নিম্নে যে ফরমটী দিলাম, পাঠকগণ যদি তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূরণ করিয়া দেন, তবে বিশেষ উপকৃত হই।

স্বপ্ন দ্রষ্টার নাম ধাম, বয়স।	সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে তাহা।	ঐ স্বপ্নের ঘটনাবলী। স্বপ্নে কোন দ্রব্য পাইয়া থাকিলে তাহা।	তৎকালীন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।	মন্তব্য

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

গভীর নিশীথে

থেমে' গেছে যত কলরব!
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ভরা শত-শব্দময়ী ধরা
যেন এবে হয়েছে নীরব।
এইতো ক্ষণেক আগে দুরন্ত শিশুর মত
করে'ছিল হুড়াহুড়ি কত,
ছুটাছুটী উর্দ্ধশ্বাসে, রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে আসে
কর্ম্মক্ষেত্রে যন্ত্র-পিষ্ট মত।
এই কত বেচা-কেনা এই কত আনাগোনা
কি-মায়াতে মিলাইল সব,
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সনে ডুবে' গে'ল সমীরণে
থে'মে গে'ল শত কলরব।

রাজপথে সারি সারি আলোকের স্তম্ভগুলি
দাঁড়ায়ে রয়েছে দুই পাশে,
উর্দ্ধে কৃষ্ণা-চতুর্থীর চন্দ্রমা মলিন মুখে
নীরবে মলিন হাসি হাসে।
কখন পথিক এক গান গাহি' চলে' যায়,
অর্দ্ধ ছত্র তা'র শুনা যায়;
কখন বিকট রবে কুক্কুর ডাকিয়া উঠে
চমকিয়া উঠে নিশি তা'য়।
চক্র-খড়-খড় শব্দ শুনা যায় কদাচিৎ
প্রহরীর প্রহরার রব;
সহসা জাগিয়া পাখী কখন ঝাড়িছে পাখা
আর সব হ'য়েছে নীরব।
আলো ও কুয়াসা মিলি' করি যেন গলাগলি
দুই ভাইবোনে করে খেলা,
চন্দ্রমা নক্ষত্রহীন নীলাম্বরে দাঁড়াইয়া
দেখে তাই একেলা একেলা।
অদূরে কুটীর আর সৌধমালা, তরুরাজি
আলো ও কুয়াসা দিয়া মাখা;
যেন নীল আকাশের নীল-পটে, অসমাপ্ত
এ এক বিচিত্র চিত্র আঁকা।

শুনেছ কি কোন দিন—গীতধ্বনি, ধ্বনিহীন?
নীরবতা বাঁশরীর সুর?
নিশির হৃদয় মাঝে নীরব সঙ্গীত বাজে
ঝুম্ ঝুম্ মধুর মধুর!
সন্ধ্যা যবে কনে' সাজে গগন-অঙ্গন-মাঝে
রাঙ্গা মেঘ ললাটে কুঙ্কুম,
থেকে' থেকে' কেঁপে ওঠে কেন যে তাহার তনু
প্রাণে বাজে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্।
শিশু যবে ছুটে আসে দূর হ'তে মা'র পাশে
মা তাহার মুখে দেয় চুম্,
নীরব চুম্বন-মাঝে অপূর্ব্ব সঙ্গীত বাজে
সুমধুর ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্!
দিন-শেষে ক্লান্ত তনু শিথিল অলস-ভরে
খসে' পড়ে, চোখে আসে ঘুম,
স্বপ্ন-সম প্রাণ মাঝে নিশির সঙ্গীত বাজে
ধ্বনিহীন ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্!

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বাতাস বহিয়া যায়
মন্দালসে শ্লথ তনু তা'র,
অঁাচল ভরিয়া বুঝি ল'য়েছে লুণ্ঠন করি
ফুল-রেণু, পরিমল ভার,
বহিতে পারে না তাই আর।
শুভ্রমেঘ ভেসে যায় নীরবে আকাশে,
মানবের হৃদয়ের শতেক কামনা যেন
ভাসিতেছে তার চারি পাশে।
আকাঙ্ক্ষা, খুঁজিয়া যেন তার চির-আকাঙ্ক্ষিতে
পথ নাই কোলাহলে ঘুরে,

আজি স্তব্ধ রজনীতে করিয়াছে যাত্রা তাই
দূরে—অতি দূরে কোন পুরে!
পতি-বিয়োগিনী-বালা নিদ্রাঘোরে অচেতন
প্রাণ তার ঊর্দ্ধদেশ দিয়া
পতির উদ্দেশে গে'ছে; স্বপনে সে প্রিয়মুখ
হেরি তাই উঠে চমকিয়া।

কে বলে হারা'য়ে যায় মরণের অন্ধকারে
প্রাণপ্রিয় প্রিয়মুখগুলি,
কে বলে অমর প্রাণ শ্মশানে মিশায়ে যায়
ধূলি সনে হ'য়ে যায় ধূলি!
এ তীব্র আকাঙ্খারাশি, ক্ষুদ্র দেহ পারেনাকো
রাখিবারে যাহারে ধরিয়া,
আকাঙ্খিত-অন্বেষণে কত যুগ যুগ হ'তে—
কে জানে সে মরিছে ঘুরিয়া!
উৎসাহ অপরিমেয় তীব্র অনলের সম
দিবস-রজনী প্রাণে জ্বলে,
এ কভু সম্ভব হয়, সে অনল নিবে যায়
তুচ্ছ এক চিতার অনলে?
রজনি, মহিমাময়ি, নক্ষত্রমালিনি অয়ি,
কত যুগ-যুগান্তর দিয়া,
তোমার ও নয়নের স্তব্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টি
ধরা পানে র'য়েছে চাহিয়া।
দেখিয়াছ কতদিন অন্ধকারে ঢাকি অঙ্গ
(অন্ধকারময় প্রাণ তার!)
হত্যাকারী চলিয়াছে কার্য্য-সাধনের তরে
চারিদিক আঁধার, আঁধার!
পাণ্ডব-শিবির যবে নিদ্রা-ক্রোড়ে অচেতন,
চুপি চুপি অশ্বত্থামা চলে,
সঘনে নিশ্বাস বহে, কম্পিত শরীর তার
উল্কাসম আঁখিতারা জ্বলে;
আজিও তোমার আছে অঙ্গে সেই প্রতিবিম্ব
তাই উঠি আতঙ্কে শিহরি,
তিমিরবসনা ভীমা মূরতি হেরিয়া তোর
অয়ি নিশি, অয়ি ভয়ঙ্করি!
নব-তপস্বিনী সীতা পথশ্রমে ক্লান্ত তনু
পতি-বাহু উপাধান করি—
তরুতলে নিদ্রামগ্না জেগেছিলে সারারাতি
শিয়রেতে তুমি বিভাবরি!
কোন্ জ্যোৎস্নাময়ী রাতে তপস্বিনী মহাশ্বেতা
নিমগনা পুণ্ডরীক ধ্যানে,
স্বর্গ-হতে সুধারাশি ঝরিয়া পড়িতেছিল,
স্নিগ্ধ দিক্ জ্যোৎস্না-বরিষণে।
এখনো এখনো যেন হেরি সে অপূর্ব্ব ছবি
তোমারই মাঝে নিশিথিনি,
শুভ্রাম্বরা শুভ্রচিত্তা মহাধ্যানে নিমগনা
অয়ি নিশি, অয়ি তপস্বিনি!
কত সুখ, কত দুঃখ, কত পুণ্য, কত পাপ,
কত হাসি-রাশি অশ্রুজলে
এখনো রয়েছে মাখা তোমার ও অঙ্গখানি
আছে ভরি তোমার অঞ্চলে!
আর ও কত বর্ষ যাবে আবার আসিবে বর্ষ
এমনি আসিবে কত যামী,
রজনী ফুরাবে কত তবুও রজনী র'বে
তেমনি তখনো র'ব আমি।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

অনুরোধ-রক্ষা।

(১)

শুক্লা চতুর্দ্দশীর চন্দ্র ধীরে ধীরে আরাবল্লী পর্ব্বতের উপর উঠিতেছিল। সন্ধ্যার মৃদুল পবনে দিবসের শেষ স্বরলহরী ঢালিয়া, পাপিয়া, দহিয়াল রাত্রির জন্য একে একে কুলায় আশ্রয় করিতেছিল। দিবসের স্বর-কোলাহল নিবৃত্তির সহিত নীরব আরাবল্লীর উপত্যকায় শৈলসুতা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মৃদু কুলু-কুলুধ্বনি ধীরে ধীরে শ্রুতিগোচর হইতেছিল। লতাগুল্মাচ্ছাদিত নিভৃত নিকুঞ্জে প্রস্ফুটিত বন্যকুসুম সান্ধ্য সমীরণ কর্তৃক অপহৃতসৌরভ হইয়া, বুঝি অভিমানে ঈষদান্দোলিত হইয়া পরস্পরকে মনের কথা জানাইতেছিল। নীরব আরাবল্লীর অত্যুচ্চ শৈলশিখর চন্দ্রকরবিভাসিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মার অনন্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার সাক্ষী দিতেছিল।

এমনি সময়ে শৈলশিখরে এক যুবক একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। বুঝি প্রকৃতির শোভারাজি তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই; তথাপি চিন্তামগ্ন মন এই প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ঝিল্লীমন্দ্রে আকৃষ্ট হইতেছিল; কিন্তু সে ক্ষণমাত্র! তৎক্ষণাৎ আবার পূর্ব্বের চিন্তায় নিমগ্ন হইতেছিল। যুবকের সুদীর্ঘ পূর্ণায়ত দেহে—বিশাল বক্ষে, আজানুলম্বিত বাহুযুগলে বীরত্ব উছলিয়া পড়িতেছিল। বীরের গভীর কৃষ্ণ-বর্ণ মুখের সরলতার ও শারীরিক সৌন্দর্য্যের কোনও ক্ষতি করে নাই। যুবক বৈশাখী মেঘের মত স্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। পার্শ্বেই শাল-যষ্টি নির্ম্মিত দীর্ঘ কার্ম্মুক, পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণ। যুবকের নাম সর্দ্দার ভামসাহ। অল্প বয়সেই পিতৃমৃত্যুবশতঃ তাহাকে প্রথম যৌবনেই ভীলসর্দ্দার হইতে হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প হইলেও, ভীলপালে এরূপ বলশালী আর কেহই ছিল না। কাজেই পালের প্রধানেরা তাহাকেই সর্দ্দার মনোনীত করিয়াছিল। সকলেই বলিত, ওরূপ অব্যর্থ লক্ষ্য, নির্ভীক্ হৃদয়, অমিত তেজ শুধু রাজপুতেই সম্ভবে। তাই মহারাণা প্রতাপসিংহ বলিতেন,—ভামসাহ পূর্ব্ব জন্মে রাজপুত ছিল।

একবার আহেরিয়ার দিন মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার অমরসিংহ একাকী একটী বন্যবরাহের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়েন। প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া বরাহ বনান্তরালে আশ্রয় লইয়াছিল; কিন্তু বিশেষ উত্যক্ত হইয়া শেষে বিপুল বেগে কুমারের দিকে

ধাবিত হইল। সকলেই প্রমাদ গণিলেন। নির্ভীক্‌-হৃদয় কুমার নিপুণতা সহকারে অশ্বসঞ্চালন করিয়া, তৎপ্রতি দীর্ঘ শূল নিক্ষেপ করিলেন। দারুণ বেগে শূল বরাহের পশ্চাদ্ভাগ বিদ্ধ করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। বরাহ মরিল না, পরন্তু দ্বিগুণ বেগে কুমারের নিকটস্থ হইয়া দংষ্ট্রাঘাতে অশ্বের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। এক লম্ফে কুমার ভূতলে অবতরণ করিলেন ; কিন্তু শিলায় পদভ্রষ্ট হওয়ায় দাঁড়াইতে পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। দূরে মহারাণা ভীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে কুমারের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। পার্শ্বচর রাঠোর চৌহান যোদ্ধাগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। রাজপুতের ভরসা, শিশোদীয় কুলগৌরবরবি বুঝি অস্তমিত হয়! হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া বরাহ পড়িয়া গেল ; সকলে দেখিল, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘ শূল তাহার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়াছে। সকলেই সোৎসুকে দেখিল, পার্শ্বস্থিত উপলখণ্ডে গম্ভীর-ভাবে সর্দ্দার ভামসাহ দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তে রাঠোর চৌহান দলপতিগণ অসিকোষে হস্তার্পণ করিলেন। রাজপুতের আহেরিয়ায় ভীলের যোগদান অমার্জ্জনীয় অপরাধ! মহারাণা সকল বুঝিলেন। সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "ও ভবানীর শূল আমিই উহাকে দিয়াছি। ভামসাহ ভীল হইলেও রাজপুত।" সস্নেহে মহারাণা পুত্রপ্রাণরক্ষাকর্ত্তাকে কোল দিলেন এবং সাদরে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তা'রপর আহেরিয়ার ভোজে তাহাকে 'দোনা' দিলেন। কৃতজ্ঞ ভামসাহ এই মহাসম্মান লাভ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এ সম্মান ভীলের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই, ঘটিবার আশাও কেহ কখন করে নাই। নির্ব্বাক ভামসাহ মস্তকস্থ উষ্ণীষে 'দোনা' কয়টি বাঁধিয়া রাখিল এবং আনন্দা-ধিক্যবশতঃ গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "মহারাণা! ভীলের হস্তে এ 'দোনার' অবমাননা কখনও হইবে না।" সেই দিন হইতে ভীল সর্দ্দার মহারাণার পার্শ্বচর হইল। কোনও বিপদ হইলেই শতশত ভীল যোদ্ধা ধনুর্ব্বাণ লইয়া ভামসাহের অধীনে মহারাণার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইত। ভীলের প্রতি রাজপুতের ঘৃণার ভাব বিদূরিত হইল। তাই কুমার সেলিম-চালিত বাহিণী হল্‌দীঘাটে শিবির স্থাপিত করিলে মহারাণা কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ জন্য সর্দ্দারদের সহিত পরামর্শ করিতে ভামসাহকে রাত্রে পর্ব্বত শিখরে আসিতে বলেন। দিনমানে সর্ব্বত্রই মুসলমানের চর। যথাসময়ের বহুপূর্ব্বে ভামসাহ পর্ব্বত-শিখরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্তর্ব্বিরোধের আশঙ্কায় কোনও দুই জন সেনাপতিকে মহারাণা একস্থানে আসিতে বলেন

নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সর্দ্দারদের মধ্যে গৃহবিবাদ না বাধে, এ জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন। ভামসাহ মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ দেখিতেছিল, কেহ আসিতেছে কি না। শুষ্কপত্রের মর্ম্মরশব্দে, রাত্রিচর জন্তুগণের ইতস্ততঃ গমন-শব্দে, মহারাণার আগমন কল্পনা করিয়া সে ত্রস্ত হইতেছিল; আবার পরক্ষণেই নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইতেছিল। উষ্ণীষের কোণ হইতে গ্রন্থি খুলিয়া সেই কত বৎসর পূর্ব্বের "দোনাগুলি" সে একবার দেখিল; প্রীতি-ভক্তিতে তাহার হৃদয় প্লাবিত হইল। ভামসাহ 'দোনা' দাতার আগমনে বিলম্ববশতঃ ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। একটী ক্ষুদ্র পক্ষী এরূপ সময়ে মনুষ্য সমাগমে আশ্চর্য্য হইয়াই বুঝি ভামসাহের মাথার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহার শাখা-আশ্রয়ত্যাগের শব্দে প্রতিবারই ভামসাহ ত্রস্ত হইয়া মহারাণার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। দুই একবারের পর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষুদ্র পক্ষীর উপর ভীলসর্দ্দারের ক্রোধের উদয় হইল। পক্ষীকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বামহস্তে ধনু লইয়া দক্ষিণ হস্তে বাণ লইল। পরক্ষণেই কি ভাবিয়া কটিবন্ধ হইতে একটি বাটুল গ্রহণ করিল। পক্ষী নিজ বিপদ বুঝিয়াই বুঝি একটু ঊর্দ্ধে মস্তকের উপরিভাগে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই চন্দ্রকরতলে নির্নিমেষে মনুষ্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। লক্ষ্য স্থির করিয়া ভামসাহ ধনুকে আকর্ণ পূরিয়া টান দিল। টঙ্কার শব্দ নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া উঠিল। অব্যর্থ সে সন্ধান! পরক্ষণেই রুধির রঞ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র পক্ষী শত হস্ত দূরে লুটাইয়া পড়িল।

"ছি! ছি! নিরপরাধে সামান্য প্রাণীহত্যা কেন করিলে?" ভামসাহ চমকিত হইয়া দেখিল পার্শ্বেই একাকী মহারাণা।

কুণ্ঠিত হইয়া ভামসাহ মহারাণাকে প্রণাম করিল; পরে বলিল, "পাখিটা বড় বিরক্ত করিতেছিল।" মহারাণা বলিলেন, "ছি! সামান্য বিরক্তির জন্য তোমাকে যদি কেহ বিনাপরাধে হত্যা করে, তোমার স্ত্রীর দশা কি হইবে?"

কথাটি ভামসাহের প্রাণে বাজিল। উভয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপে পক্ষীটির নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার প্রাণবায়ু বহুপূর্ব্বেই অনন্তে মিশাইয়া গিয়াছে! পক্ষিণী সঙ্গীহীন হইয়া মস্তকোপরি ডাকিয়া ডাকিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। সেই স্বরে যেন কত মনোবেদনা, যেন কত করুণা মিশিয়া সেই নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাষ্পাকুল নয়নে ভামসাহ সেই নিশ্চল দেহটিকে তুলিয়া লইল। সামান্য নিষ্ঠুরতায় ভীলের চক্ষে কখনও জল আসে

না, তবে কি ভামসাহ মহারাণার অসন্তোষ ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছিল? ত্া' নয়। পক্ষিণীর কাতর কাকলীতে মহারাণার কথা তাহার মনে পড়িতেছিল; সে কেবল শুনিতেছিল "তোমাকে যদি কেহ বিনাপরাধে হত্যা করে, তোমার স্ত্রীর দশা কি হইবে?"

মনুষ্যমাত্রেই আজন্ম কবি। মধুর ভাব বা করুণার প্রস্রবণ মানব-হৃদয় মাত্রেই বিরাজিত। ঘটনা-বশতঃ আবরণ উন্মোচিত হইলেই কবিত্বের প্রস্রবণ ফুটিয়া বাহির হয়। একদিন এই কাতর কাকলীতেই দস্যু রত্নাকর কবি হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য কি যে, নিষ্ঠুর নিরক্ষর ভীলের হৃদয়ে সেই সহজাত-বৃত্তি ঘটনার সাহায্যে ফুটিয়া উঠিবে!

মহারাণা সবই বুঝিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "ভামসাহ! আত্মীয়ের শেষ অধিকারে পক্ষিণীকে বঞ্চিত করিও না। পক্ষিটিকে রাখিয়া আমার সঙ্গে এস, অনেক কথা আছে।"

মৃতপক্ষী পরিত্যাগ করিয়া ভামসাহ অন্যমনস্কভাবে মহারাণার সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া উভয়ে শিলাতলে উপবেশন করিলেন। ভামসাহ বলিল, "মহারাণা, আমি এই উপত্যকার রন্ধ্র প্রভৃতি প্রত্যেক স্থান অবগত আছি। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে আপনি কিরূপে এত উপরে আসিলেন? আমি ত দেখিতে পাই নাই!" ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীরভাবে মহারাণা বলিলেন, "বালক, যদি এইটুকুই না পারিব, তাহা হইলে মোগলের চর-হস্তে আজ বহুদিন মহারাণা প্রতাপসিংহকে বন্দী হইতে হইত। থা'ক সে কথা। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, সেলিম সদলবলে হলদীঘাট উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছে; সঙ্গে সেই রাজপুত কুলাঙ্গার আছে।" বলিতে বলিতে রোষে ঘৃণায় মহারাণার বাক্‌রুদ্ধ হইল। ভামসাহ বলিল, "মহারাণা! এত নূতন কথা নহে। সমগ্র রাজপুত ও ভীলের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে উদ্বেগের কারণ কি?" গম্ভীরভাবে মহারাণা বলিলেন, "তাহা আমি জানি, তাই বলিতেছি, শুন ভামসাহ, এবার অন্যবার অপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন। সেই কুলাঙ্গার এ প্রদেশের পথঘাট সমস্তই বিশেষরূপে অবগত আছে। তোমার বোধ হয় মনে আছে, সে পূর্ব্বে একবার আমার অতিথি হয়। আমি তাহার সহিত একত্রে আহার করি নাই। কোনও প্রকৃত রাজপুত, ম্লেচ্ছের সহিত যাহার ভগ্নির বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত একত্র আহার করিতে পারে না। কুলাঙ্গার সেই অবমাননার প্রতিশোধ দিবার জন্য এবার

আসিয়াছে। বনবাসী মহারাণা-পরিবারকে বিপন্ন করাই তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেইজন্য আমি মনস্থ করিয়াছি, মহারাণী প্রভৃতিকে তোমাদের দুর্ভেদ্য শৈলাবাসে পাঠাইয়া দিব। তাহারা তথায় নিরাপদে থাকিবে। তবে এক ভাবনা, আগামী পরশ্ব তোমার ছয় শত ভীল যোদ্ধার কার্ম্মুকটঙ্কার আমার রাজপুত বীরদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে; কিন্তু রাণাপরিবারের প্রহরায় থাকিবে কে?"

ভামসাহ সগর্ব্বে গর্জ্জিয়া বলিল, "মহারাণা! আমার ছয় শত ভীলযোদ্ধা যদি হল্‌দীঘাট উপত্যকায় শরজালে সূর্য্যতাপ আবরণ করিয়া আপনার রাজপুত যোদ্ধাগণের শ্রমাপনোদন করিতে ব্যাপৃত থাকে, তাহাতেই বা উদ্বেগ কি? আমার স্ত্রী সুহানিয়া এ দাসের অপেক্ষা বলে বা অস্ত্রশিক্ষায় ন্যূন নহে। সে একাকিনী মহারাণা-পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থা হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"আচ্ছা, তবে তাহাই হউক। কিন্তু স্মরণ রাখিও—আগামী পরশ্ব হল্‌দী-ঘাটে ছয়শত ধানুকীর লক্ষ্য-ভেদ শিক্ষা দেখাইতে হইবে।"

ভামসাহ নিস্তব্ধে ভূমি পর্য্যন্ত শির নত করিয়া সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। মস্তক তুলিয়া সে মহান্ বীরত্বের ছবি আর দেখিতে পাইল না। সেই ইন্দুজ্যোতি বিভাসিত পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিল, কিন্তু মহা-রাণার সেই সৌম্যমূর্ত্তি চকিতে কোথায় লতাকুঞ্জান্তরালে লুকাইয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সেই নির্ভীক ভীলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এ কি মন্ত্রসাধন না ইন্দ্রজাল! দূরে স্রোতস্বিনীর ক্ষীণ কলকলের সহিত মিশ্রিত ধ্বনি শুনিল—"জয়! ভবানীমায়িকি জয়!" তখন ভামসাহও বলিয়া উঠিল, "জয়, ভবানীমায়িকি জয়!" তখন শত শৈলশিখরে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল, "জয় ভবানী-মায়িকি জয়!"

শিবাকুলের দ্বিপ্রহর রজনীর চীৎকারস্বর পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া উঠিল। ভামসাহ আকাশে দৃষ্টি করিয়া মধ্যগগণে চন্দ্র দেখিল। রজনী গভীর অনুমান করিয়া সে ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিল। কিয়দ্দূর আসিয়া মৃত পক্ষীসঙ্গিণীর করুণ শব্দে আকৃষ্ট হইল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল, মহারাণার কথিত উক্তি আবার মনে পড়িল। ভীলের ভয়! ভামসাহ কখনও ভয় জানে না। পুনরায় সে দ্রুত পদবিক্ষেপে পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিল।

(২)

আরাবল্লা উপত্যকার একদেশে একটী গভীর বন ছিল। শাল, পিয়াল, তমাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য বৃক্ষ সকল বিপুলদেহে উন্নতশীর্ষে পরস্পর বিজড়িত-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকৃতি নির্ম্মিত দুর্ভেদ্য প্রাচীর রূপে প্রতীয়মান হইত। লতাগুল্মাদি ঘনভাবে বৃক্ষশাখাগুলিকে পরস্পরের সহিত দৃঢ় বন্ধনে বাধিয়াছে। মধ্যাহ্নে ক্বচিৎ রবিকর পত্রান্তর রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিতে পারে। মানুষ দূরের কথা, সে গহনবনে অনেক জন্তুও প্রবেশ করিতে পারে না। নির্ভীক ভীলেরা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ তাহার মধ্যে যাইত না। তাহারা বলিত পুরাকালে ওখানে এক কাপালিক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শক্তি-মূর্ত্তির সম্মুখে নিত্য মনুষ্য বলিদান হইত। একদিন কাপালিক শেষ সিদ্ধির জন্য একটী কুমারী অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সিদ্ধির সময় কুমারীর আকুল ক্রন্দনে মা কালী স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া কপালিকের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন। তদবধি সেই বনের নাম 'সতীবন' বলিয়া লোকে জানিত। সকলেরই বিশ্বাস ছিল, ও বনে অসতীদের স্থান নাই। তাই ভীলেরা অনেক সময়ে কাহারো সতীত্বে সন্দিহান হইলে, তাহাকে উহার মধ্যে পাঠাইয়া পরীক্ষা করিত, নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে প্রতিপন্ন হইত, সে সতী।

উপরে আমরা যে দিবসের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তৎপরদিবস ভীলপালে সকলে ঠিক করিল, মহারাণা। পরিবারদের লইয়া ভীলসর্দ্দারিণী সুহানিয়া উহার মধ্যে প্রেরিত হইবে; কারণ শত্রুচর সর্ব্বত্র ঘুরিতেছে। আরও, সতীবনে শত্রুচরেরাও সতীদের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই পরামর্শ স্থির হওয়ায় কয়েকজন ভীলযুবক উহার মধ্যে একটী গহ্বরের সন্নিকটে কতকটা স্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত করিল। গহ্বরের ভিতর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় পরিষ্কার স্থান থাকায় মহারাণীর শিশুসন্তানেরা তাহার ভিতর থাকিবে স্থির হইল।

এক দিবস মধ্যাহ্নে মহারাণী ও তাঁহার পুত্রবধু ঘাসের রুটি প্রস্তুত করিতেছিলেন; দূরে সুহানিয়া একাকিনী বসিয়া তাঁহাদের দেখিতেছে আর ভাবিতেছে,—"কি করিলে মানুষ অমন সুন্দর হয়?" যৌবনের পূর্ণতায় তাহার লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছে। তাহার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অবয়ব, সুগোল হস্তপদ দেখিলে বোধ হয়, সুহানিয়ার বাহুতে গৃহকর্ম্মের উপযোগী বল অপেক্ষা ঈশ্বর অনেক অধিক বল দিয়াছেন। মহারাণীর ছোট বালিকাকে দেখিয়া সুহানিয়ার বাল্যজীবনের কথা মনে

পড়িতেছিল। সুহানিয়া ভাবিতেছিল, ঐরূপ বয়সে সে কেমন বন্যবিড়ালের ন্যায় পাহাড়ের উপর দৌড়িয়া বেড়াইত! পাহাড়িয়া ভীলরমণীরা তাহাকে দেখিয়া বলাবলি করিত, সে একদিন সর্দ্দারণী হইবে। তখন ক্রমে ক্রমে তাহার কৈশোরের কথা মনে পড়িতে লাগিল। কেমন সে তাহার পিতার নিকট ধনুক ও বাঁটুল লইয়া লক্ষ্যভেধ শিক্ষা করিত; বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার বল ও লক্ষ্য-কুশলতা দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে কেমন প্রশংসা করিত; এ সকল অতীতের কথা একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার বিবাহের কথা মনে পড়িল। একদিন তাহার পিতাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাপ, কাঁদিস্ কেন?" পিতা উত্তর করিয়াছিল, "ভীলপালে তাহার মত ভাল মেয়ে আর নাই, কড়ি থাকিলে সে সর্দ্দারের বেটা ভামসাহের সহিত তাহার সাদি দিত!" সেদিন সুহানিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কেন, সর্দ্দারের বেটার সঙ্গে সাদি দিতে হ'লে কি কি চাই?" বৃদ্ধ পিতা উত্তর দিয়াছিল, "একটা গাই, এক কলসী তাড়ী ও দু'গাছি কড়ির মালা।" সুহানিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "সে আনিয়া দিবে।" তখন সুহানিয়া ভীলসর্দ্দারের বলিষ্ঠ পুত্র ভামসাহ যেখানে পিতার ক্ষেত্ররক্ষা করিতেছিল তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। সমবয়স্ক অনেক ভীলবালক বালিকা তথায় উপস্থিত ছিল; তাহারা সকলে "কড়ার" খেলিতেছিল। কড়ার ছিল; যে শস্যাপহারক উড্ডীয়মান পারুই পাখীকে এক বাটুলে মারিতে পারিবে সে "কড়ার" পাইবে। এক বাঁটুলে বালকেরা কেহ পারিতেছিল না! কেবল ভামসাহ পারিতেছিল, তা সেইত কড়ার বাঁধিয়া দিয়াছে; কাজেই খেলা চলিতেছিল। ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা কিশোরী সুহানিয়া, তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে সেখানে দৌড়িয়া আসিল; কড়ার খেলা দেখিয়া হাসিল। ভামসাহকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "ও কি খুব ভারি খেলা?" ভামসাহের লক্ষ্যশক্তি-বিমুগ্ধ বালিকারা হাসিয়া উঠিল। কিশোর ভামসাহ রাগিয়া বলিল, "যে পারে করুক, কড়ার ত' ধরা রহিয়াছে।" তখন হাসিতে হাসিতে সুহানিয়া ধনুক উঠাইল, পরে দক্ষিণহস্তে ধনুক উঠাইয়া বামহস্তে আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কার দিল। বাঁটুল ছুটিল, উড্ডীয়মান পক্ষী ভূতলে পড়িল। সুহানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই দেখ, আমি বাঁ হাতে পাখী মারিলাম!" ভামসাহ অপ্রস্তুত হইল, সে বরাবর দক্ষিণ হস্তে নিশানা করিতেছিল। ক্ষোভে ভামসাহ গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল, "আচ্ছা কড়ার নে।"

ধনুক ও বাঁটুল—কড়ার দেখিয়া সুহানিয়া বলিল, "ও আমি কি করিব? ও তুই নে।" তখন ভামসাহ বলিল, "যদি পায়ে করিয়া ধনুক টানিয়া কেহ এইরূপ পাখী মারিতে পারে, তা হ'লে সে যে কড়ার চাহিবে তাহাই পাইবে।" অনেক ভীলবালক চেষ্টা করিল না। ত্ব' একজন যাহারা চেষ্টা করিল, তাহারা কেহই লক্ষ্য বিঁধিতে সক্ষম হইল না। তখন ভামসাহ হাসিতে হাসিতে শয়ন করিল; পরে বামপদ উর্দ্ধ করিয়া ধনুক ধারণ করিল এবং দক্ষিণ হস্তে বাঁটুল লইয়া আকর্ণ পূরিয়া টান দিল। ভ্রমর গুঞ্জনবৎ জ্যা প্রতিঘাত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গতপ্রাণ পক্ষী ভূতলে পতিত হইল। সুহানিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ও আর কি! আমি বাঁ হাতে পারি।" এই বলিয়া সেইরূপে বামহস্তে লক্ষ্যভেদ করিল। বালকবালিকারা সকলে আশ্চর্য্যে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "কই কড়ার দাও।" ভামসাহ সুহানিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল। সুহানিয়া বলিল, "আমি লইব না।" ভামসাহও ছাড়িবে না। শেষে সুহানিয়া বলিল, "তবে একটা গাই, এক কলসী তাড়ী আর ৬'গাছা কড়ির মালা লইব।"

ভামসাহ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা দিব, কিন্তু এ সব তুই কি করবি?" সুহানিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "বাবা বলেছে, এ সব জিনিষ হ'লে, সর্দ্দারের বেটার সঙ্গে আমার সাদি হ'বে।" তখন ভামসাহ বলিল, "আচ্ছা, আমি তোকে সাদি করবো।" বালকবালিকারা সকলে বলিল, "হাঁ, এ সর্দ্দারণীই বটে!" তখন সকলে মাদল ও করতাল আনিল। মহাসমারোহে বালক-বালিকারা সেই শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের ভাবী সর্দ্দারণীর বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিল। ভামসাহের পিতা এ কথা শুনিয়া খুব সুখী হইয়া ভারি ভোজ দিল। ভীলপালের বৃদ্ধেরা বলিয়াছিল, এমন ভোজ কখনও হয়নি। ভামসাহের নাম মনে হওয়ায় সুহানিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, "কই, ভামসাহ ত' আসিল না? সে যে আজ আসিবে ব'লেছিল!"

"সুনিয়া—সুনিয়া!" সুহানিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল মহারাণী হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, সুহানিয়া মহারাণীকে ব্যস্ত দেখিয়া বলিল, "কি মাই জি!" মহারাণী বলিলেন, সুনিয়া! ঐ দেখ, কিসের শব্দ; বুঝি চর লেগেছে।" ত্রস্ত হইয়া সুহানিয়া দাঁড়াইল এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। বন্য বিড়ালের ন্যায় অন্ধকার দেখিতে অভ্যস্ত সুহানিয়া দূরে—অতিদূরে গাঢ়বনের ঘনান্ধকারের মধ্যে শুভ্র একটা পদার্থ দেখিতে

পাইল। সুহানিয়ার শরীর কণ্টকিত হইল। কে ভামসাহ? পরক্ষণেই সুহানিয়া দেখিল একজন যবন হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। ব্যস্ততা-বশতঃ সুহানিয়া ভামসাহের পরামর্শ ভুলিয়া গেল। ত্বরিতে ধনুক উঠাইয়া লইল; তূণীর হইতে বাণ লইল, পরে লক্ষ্য স্থির করিয়া শর নিক্ষেপ করিল। "ইয়া আল্লা" রবে চীৎকার করিয়া শুভ্র পদার্থ কোথায় গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সেই রব মন্দীভূত হইতে না হইতে নানা দিক হইতে "আল্লা হো আকবর" রব উঠিত লাগিল।

তখন সুহানিয়ার চৈতন্য হইল। বিপদে গোলোযোগ না করিয়া কৌশলে গুহাভ্যন্তরে আত্মগোপন করিবার জন্য ভামসাহের পরামর্শ তাহার মনে পড়িল; কিন্তু তখন আর ভাবিয়া কি হইবে? সুহানিয়া একবার ভাবিল পূর্ব্ব পরামর্শমত আত্মগোপন করে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, যবন যখন সন্ধান পাইয়াছে, তখন লোক না দেখিলে সন্দেহ করিবে।

"মাইজী যাইয়ে" বলিয়া সুহানিয়া সকলকে গহ্বর দেখাইয়া দিল। মহারাণী প্রভৃতি সকলে গহ্বরে প্রবেশ করিলে চকিতে সে ধনুক রাখিল; পরে অমানুষিক বলে প্রকাণ্ড প্রস্তর অবলীলাক্রমে দুই হস্তে উঠাইয়া লইয়া কৌশল ক্রমে গহ্বর পথে চাপাইয়া দিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে লতাগুল্ম দ্বারা প্রস্তর খণ্ড ঢাকিয়া দিল। উঠিবার পূর্ব্বেই একজন যবন সৈন্য বন হইতে বহির্গত হইয়া তাহাকে ধরিল ও বলিল, "বাঁদী, মহারাণার লোক কোথায়?" নির্ভয়ে সুহানিয়া হাসিয়া বলিল, "কি জানি।" তখন ক্রোধে সৈন্য অসি নিষ্কোসিত করিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই অপর একজন আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "হাফেজ! বাঁদী বড় খপ্‌সুরৎ।" বলিতে বলিতে পাষণ্ড সুহানিয়াকে চুম্বন করিতে গেল। সুহানিয়া হাসিতে হাসিতে অসি উত্তোলন দেখিয়াছিল; কিন্তু এখন শিহরিয়া উঠিল। ভীমপদাঘাতে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "সতীবনে বেইজ্জৎ! কালীমায়ীজি মাফ্‌-করবেন না।" তখন চতুর্দ্দিকে অসিফলক ক্ষীণ আলোকে ঝলসিয়া উঠিল। সুহানিয়া প্রমাদ গণিল। ভামসাহকে মনে পড়িল; কিন্তু কোথায় ভামসাহ! ভামসাহ যে বলিয়াছিল, "সতীবনে জানানার বেইজ্জৎ হয় না!" কালীমায়ী বুঝি সে নীরব ক্রন্দন শুনিলেন; পশ্চাতে কে হাঁকিল, "খবরদার!"

তখন বজ্রাহতের ন্যায় সকলে চমকিয়া উঠিল; পলকে অসি কোষে প্রবিষ্ট হইল। দ্বাবিংশবর্ষীয় সুন্দর এক মুসলমান যুবক সম্মুখে আসিয়া বলিল,

"কে তুই?" সুহানিয়া বলিল, "আমি সুহানিয়া, সর্দ্দার ভামসাহের জানানা। মুসলমানের ভয়ে এখানে লুকাইয়া আছি; পরে ঐ পাষণ্ড—" সুহানিয়া আর বলিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে?" যুবক হাসিল, কিছুই বলিল না; পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি উত্তর করিল, "চিনিস্ না বাঁদী—সমসের আলি—আমাদের মালেক আর মহারাণার দুষ্‌মন!" ইত্যবসরে যুবক কি ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কয়েকজন সৈন্য সেই অপরাধীকে বাঁধিয়া ফেলিল।

যুবক তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সুহানিয়া! ভামসাহকে বলিও মোগল জানানার বেইজ্জত করে না। তা' কর্‌লে খোদার গোসা হয়।" সুহানিয়া হাসিয়া বলিল, "বন্দেকী সাহেব, খোদা আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।" যুবক কি ইঙ্গিত করিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে বনের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

ক্ষণপরে দূরে আবার পদশব্দ শ্রুত হইল। সুহানিয়া গিয়া দেখিল, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ভামসাহ আসিতেছে। ভামসাহ তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "সুহানিয়া, এইমাত্র শুনিলাম, গোয়েন্দা সতীবনের খবর দিয়াছে, তাই কয়েকজন মুসলমান এই দিকে আসিয়াছিল; সেই সংবাদ লইবার জন্য একা আসিয়াছি।" তখন সুহানিয়া একে একে সকল কথা বলিল, শুনিয়া ভামসাহ আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল। সুহানিয়া মহারাণার উপকার করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া তাহার হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল, বলিল,— "সুহানিয়া! তীর মারিয়া ভাল কর নাই; প্রকাশ হইয়া পড়িলে ত'! যা' হ'ক কালীমায়ী সতীবনে সতীর মান রক্ষা করেন।" তখন ভামসাহ যুক্তকরে বলিয়া উঠিল,—"জয় কালীমায়ী কি জয়!" সুহানিয়াও বলিয়া উঠিল,—"কালীমায়ী কি জয়!" শৃঙ্গে শৃঙ্গে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল,— "কালীমায়ী কি জয়!"

ভামসাহ বলিল, "সুহানিয়া, তবে এখন যাই। কাল যুদ্ধ হইবে। হল্‌দীঘাটে মোগল আসিয়াছে। যদি বাঁচিয়া থাকি ত' আবার এইখানে দেখা হইবে; নতুবা—" আর বলিতে পারিল না; উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

সুহানিয়া কাঁদিতেছিল। সে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "হাঁ মহারাণীও বলেন, মানুষ মরিয়া গাছে থাকে না, উপরে যায়। কত উপরে, যেখানে চাঁদ

থাকে ?" ভামসাহ বলিল, "কত উপরে জানি না। মহারাণার নিকট শুনিয়াছি স্বর্গে যায়।" ইহারা রাজপুতগণের নিকট পরকালের কথা শুনিয়া তাহাদের পূর্ব্ব বিশ্বাস ছাড়িতেছিল। তাহারা ভাবিত, মানুষ মরিয়া গাছে থাকে না, স্বর্গে যায় ; কিন্তু এ কথাও মানিত যে, রাজপুতের মত মরিতে না পারিলে গাছেই থাকিয়া যায়।

নীরবে দুই জনে বসিয়া রহিল। ক্ষণপরে ভামসাহ সুহানিয়ার কৃষ্ণাধরে সস্নেহে চুম্বন করিয়া গাত্রোত্থান করিল। মহারাণার কাজ করিতে হইবে, প্রিয়তমার নিকট বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তখন সুহানিয়া ডাকিয়া বলিল,—"ভামসাহ, যে মুসলমান সেনাপতি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নাম সমসের আলি। তিনি তোমাকে বলিতে বলিয়াছেন যে, 'মোগল জানানার বেইজ্জৎ করে না, তাহা করিলে খোদার গোসা হয়।' ভামসাহ তখন সুহানিয়ার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুহানিয়া হাসিয়া আবার বলিতে লাগিল, "লোকটা ভাল। তুমি একটু মেহেরবানী ক'রে তাহার বুকে বাণ ফেলিও না। ইহা আমার অনুরোধ।" ভামসাহ একটু অগ্রসর হইয়া সুহানিয়ার হর্ষোৎফুল্ল অধরে আবার চুম্বন করিল ; পরে ক্ষিপ্রগতিতে সে বনের ভিতর কোথায় মিশাইয়া গেল, সুহানিয়া দেখিতে পাইল না। একবার শুধু শুনিতে পাইল, "আমার অনুরোধ!"

(৩)

প্রাতঃকাল হইতেই মোগল সেনার রণবাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। সহস্র সহস্র মোগল সারি গাঁথিয়া হলদীঘাটের উপত্যকায় আর একবার রাজপুতের সহিত বল পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

নিঃশব্দে প্রতাপসিংহ সজ্জিত হইতে লাগিলেন। নিঃশব্দে রাঠোর, চৌহান, সোলাঙ্কি, শিশোদীয় বীরগণ অন্তর্ব্বিরোধ ভুলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন—পিতাপুত্রে, ভ্রাতায়ভ্রাতায় প্রেমালিঙ্গন! এ আলিঙ্গন বড়ই পবিত্র। কেহই জানে না এজন্মে আর সে প্রিয়তমের সহিত—বন্ধুর সহিত—পূজ্যতমের সহিত এরূপে আলিঙ্গন করিতে পারিবে কিনা।

দুই ধারে অত্যুচ্চ শৈলমালা প্রকৃতি-গঠিত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; মধ্যে অনতিবিস্তীর্ণ উপত্যকা। যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ, প্রতাপ সেইখানে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন ; কারণ তাঁহার দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি মোগলের অগণিত সৈন্যের গতিরোধ করিতে প্রয়াসী

হইয়াছেন। প্রতাপের সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও, তাহারা প্রত্যেকেই স্বদেশের জন্য—স্বজাতির জন্য—স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাহারা চায় - শোণিতের পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা রক্ষা—জীবনের পরিবর্ত্তে জাতীয়তা রক্ষা—শরীরের পরিবর্ত্তে সম্ভ্রম রক্ষা—আর মস্তকের পরিবর্ত্তে মহিমা রক্ষা।

ঊষার প্রাক্কাল হইতে ছয়শত ভীলযোদ্ধা সর্দ্দার ভামসাহের অধীনে পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের দীর্ঘ দেহ কৌপীন মাত্রে আবৃত। স্ব স্ব ধনুক লইয়া তাহারা সেনাপতির আজ্ঞা প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মহারাণা হাঁকিলেন, "জয়, ভবানী-মায়ীকি জয়!" তখন সহস্র সহস্র কণ্ঠে সেই ধ্বনি উঠিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতি-ধ্বনি হইল "জয়, ভবানীমায়ী কি জয়!" শিশোদীয় কুলের শ্বেতছত্র প্রতাপের মস্তকে শোভা পাইল। তখন প্রতাপ অশ্বে কষাঘাত করিলেন। অশ্ববর চৈতক প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিল; মুহূর্ত্তমধ্যে চৈতক বিদ্যুতবেগে ধাবিত হইল। তখন শোলাঙ্কি, রাঠোর, চৌহান, ভট্ট প্রভৃতি কুলের যোদ্ধাগণ স্ব স্ব সেনা-পতির সহিত প্রচণ্ড বেগে মুসলমান বাহিনীর উপর পড়িল। মুসলমানেরাও ক্ষীণহস্তে অস্ত্রধারণ করে না। সুদক্ষ সেনাপতি চালিত হইয়া তাহারাও "আল্লা হো আকবর" রবে মেদিনী কাঁপাইয়া রাজপুতের বেগ প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, আগ্নেয়-অস্ত্রের শব্দ, বিপন্নের আর্ত্তনাদ বিজেতার উল্লাসরব একত্রে মিশাইয়া তখন এক ভয়ঙ্কর কোলাহলের সৃষ্টি করিল। অপর দিকে ভীলগণ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত শর-বৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা উচ্চে থাকায় মোগল সৈন্যের গোলা তাহাদের নিকট পৌছিতেছিল না; কিন্তু ভীলপালের অব্যর্থ সন্ধানে শত শত যবন সৈন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছিল।

সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। পাঠক, সে বীরত্ব, সে মহত্ত্ব-কাহিনী ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে ক্ষোদিত আছে, এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া রাজপুতের মহিমা ঘোষণা করিবে। হলদিঘাটের গিরি-গহ্বরে দ্বাবিংশ-সহস্র রাজপুত স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের জন্য সেইদিন আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল মানুষের যাহা সাধ্যাতীত প্রতাপ সেই দিন তাহাই দেখাইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে প্রতাপ-চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কথিত আছে, সপ্তস্থানে আহত হইয়া প্রতাপ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহ ও যুবরাজ

সেলিমকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হয়েন। সে দিন সেলিমের হস্তী আহত হইয়া না পলাইলে ইতিহাসে জাহাঙ্গীর বাদসাহের নাম কখন স্থান পাইত কি না সন্দেহ! একবার মহারাণা অদম্য উদ্যমে ও অসীম উৎসাহে আত্মবিস্মৃত হইয়া বহুদূর অগ্রসর হয়েন, সেই সময়ে তাঁহাকে বহুশত মোগল সৈন্য ঘিরিয়াছিল; কেবল ঝালাপতি মান্নার কৌশলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়; কিন্তু স্বদেশ-ভক্ত প্রতাপের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া মান্নাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভীলগণ অবিশ্রান্ত তীরবর্ষণ করিয়া শত শত মোগলকে ধরাশায়ী করিতে-ছিল। ভামসাহ স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে থাকিয়া দলেরলোকদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল; হঠাৎ অপর দিকে শব্দ হইল। ভামসাহ মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া দেখিল একজন রাজপুত অশ্বারোহী। অমনি শত শত ভীল সে দিকে লক্ষ্য করিল, এবং অনুমতির অপেক্ষায় ভামসাহের মুখের দিকে চাহিল। ভামসাহ নিরস্ত হইতে বলিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "কে তুমি?" পাঠক! তখনকার দিনে রাজপুত হইলেই চলিত না, মানসিংহের সহচর অনেক সহস্র রাজপুত কুলাঙ্গার মাতৃভক্ত রাজপুতের রক্তে হল্‌দীঘাটের মহাতীর্থ কলঙ্কিত করিয়াছিল।

অশ্বারোহী হাঁকিল "ভবানী," ভামসাহও হাঁকিল "ভবানী"; তখন শত শত ভীল আবার মোগলবিনাশ-কার্য্যে মন দিল। অশ্বারোহী আসিয়া কহিল, "মহারাণা বলিলেন, পঞ্চাশ জন লোক লইয়া দক্ষিণের রন্ধ্রপথে মোগল-সেনার প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে।"

ভামসাহ সসম্ভ্রমে অশ্বারোহীকে অভিবাদন করিল। মস্তকের উষ্ণীষে হাত দিল; একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থি দেখাইয়া বলিল, "এই দৌনার আশীর্ব্বাদে ভামসাহ মহারাণার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন করিবে।" তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ জন বিখ্যাত লক্ষবেধনিপুন ভীলযোদ্ধা লইয়া ভামসাহ দক্ষিণ রন্ধ্রপথে গমন করিল। অশ্বারোহী যাইবার সময় বলিয়া গেল, "সর্দ্দারজী, দেখিও যেন মোগল-সেনাপতি ঘোড়াশুদ্ধ তোমার ঘাড়ে না পড়ে।" ভামসাহ হাসিয়া বলিল, "দাঁড়াইয়া থাকিতে নহে।" তখন ভামসাহের দল রন্ধ্রপথে অবতরণ করিতে লাগিল।

ভামসাহ দেখিল, ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে পাশাপাশি অতি অল্প লোকই অগ্রসর হইতে পারে। সে তখন দুই শ্রেণীতে তাহার লোকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মোগলদের গতিরোধ করিতে প্রস্তুত রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে "আল্লা হো

আক্‌বর” রবে সেই রন্ধ্রপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া মোগল অশ্বারোহীদল আসিতে লাগিল। তখন ভামসাহ “কালী মায়ীকি জয়” বলিয়া ধনুক উঠাইল। চকিতের মধ্যে পঞ্চাশটী তীর নিক্ষিপ্ত হইল, “ইয়া আল্লা” বলিয়া পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। ধন্য সে শিক্ষা! ধন্য সে নির্ভীকতা! বারে বারে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ভীলপালের অব্যর্থ সন্ধানে বাণবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল; তখন তাহাদের সেনাপতি অগ্রে আসিলেন, রেকাবদানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “শুন ভাই সকল, সমস্ত দিবসের বীরত্বের পর কয়েকটি ভীলের নিকট পরাজিত হওয়া অপেক্ষা মোগলের আর অপমান নাই। আইস আমার সহিত, খোদার উপর নির্ভর করিয়া জোর কদমে চল। আমরা ঐ কয়েকটা ভীলের উপর লাফাইয়া পড়ি।” তখন সেনাপতি হাঁকিল “আল্লা হো আক্‌বর!” সৈন্যগণও উচ্চকণ্ঠে বলিল, “আল্লা হো আকবর। সমসের আলি কি জয়!”

তীব্রবৎ সে ধ্বনি পঞ্চাশ জন ভীলের কর্ণে প্রবেশ করিল। তীব্রবৎ সে ধ্বনি ভামসাহের হৃদয়ে প্রবেশ করিল; অকস্মাৎ ভামসাহের হস্ত হইতে ধনুক পড়িয়া গেল। পার্শ্বস্থ ভীল বলিল, “সর্দ্দার, বড় মেহনত হয়েছে, একটু দম নাও।” ভামসাহ হাসিয়া বলিল “না।” “আল্লা হো আক্‌বর” রবে তখন মুসলমান সৈন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। মুহুর্ত্তে আবার পঞ্চাশ তীর ছুটিল। কত অশ্বারোহী পড়িয়া গেল; কিন্তু মোগল সেনাপতি হাঁকিল “হটিও না ভাই, আমার সাথে এস।”

তখন ভামসাহ সব ভুলিয়া গেল; ধনুকে আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কার দিল। টঙ্কার শব্দে ভামসাহ যেন শুনিল “আমার অনুরোধ!” ভামসাহ ততক্ষণ শুভ্র উষ্ণীষধারী অগ্রগামী সেনাপতি সমসের আলির বক্ষ লক্ষ্য করিয়াছিল; জ্যা হস্তচ্যুত হইলেই সমসের ভূতলস্থ হইবে; কিন্তু ভামসাহ আবার শুনিল কে যেন বড় করুণস্বরে তাহার কাণে বলিতেছে, “লোকটা ভাল, ওর বুকে বাণ চালাইওনা। আমার অনুরোধ!” ভামসাহের বীরহৃদয় ঈষৎ আন্দোলিত হইল, হস্ত ঈষৎ উত্তোলিত হইল; ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ শব্দ করিয়া বাণ ছুটিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমসের আলির দিল্লীর কারুকার্য্য খচিত উষ্ণীষ গগনমার্গে চালিত হইয়া কোথায় পড়িয়া গেল। সমসের ভাবিল, ‘খোদাকা মেহেরবাণী!’ মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী সৈন্য তখন সেনাপতি সমসের আলি পরিচালিত হইয়া

ভামসাহের অতি সন্নিকটে পৌছিল। অগ্রগামী সমসের হাঁকিল, "সর্দ্দারকে মারিওনা, ঘোড়াশুদ্ধ ঘাড়ে পড়িয়া বাঁধিয়া ফেল।"

ভামসাহের তখন মহারাণার দূতের বিদ্রূপ মনে পড়িল; ঈষৎ হাসিয়া আবার আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান করিল কিন্তু আবার যেন শুনিল, "আমার অনুরোধ!" তখন ভামসাহ সমসেরের অশ্ব লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। আহত অশ্ব চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল; অশ্ব পড়িবার পূর্ব্বেই সমসের লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং নিষ্কোশিত অসিহস্তে ভীলদলের উপর পড়িল। অন্যান্য অনুচরবর্গেরা ভীলদিগকে আক্রমণ করিল। অন্য অস্ত্রে অভ্যস্থ না থাকায় সেই পঞ্চাশজন ভীল সহজেই পরাভূত হইল। ভামসাহ ইতঃপূর্ব্বেই মোগলের গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট জীবিত ভীলগণকে মোগলেরা বাঁধিয়া ফেলিল। একজন মোগল সৈন্য ভামসাহের উষ্ণীষ লইয়া তাহাকে বাঁধিতে গেল। শোণিতস্রাবে মৃতপ্রায় হইলেও এ অপমানে ভামসাহ গর্জ্জিয়া উঠিল। মহারাণার দোনা যবনস্পৃষ্ট হইবে, ইহা তাহার সহ্য হইল না। বিগততেজ-শরীরের সমস্ত বল একত্র করিয়া সেই সৈনিকের মস্তকে দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিল; সৈনিক পড়িয়া গেল। অন্য সৈনিকেরা এ অপমানে উত্তেজিত হইয়া ভূপতিত ভামসাহকে কাটিতে উদ্যত হইল। সমসের আলি তাহাদের নিবৃত্ত করিয়া হাঁকিয়া বলিল, "সর্দ্দারজী, আমার পাগড়ী উড়িল, ঘোড়া পড়িল, কিন্তু আমার বুক ঠিক রহিল, এ কি রকম নিশানা?"

মৃত্যু তখন ধীরে ধীরে ভামসাহকে আশ্রয় করিতেছিল; তৃষ্ণায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল; কথা কহিবার প্রয়াস পাইলেও কোন কথা বাহির হইল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে আরাবল্লী উপত্যকার প্রতি অঙ্গ কালিমা আবরণে আবৃত করিতেছিল; হঠাৎ মৃত মনুষ্য যেন বাঁচিয়া উঠিল। ভামসাহ ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল "আঃ ঐ পাখীটা!" সমসের সস্নেহে কাছে বসিল; সেই দীর্ঘবপু, বীরত্বের আধার ভামসাহকে দেখিয়া তাহার বীর-হৃদয় বিগলিত হইল। মৃতপ্রায় সর্দ্দারের মস্তক নিজের ক্রোড়ে লইয়া বলিল, "কি সর্দ্দারজী, ও ত' একটা ছোট পাখী মাথার উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে।" ভামসাহ অনেক কষ্টে বলিল, "হাঁ, মহারাণা তাই সেদিন বলিয়াছিলেন।" সমসের আলি পুনর্ব্বার বলিল, "সর্দ্দার, সামান্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতেই আজ তুমি মরিলে। আর একটু নীচে নিশানা করিলে আজ তুমি বাঁচিতে, আমি

মরিতাম!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভামসাহ বলিল, "পারিতাম, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া করি নাই।" সমসের তখন সর্দ্দারের অন্তিম সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বলিবার আছে?" ভামসাহ বলিল, "হাঁ, মহারাণাকে খবর দিও, তাঁহার দোনার অপমান হয় নাই। আর—আর, সুহানিয়াকে বলিয়া পাঠাইও ভামসাহ তাহার অনুরোধ-রক্ষা করিয়াছে।" সেনাপতি চকিতে শিহরিয়া উঠিল। সুহানিয়া—সুহানিয়া! সুহানিয়ার অনুরোধ! সমসের সব বুঝিল; তখন ফিরিয়া ডাকিল, "ভামসাহ!" কিন্তু ভামসাহ তাহার অনতিপূর্ব্বেই মহারাণা কথিত উপরে সেই রাজপুতের স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বসু।

প্রার্থনা।

১

কোথা তুমি সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা
কোথা তুমি বিঘ্নবিনাশন!
জানি না তো কতদূর, তোমার বৈকুণ্ঠপুর,
জানি না কেমনে তোমা
করি আবাহন।

২

জানি আমি অক্ষম দুর্ব্বল,
জানি তুমি জগতজননী,
যাহা সাধ, যাহা আশা, যাহা মরমের ভাষা
আমরা কেমনে ক'ব
জানিছ আপনি।

৩

যদিও মা, পরাণের কথা
ভাল ক'রে শিখিনি বলিতে,
শিশু যদি অশ্রুবাণ, তবুতো মায়ের প্রাণ,
সবি যে বোঝেন মাতা
দেখিলে কাঁদিতে।

৪

আজি বর দেহ মা বরদে।
দূর হোক সকল নীচতা,
হিংসা দ্বেষ-দলাদলি, শত দূরে যাক্ চলি,
উচ্ছলি উঠুক বুকে
তোমারি মমতা।

৫

প্রাণে দেহ পবিত্র বাসনা
দেহে দেহ অমর-শকতি,
করিতে তোমার কাজ, ত্যজি যেন ভয় লাজ
হৃদয় ভরিয়া দেহ
সাত্বিকী ভকতি।

৬

তুমি দেছ মানব-জনম
আমি যেন করিনা বিফল,
যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, যাহা কিছু তব কর্ম্ম,
তাহাই করিতে দিও
মিনতি কেবল।

শ্রীমানকুমারী দাসী।

ভাষাবৃত্তি ও ভাষা বৃত্ত্যর্থ নামক টীকা।

রাজসাহী প্রদেশ এক সময়ে পাণিনি পঠন-পাঠনের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামে এক বা ততোধিক সংস্কৃত টোল ছিল, তথায় পাণিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। চাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ বহুসংখ্যক টোল বিদ্যমান ছিল, এবং অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈয়াকরণ রাজসাহী প্রদেশে বিদ্যমান ছিলেন। ক্রমে স্কুলকলেজের সমাদর-বৃদ্ধি এবং পৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে সংস্কৃত অধ্যয়নের শিথিলতা উপস্থিত হওয়ায় অন্যান্য জেলার ন্যায় রাজসাহীর টোলগুলিও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে ক্বচিৎ কোন গ্রামে সংস্কৃত টোল দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে

আর পাণিনি ব্যাকরণ কেহ অধ্যয়ন করেন না, সহজ উপায়ে কাজ-চালান মত মুগ্ধবোধ বা কলাপ ব্যাকরণের কতকাংশ পাঠ করাই যথেষ্ট গণ্য হইয়াছে। সে যাহা হউক, রাজসাহী অঞ্চলে সংস্কৃতাবস্থার সমুন্নতির সময়ে পাণিনি ব্যাকরণ যে বৃত্তির সাহায্যে পঠিত হইত তাহার নাম "ভাষাবৃত্তি" বা "লঘুবৃত্তি," উহা পুরুষোত্তমদেব নামক পণ্ডিতের রচিত, এবং যে টীকার সাহায্যে ঐ বৃত্তি পঠিত হইত তাহা সৃষ্টিধর কৃত টীকা। ইহা ব্যতীত কাশিকা বৃত্তি ন্যাস, বাগ্মত ও নন্দন প্রভৃতি অনেক ব্যাকরণ গ্রন্থও অধীত হইত। প্রধানতঃ ভাষাবৃত্তি ও সৃষ্টিধর কৃত টীকাই সর্ব্বত্র পঠিত হইত। এই পুরুষোত্তমদেব ও সৃষ্টিধর আচার্য্য মহাপুরুষদ্বয় কোন সময়ে কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারা যায় নাই। সৃষ্টিধরের টীকার একস্থানে লিখিত আছে, গৌড়ের অধিপতি শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনের আজ্ঞায় পুরুষোত্তমদেব ঐ ভাষাবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। (১) ঐ কথার উপর নির্ভর করিলে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণসেনের শাসনকালে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়, কিন্তু পুরুষোত্তমদেব অথবা সৃষ্টিধর স্বয়ং নিজের কোন পরিচয় দেন নাই, বৃত্তিকার পুরুষোত্তমদেব এবং টীকাকার সৃষ্টিধর আচার্য্য উভয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। উঁহাদের কৃত গ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরুষোত্তম বৌদ্ধ ছিলেন; গ্রন্থারম্ভেই তিনি বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়াছেন, (২) এবং মধ্যে মধ্যে উদাহরণ এবং প্রত্যুদাহরণে লোকায়ত মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টিধর আচার্য্য আস্তিক হিন্দু ছিলেন। টীকার মুখবন্ধে তিনি হরিহরকে প্রণাম করিয়াছেন। (৩) এমন কি পুরুষোত্তমদেবের নামটীও আস্তিক পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

---

(১) "বৈদিক প্রয়োগানর্থিনো রাজ্ঞঃ লক্ষ্মণ সেনায আলভ্যা" ইত্যাদি।

(২) নমো বুদ্ধায ভাষায়াং যথাত্রি মুনি লক্ষণম্।
পুরুষোত্তম দেবেন লঘ্বী বৃত্তির্বিধীয়তে॥

(৩) মুর মর্দ্দনং পুর মর্দ্দনং মা রমণমুমা রমণম্
কণধর তল্পং কণাধর বন্দে বানারিমসম বানারিম্।
"নত্বা গুরূন্ বিচার্য্য প্রাচীন সংগ্রহ কৃতাঞ্চমতানি
শ্রী সৃষ্টিধরাচার্য্যো লঘুবৃত্তে গৌরবং ক্রিয়তে।"
"ন্যাস গ্রন্থার্থ তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা শালিভিঃ
শোধ্যোয়ং করুণা বদ্ভিঃ কৃতিভির্মে পরিশ্রম।

(১) সৃষ্টিধরের টীকা আড়ম্বর শূন্য। তাহাতে তর্কশাস্ত্রের জটিল ভাষা আদৌ গৃহীত হয় নাই। তর্কগুলি সহজভাষায় উত্থাপিত করিয়া সমাধান করা হইয়াছে; কোন জ্ঞাতব্য বিষয় ত্যাগ করা হয় নাই। অথচ ভাষা অতি সরল পদ-পদার্থবোধের বিশেষ উপযোগী এরূপ সরল টীকা অতি বিরল। সাধারণে এই টীকা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু এতঃপূর্বে এ টীকা মুদ্রিত হয় নাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কৃত এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তক তালিকায় দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ টীকা সোসাইটীর পুস্তকালয়েও নাই। রাজসাহী অঞ্চলের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের বংশধরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বহু পরিশ্রমে আমি অনেক হস্ত-লিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেখিতেছি যে কোন স্থানেই সম্পূর্ণ পুস্তক নাই। পাণিনি ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে এবং বত্রিশ পাদে বিভক্ত। আমার সংগৃহীত পুস্তকের মধ্যে কোন কোন পাদের টীকার বহু সংখ্যক পুস্তক পাওয়া যায়, আবার কোন কোন পাদের একাধিক টীকা পাওয়া যাইতেছে না। পুস্তকগুলি প্রায়ই অশুদ্ধ এবং পাঠান্তরযুক্ত। বোধ হয় পণ্ডিতগণ পাঠ্যাবস্থায় উহা লিখিয়াছিলেন, অথবা অন্য দ্বারা লিখাইয়া লইয়াছিলেন। পরে আর সংশোধন করেন নাই। মুখে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। ছাত্রগণও পাঠকালে তাদৃশ পাণ্ডিত্য লাভ না করায় সংশোধনের প্রয়াস করেন নাই। আবার হয়ত এমনও হইয়াছে যে এক পুস্তক দেখিয়া অন্য পুস্তক লিখার সময়ে আদর্শ পুস্তকের টিপ্পনীগুলিকেও ভ্রমক্রমে টীকার একাংশ বোধে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে বহু পাঠান্তর হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে অসঙ্গতিও হইয়াছে। আমি কয়েকজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন পাণিনীয় পণ্ডিত দ্বারা বহু পুস্তকের সাহায্যে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ পুস্তক শুদ্ধ করিয়া একটী আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি।

ভাষাবৃত্তির পাঠে জানা যায় যে পাণিনি ব্যাকরণের বৈদিক অংশ পরিত্যাগে ঐ বৃত্তি রচিত হইয়াছে। সৃষ্টিধর লিখিয়াছেন,—"বৈদিগ প্রয়োগানর্থিনঃ রাজ্ঞা লক্ষণ সেনস্য আজ্ঞয়া।" রাজা লক্ষণ সেনের অভিপ্রায়

(১) শ্রীপুরুষোত্তম দেবস্তোতি।

যস্মাৎ ক্ষর মত মতীতোহ মক্ষরাদপিচোত্তমঃ।

অতোধুস্মিন্ লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।

ইত্যস্যচ বিদুষস্তদা শ্রয়ং নাম" ইত্যাদি।

অনুসারেই পুরুষোত্তমদেব বৈদিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ বৃত্তির নাম 'ভাষাবৃত্তি' অথবা "লঘুবৃত্তি" দিয়াছিলেন। সৃষ্টিধর কিন্তু টীকাতে বহুতর ছান্দস সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈদিক সূত্রগুলির মুদ্রণ না হইলে পাণিনি ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গ হইবে না এ জন্য আমি মনে করিয়াছি যে বৈদিক সূত্রগুলিও অন্য কোন বৃত্তির সাহায্যে মুদ্রিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। কাশিকা অথবা সিদ্ধান্ত কৌমুদীর বৃত্তি ঐ অভাব পূরণ করিতে পারে। যে যে স্থলে ঐরূপে পূরণ করা হইবে তথায় ঐ ঐ বৃত্তির উল্লেখ করিতে হইবে।

এই টীকার নাম ভাষা বৃত্ত্যর্থ বিবৃতি। (১)

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

---

[১]

ওহে বণিকের জাতি, পণ্যজাবিগণ!
মা'র তরে সন্তানের এই আকিঞ্চন
দেখিয়া হেসো না আজ। জান, কার তরে,
মানদণ্ড স্থলে শোভে রাজদণ্ড করে?
পণ্য নহে, পুণ্য আর মঙ্গলের তরে
তোমাদের আগমন—ভুলো না তা জানি।
কিন্তু তোমাদেরো আগে বঙ্গ-কুলাঙ্গার
দিয়ে আততায়ী করে দেশ আপনার,
নিজ ঘরে হইয়াছে সেধে পরবাসী,
আপনারে দাস করি জননীরে দাসী!
পিতৃ-পিতামহ কৃত সে অতীত গ্লানি,
আজ বঙ্গ-সন্তানেরা রাজদ্রোহ জানি;
করিতেছে প্রায়শ্চিত্ত, তুচ্ছ অন্য পণ
সে ক্ষতি পুরাতে চাই সকল সমর্পণ।

[২]

তোমরা আসিছ দুষি' বহুদিন হ'তে
'রাজভক্ত নই মোরা'। থাক্ মিথ্যা ওতে।
ছিলাম আমরা মানি, শক্তি-ভক্তিহীন;
কতগুলি কাপুরুষ, দীন পরাধীন,

---

(১) ভাষা বৃত্ত্যর্থ বিবৃতৌ শ্রীসৃষ্টিধর শর্ম্মণা বিবৃতঃ প্রথমঃ পাদঃ প্রথমাধ্যায়-সঙ্গত॥

করিতেছিলাম শুধু ভক্তি-অভিনয়!
তোমরা শিখাতেছিলে ভুলি দ্বিধা-ভয়
কারে কহে ভক্তি, মুক্তি। এতদিন পরে
ফলিয়াছে সেই শিক্ষা; তাই ভীতিভরে
সে শিক্ষা নাশিতে চাহ! টিকিবে কি আর
প্রবাহে বালির বাঁধ? চিনেছি এবার
স্বদেশ-রাজারে: তুলি তাঁরি জয়ধ্বজা
আজ মোরা লক্ষ কোটি রাজভক্ত প্রজা
করিতেছি রাজপূজা! ঝুটার বিদায়;
তাও যদি বল ঝুটা, তবে বড় দায়!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

আমার জীবন।*

প্রায় দুই বৎসর হইল, একদিন অপরাহ্নে (১৯০৪ সালের ২২শে আগষ্ট). বায়ু সেবনে বহির্গ[illegible] হইয়া বাড়ী ফিরিবার সময়, গুরুদাস বাবুর দোকানে বা মজুমদার লাইব্রেরীতে ঠিক মনে না[illegible] প্রবেশ করিয়া অন্য পাঁচখানি পুস্তকের সঙ্গে একখানি "আমার জীবন" ক্রয় করিয়া আনি[illegible] রাত্রি জাগরণ করিয়া সেই তারিখেই উক্ত গ্রন্থপাঠ শেষ করি। বালকের নিকট অ[illegible] পন্যাস যেমন মিষ্ট লাগে, আমাদের আধুনিক সভ্যতার বর্ত্তমান সামাজিক দুর্দ্দিনে[illegible] নিকট স্বর্গীয়া রাসসুন্দরীর জীবন ঠিক তেমনি মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

কৈশোরে যখন আমার লোকান্তরিতা প্রাতঃস্মরণীয়া পিতামহীর নিকট একঘে[illegible] ও পুরাণাদির কাহিনী শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া বৈচিত্র্যের জন্য তাঁহাকে[illegible] তুলিতাম, তখন তিনি বলিতেন—"তবে শোন্, আমার বাপের বাড়ীর গল্প বলি[illegible] সেই প্রসঙ্গে তাঁহার শ্বশুর বাড়ীর অর্থাৎ আমাদের বাড়ীর কথাও আসিয়া পড়িত। [illegible] গৃহের বর্ণ-সমষ্টিতে লিখিত অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের বঙ্গসমাজের একখানি সমগ্র সম্পূ[illegible] আমার কিশোর হৃদয়-পটে বিচিত্র মহিমায়, আলো ও ছায়ার উদার অভিনব কিরণ-সম্পাতে অতি সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং বহুকাল যাবত তাহা অবিকৃতও ছিল। "আমার জীবনে"এ প্রদত্ত চিত্র এই একই চিত্রের নিখুঁত প্রতিলিপি। যিনি এই গ্রন্থপাঠ করিবেন এবং যিনি অশীতিবর্ষীয়া পিতামহীর নিকট গল্প শুনিয়াছেন তিনিই ইহা বুঝিবেন। তাই সে গভীর রাত্রে সমালোচ্য গ্রন্থপাঠান্তে এই চির-পরিচিত লুপ্তপ্রায় চিত্রের দর্শন মাত্রেই এই পরিণত বয়সে চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল। আমার তাই মনে হইয়াছিল, স্বর্গীয়া রাসসুন্দরী আমারই কোন অন্তরঙ্গ নিকট আত্মীয়া। ইহার অনেক দিন পরে 'জাহ্নবী'

---

* শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্ত্তৃক লিখিত। শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার দ্বারা প্রকাশিত।

সম্পাদক স্বর্গীয়া গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয় দেন; কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল পরিচয় না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না, তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিয়া তীর্থ-দর্শনের পুণ্যলাভ করিতে পারিতাম। কেননা তাঁহাকে ও আমার স্বর্গীয়া পিতামহীকে একই যুগাত্মার বিভিন্ন শরীরীর বিকাশ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু অবস্থা বৈষম্যে বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার নিষ্ঠুর তীব্র আলোকে অনাবৃত ভাবে পড়িয়া থাকায় ঐ চিত্র ক্রমে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সাঁচ্চা জরীর শিল্প দীপ্ত সূর্য্যকিরণে ফেলিয়া রাখিলে যেমন তাহাতে মেড়ো পড়ে, তাহার ঔজ্জ্বল্য চলিয়া যায়; 'আমার জীবনে' খাঁটি বঙ্গসমাজের যে খাঁটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অবস্থাও সেইরূপ হইয়া আসিতেছিল। এখন আবার অনেকের এদিকে নজর পড়িয়াছে। অবহেলা করিলে এরূপ মহামূল্য চিত্র আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, একথা এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন। তাই বোধ হয় এখন 'তিন বন্ধু'র চিত্রকর 'একান্নবর্ত্তী পরিবার' আঁকিতে তুলি ধরিয়াছেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং তুলি না ধরিলেও শ্রীযুক্ত সরসীলাল বাবুকে এ বিষয়ে কাহারও টেক্কা দিবার যো নাই। র‍্যাফেলের মত চিত্র সবাইকার পক্ষে আঁকিয়া ওঠা মোটেই সহজ নয়, কিন্তু যে শিল্পী তাঁহার কলানৈপুণ্যে র‍্যাফেলের আঁকা লুপ্তপ্রায় চিত্রের সংস্কার দ্বারা তাহার আদিম বর্ণাদি অবিকৃত ভাবে উদ্ধার করিতে পারেন তিনিও বড় সামান্য শিল্পী নহেন। রস্কিনের মত গ্রন্থ সকলে লিখিতে পারেন না কিন্তু তাই বলিয়া যিনি রস্কিনের গ্রন্থের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাহা জগতে প্রচার করিতে চেষ্টা পান তিনিও আমাদের সামান্য শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। সরসীলাল বাবু এই শ্রদ্ধা আমাদের নিকট খুব দাবী করিতে পারেন এবং আমরা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতেছি; কিন্তু একটা কথা, সুন্দর হইতে হইলেই যে সাজিতে [illegible] এমন কোনও কথা নাই। যে অসুন্দর তাহাকে সাজিলেই যে ভাল দেখায় তাও নয়; [illegible]সুন্দর সাজাইয়া অনেক সময় তাহাকে মাটী করা হয়। সরল স্বাভাবিকতার মধ্যে [illegible] সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা তাহার নিজস্ব, তাহার উপর কারিগরি করিতে [illegible] বিড়ম্বনা। 'আমার জীবন' পড়িতে পড়িতে, স্থলে স্থলে, বোধ হয় যেন গ্রন্থকর্ত্রীর [illegible] চালান হইয়াছে। বর্ত্তমান রুচির ছাঁচে ঢালা না হইলে চলিতে পারিবে না এমন [illegible] করিলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকে না এবং তাহার ফল এই হয় যে, সৌন্দর্য্যের খাতিরে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিবার জন্য যে উদ্দেশ্যে এ প্রথা অবলম্বন করা হয় তাহাই সিদ্ধ হয় না।

আমরা নিতান্ত সাধারণ ভাবে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিলাম। সমালোচ্য গ্রন্থে পুরাতন বিলুপ্ত বঙ্গসমাজের যে সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার আভাষমাত্র দিয়া সহৃদয় পাঠকের পড়িবার স্পৃহা উদ্রেক করিয়া দিয়াছি মাত্র। আমাদের আশা মিটাইয়া সমালোচনা করিতে গেলে বহিখানির অন্তত অর্দ্ধেক তুলিয়া দিতে না পারিলে আর হয় না। আমরা তাহা করিও নাই; তাহার কারণ এই যে, আমরা যে চক্ষে এই গ্রন্থের এত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি চক্ষুষ্মান পাঠককে সে চক্ষে দেখিতে বলি না। তিনি নিজের চক্ষে নিজে দেখিয়া, নিজে পড়িয়া আমাদের কথার সত্যাসত্য বিচার করুন।

গ্রন্থকর্ত্রীর নির্দ্দেশক্রমে এই গ্রন্থের উপসত্ব, খরচখরচা বাদে, তাঁহার বংশাবলীর একজনও

পয র্য্যন্ত জীবিত থাকো অবধি দেব সেবায় অতিবাহিত হইবার ব্যবস্থা আছে সুতরাং এমন আশা করা যায় যে সক্ষম পাঠক এ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন চাহিয়া লইয়া পড়িয়া কর্ত্তব্য পালন করিলেন মনে করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন না।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

অল্পে চালান।

জাহ্নবীর পূর্ব্ব তিন সংখ্যায় জাতীয়-ধনশাস্ত্র সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা হইয়াছে। জাতীয় এবং ব্যক্তিগত ধন সম্বন্ধে ইউরোপীয় অর্থনীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতের সহিত আমাদের দেশীয় লোকের মতের একটী বিষয়ে চিরাগত প্রভেদ আছে। ইউরোপীয়গণ বলেন যে জাতির বা যে ব্যক্তির অধিক টাকাকড়ির প্রয়োজন নাই সে জাতির বা সে ব্যক্তির উন্নতির পথ অবরুদ্ধ; এবং তাঁহাদের মতে লোকের ও জাতির যতই অভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। আমাদের দেশে অত প্রাচীনকাল হইতে ইহার বিপরীত মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের চিরাগত শাস্ত্রীয় ও সামাজিক উপদেশ অনুসারে যে অভাব টাকাকড়ির দ্বারা পরিপূরণ হয় তাহা সর্ব্বোতভাবে হ্রাস করা প্রয়োজন। আহারবিহার, বেশভূষা, গমনাগমন এবং সাধারণতঃ শারীরিক প্রয়োজন বিষয়ে যাহাতে লোকে সংক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ অল্পে চালাইতে পারে, তাহাই সর্ব্বোতভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এরূপ মত-প্রভেদের কারণ কি? এরূপ বিপরীত প্রবৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ এবং বাঞ্ছনীয় ইহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে সহজেই এই প্রভেদের বিষয় দৃষ্ট হইবে। এ দেশের লোকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম—আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক সুখসম্ভোগ, দ্বিতায়—শরীর সম্বন্ধীয় আবশ্যকসাধন এবং শারীরিক সুখসম্ভোগ। জীবনের এই দুইটী উদ্দেশ্যের একটীকে বর্দ্ধিত করিলে অপরটীকে হ্রাস করিতে হয় ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ প্রত্যেক মনুষ্যের চেষ্টা ও যত্নের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। তাহা দুই বিষয়ে সমান ভাগে প্রয়োগ করা যায় না, তাহাহইলে একটীতে কম এবং অপরটীতে বেশী হইবে। হিন্দুজাতি জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অধিক

মনে করিয়া যাহাতে সেই বিষয়ে যত্ন হ্রাস না হয় সেই উদ্দেশ্যেই শারীরিক ভোগবিলাস ও সুখসম্ভোগ সম্বন্ধে প্রয়োজনের হ্রাস করিতে বলেন; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মতে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত আলোচনা তার্কিক আলোচনা মাত্র। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অল্পে চালান কেবল তার্কিক আলোচনার অনুরোধে নহে; অল্পে চালান ব্যতীত আমাদিগের অস্তিত্ব-রক্ষার আর উপায় নাই। কোনও লোক বা কোনও জাতি যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক, স্বাধীন ও সুস্থ অবস্থায় থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহারা আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক ভোগবিলাস সম্বন্ধে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে। যে জাতি স্বাধীন এবং সুস্থ, শুধু তাহাই নহে—যে জাতি অপর কোন জাতির সহিত বিনিময় ব্যতীত ইচ্ছানুরূপ ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা শারীরিক ভোগবিলাস অসীম পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারেন। যদি তাঁহারা তাহা বৃদ্ধি না করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের যে ঠকা বোধ হইবে সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য নাই? কিন্তু যে জাতির জাতীয় ধন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহাদিগকে প্রতি বৎসর কৃষিকার্য্যের উৎপন্ন শস্যাদির দ্বারা কেবল যে জীবনযাপন করিতে হয় তাহাই নহে, কৃষিকার্য্যের অর্দ্ধভাগ অন্য জাতিকে বিনিময় ব্যতীত কর-স্বরূপ প্রদান করিতে হয়, সে জাতির পক্ষে শারীরিক ভোগবিলাস আকাঙ্ক্ষা করা কি কেবল তার্কিক আলোচনার অনুরোধে না ইহা তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষণের একমাত্র উপায়?

কোন এক ব্যক্তি সুস্থ শরীরে অবস্থানকালীন কেবল যে আবশ্যকীয় অন্নাহার ও জলপান করিতে পারেন, এরূপ নহে; কিন্তু তিনি যদি মিষ্টান্নাদি কিম্বা 'কালিয়াপোলাও' জোগাড় করিতে পারেন, তবে তাহা আহার করাও তাঁহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের কারণ নহে; কিন্তু যাঁহার শরীরে Bacilli রোগবীজাণু প্রবেশ করিয়াছে, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার শরীরের রক্তশোষণ করিতেছে, এরূপ ব্যাধিগ্রস্থ বিষাক্ত-শোণিতধারী ব্যক্তির পক্ষে মিষ্টান্নাদি এবং 'কালিয়াপোলাও' আহারের সাধ যে এককালে বাতুলতার কার্য্য ইহা কে না বলিবে? তাঁহার পক্ষে অনেক সময় সামান্য দু'টী অন্নই উপযুক্ত আহারীয় বস্তু। এমন কি তাঁহার পক্ষে লঙ্ঘনই পথ্য। ভারতবর্ষীয় জনপুঞ্জের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা জাহ্নবীর পূর্ব্ব তিন সংখ্যায় জাতীয় ধন-শাস্ত্রের আলোচনায় কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অবস্থায় 'অল্পে চালানই' আমাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম হইতেছে। এই অবস্থায় আমাদিগের কি পোষাক

পরিচ্ছদের প্যারিপাট্য, আহারবিহারের ভোগবিলাস, চলাচলের বাবুগিরি ক্ষণেকের নিমিত্তও বাঞ্ছা করা কর্ত্তব্য ? অথচ ইংরাজের দেখাদেখি, এই সকল প্রবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতেছে। এই প্রবৃত্তিনিচয় এককালে আমাদিগের উন্মূলিত করা আবশ্যক হইয়াছে।

আমরা যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি, যাহা আমাদের অস্তিত্ব-রক্ষার একমাত্র উপায়, যাহা ব্যতীত এই ব্রিটিশ-কলিযুগে আমাদের অন্যগতি নাই, তাহাও "অল্পে চালান" ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে সুসিদ্ধ হওয়ার কোনও উপায় নাই। আমাদের দেশে যখন প্রচুর দেশীয় মূলধন (Capital) ছিল তখনও অল্পহারে সংসার চালাইয়া শিল্পীজীবিগণ, অল্পের মধ্যে শিল্পবস্তু উৎপাদন করিত। এ দেশে বেতনগ্রাহী পরিশ্রমজীবি লোক অর্থাৎ কুলী অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক সামান্য লোক, নিজের স্বল্প বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিত। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, যোগী কিম্বা জোলা কাহারই অধিক মূলধন (Capital) ছিল না। অল্প পুঁজি লইয়াই প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিত। প্রত্যেকেই আপনার আপনি কর্ত্তা ছিল; পরমুখাপেক্ষী কাহাকেও হইতে হইত না। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মধ্যবিত্ত সমস্ত লোকেরই এই প্রকারে জীবন-চালনা করা আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহারা কুলী হইতে পারিবেন না এবং কুলী অপেক্ষাও হীন যে গভর্ণমেণ্টের চাকুরী তাহাও তাঁহাদের প্রত্যাশা করা উচিত নয়, প্রত্যাশা করিলেও তাহা পাওয়ার পন্থা নাই; সুতরাং তাঁহাদের অল্পে চালাইয়া, যাহাতে তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে সামান্য শিল্পাদি কার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

শ্রীকিশোরীলাল সরকার।

স্বাগত।

গুরু-গুরু-গুরু-গুরু মৃদঙ্গ বোলনী ;
সরস বরষা আওল অবনী।
নলপত অপাঙ্গে মৃদু মৃদু ভাতিয়া ;
এলাইত মেঘ-বেণী লুটাওত ছাতিয়া।
আবৃতা ধরণী ঘন-ঘোর তিমিরে ;
উড়ত ওড়নী মৃদু-মৃদু সমীরে।
গুরু-গুরু-গুরু-গুরু মৃদঙ্গ বোলনী ;
সরসা বরষা আওল অবনী।

হরষিত দিঙনাগ ভরলেই ঝারি,
অভিষেক ঘনরাণী ;—বরখত বারি।
খুলিয়া বলাকা সুশুভ্র ছাতি ;
উড়ল অম্বরে পুলকে মাতি'।
শিখরে শিখরে সঙ্গীত তুলি,
ধাইল নিঝর-বালিকাগুলি,
আকুল হরষে সবেগে ছুটি
পাষাণে পাষাণে তনুয়া লুটি।
লুকাল অম্বরে দিবসাধীপ ;
ফুটল হাসিয়া কেতক নীপ।
মোদিত সুবাসে কাননবীথি ;
পাপিয়া রসালে ধরিল গীতি।
বাদিত দুন্দুভি গম্ভীর ঘোষে,
আওল বরষা সুনীল বেশে।
চমকে পলকে বিজুরী-জ্যোতি।
পাতায় পাতায় ক্ষরিত মোতি।
যো রহে সো রহে বিষাদে ভরা,
স্বাগত হামার মানস-হরা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

পুস্তক সমালোচনা।

স্বদেশ-রেণু—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা মাত্র। "যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ" এই বচনের অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার বর্ত্তমান গ্রন্থে কোমলমতি শিশুদিগের হৃদয়ে স্বদেশ-ভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতির উদ্দীপনা করিবার জন্য কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছড়া রচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে বহুদিন হইতে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার জন্য, তাহাদের ক্রন্দন-নিবৃত্তির জন্য এবং ভুলাইবার জন্য অনেক ছড়া প্রচলিত আছে; কিন্তু যাহাতে তাহাদিগকে গল্পচ্ছলে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে সদ্ভাবসূচক উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, সেরূপ ছড়া আমাদের দেশে নাই; চণ্ডীবাবু আজ 'স্বদেশ-রেণু' লিখিয়া আমাদের সে অভাব পূর্ণ করিলেন। যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর, যাহাদের উপর এক দিন আমাদের দেশের মঙ্গলামঙ্গল উন্নতি-অধোগতি নির্ভর করিবে; তাহাদিগকে গোড়া হইতে গড়িয়া তুলা আমাদের সর্ব্বাগ্রে উচিত। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এখনও আমরা প্রকৃত স্বজাতি-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতি শিখি নাই; তাহার অন্যতম কারণ আমাদের হাড় পাকিয়া গিয়াছে; পাকা হাড়ে কোন জিনিষ যত উচ্চ ও মহৎ হউক না কেন সহজে প্রবেশ করে না; কিন্তু যাহাদের কচি হাড়, তাহাদিগকে একবার শিখাইতে,—একবার বুঝাইতে পারিলে তাহারা চিরজীবনের জন্য অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের কোমলমতি শিশুদিগের হৃদয়ে এখন আমরা যে ভাবটীর সঞ্চার করাইব, পরিশেষে তাহাই কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে; এখন হইতে যদি তাহাদিগকে ছড়ায় বা গল্পচ্ছলে বাঙ্গালা-দেশকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে, প্রত্যেক বাঙ্গালীকে ভাইয়ের মতন দেখিতে শিক্ষা দিই, ভবিষ্যতে তাহা হইলে তাহাদের স্বদেশ ভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতি দেশের মহান মঙ্গল সাধিত করিবে। চণ্ডীবাবুর এক একটী ছড়া এই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রকৃত উপায়; বোধ হয় এমন সরল-সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিতে বাঙ্গালায় তাঁহার আর কেহ প্রতিদ্বন্দী নাই। আমরা বঙ্গের প্রত্যেক মাতাকে, প্রত্যেক ভগিনীকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন তাঁহাদের সন্তানের ও ছোট ভাইদের হাতে এক একখানি "স্বদেশ-রেণু" উপহার দিয়া তাহাদিগকে দেশভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতি শিক্ষা দিউন।

দেশভক্তি—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। আমাদের জাতীয় জীবনোন্মেষের প্রথম উদ্যমে ঊষার আলোকের ন্যায় যে একটী নবীন পবিত্র ও নির্ম্মল আভা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পড়িয়াছে, প্রমথবাবুর দেশভক্তি তাহার অন্যতম উদাহরণ। ইংলণ্ডে Ballad কবিতার আদর যে কারণসম্ভূত, দেশভক্তির কবিতাগুলির আদর ও সেইজন্য হওয়া উচিত। সুন্দর ও সরল ভাষায় লিখিত এক একটী কবিতা পাঠে মন আনন্দে ও দেশভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এই কাব্যের সমুচিত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। আমরা সকলকেই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি; সময় ও অর্থব্যয় উভয়ই সার্থক হইবে।

সুধা—শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ইহা একখানি উপন্যাস; উপন্যাস নাম শুনিলেই আমাদের গাত্র কেমন চমকাইয়া উঠে। মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় অসার উপন্যাস ও উপন্যাস-লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয় এই সমস্ত উপন্যাস লেখা বাঙ্গালার একটা ভয়ানক নেশা; কিন্তু আমরা বর্ত্তমান উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। লেখক নবীন হইলেও তাঁহার রচনায় কৃতিত্ব আছে। পবিত্র ধর্ম্মভাবের যে একটী সুন্দর ছবি তাঁহার "সুধায়" উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রার্থনা করি, তাহার প্রতিবিম্ব বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পতিত হউক!

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। লেখক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার এ গ্রন্থে অনেক জানিবার ও শিখিবার আছে; যাহা জানিলে ও শিখিলে আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু স্ত্রী-সমাজ অনেক পরিমাণে উপকৃত হইতে পারেন। স্ত্রীলোকের প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা সংসার ও সমাজের যে মহান মঙ্গল সাধিত হইতে পারে লেখক তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার "রমণীর মাতৃত্ব" "রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা" "প্রত্যাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা" প্রত্যেক হিন্দু রমণীর পাঠ করা উচিত।

মাসিকপত্রিকা সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন (আষাঢ়)—"আনন্দমঠ ও স্বদেশ প্রেম" প্রবন্ধটী সময়োপযোগী, বিচক্ষণতাপূর্ণ ও যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। "আনন্দমঠ" হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি আমাদের প্রত্যেকের জপমালা,—প্রত্যেকের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। লেখক একটী কথা মনে রাখিবেন, যাহাদের স্বদেশ-প্রীতি ক্ষণস্থায়ী ও স্বার্থমূলক তাহাদের বিদেশী দ্রব্য-বর্জ্জন বিদ্বেষ-মূলক এবং কিছুদিনের মত; কিন্তু যাহাদের স্বদেশ-প্রীতি দেশের লোকের অনশন, অর্দ্ধাশন মোচনের জন্য তাঁহাদের বিদেশী দ্রব্য-বর্জ্জন চিরদিনের নিমিত্ত, এবং সেই ধর্ম্মভাব বিদ্বেষ-পঙ্কিল হইতে বহুদূরে অবস্থিত। "নেশন বা জাতি"—লেখক যুক্ত-রাজ্যের (United States) আদর্শে আমাদের 'নেশন' হইবার আশা করেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ পৃথক, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুজাতির পুরাতন অট্টালিকার পূর্ণ সংস্কার দ্বারাই সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস; ভিত্তি পর্য্যন্ত নূতন করিতে হইবে না। "শুভবিবাহ" প্রবন্ধে কয়টী কথার বানান এবং প্রয়োগে আমাদের আপত্তি! 'বাঙালির' 'ঙ'য় আকার দেখিয়া মনে হইল, 'ঞ' 'ং' 'ঃ' এ সকলে আকার হইবে না কেন? উচ্চারণ ধরিলে 'ভাঙা' অপেক্ষা 'ভাঙ্গা' সঙ্গত। 'আর্ট' কথাটীর ইংরাজিতেও অনেক অর্থ, বঙ্গভাষাতেও কথাটীর তদনুরূপ পরিভাষা বর্ত্তমান; তবে 'আর্ট' কথাটী প্রয়োগ করিয়া মাতৃভাষার অকারণ দারিদ্র্য প্রকাশ কেন? 'গুণিয়া' না 'গনিয়া'? 'কোনোর' ওকার অনাবশ্যক। 'শব-পোড়ানো' 'মড়া-দাহ'র মত কতকগুলি কথা আছে, স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিলাম না। "বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা" প্রবন্ধটী খিচুড়ি বলিলে হয়।

এই অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমাদের উক্তির প্রমাণ করিতে পারিব না, তবে এইটুকু বলি, যাহা সাধনার বিষয়, তপস্যালব্ধ, যোগাভ্যাসে প্রাপ্ত, গুরূপদেশে বিকশিত; অন্যদিকে সেই ঈশ্বরের দয়াতে যে ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে কোটী বৎসরেরও 'স্বাধীন চিন্তা'য় সে জ্ঞান লাভ হইবে না। বঙ্কিমবাবু যে বলিয়াছেন, "হিন্দুশাস্ত্রে—উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায় ঈশ্বরকে জানিতে পারিবে।" এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সুগম, আদৌ সঙ্কীর্ণ নহে। একথা লেখক কিছুকাল পরে বুঝিবেন। "সার্থক" কবিতাটী বেশ লাগিল। "দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে" ও "রাজ-তপস্বিনী" পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। "জিজ্ঞাসায় নিবেদন"-লেখক স্মরণ রাখিবেন, আফ্রিকার ক্রীতদাসদের উদ্ধার ব্যতীত দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিবার দৃষ্টান্ত ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অতি বিরল, বরং দুর্ব্বল জাতির উচ্ছেদসাধন এবং দুর্ব্বলপ্রজা—নিপীড়নের প্রচুর দৃষ্টান্তই বর্ত্তমান। রাজসিক গুণের বৃদ্ধিতে ইউরোপ আজ বড় এবং তামসিক গুণের বৃদ্ধিতে ভারত আজ পতিত। যাহা হউক, ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রশ্নের উত্তর তিনি ঠিক দিতে পারেন নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 'রাইবণীদুর্গ'—শিবাপ্রসন্নের কাহিনী বড়ই মধুর। 'বৈজনাথ' প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছুই নাই। "শিক্ষা-সমস্যা" প্রবন্ধ বিশেষ গৌরবের সামগ্রী। প্রাচীন ঋষিগণ যোগবলে, ধর্ম্মবলে যে শক্তি লাভ করিতেন, কলিযুগে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ জন্মান্তরের কর্ম্মফলে তাহার কিঞ্চিৎশক্তি—ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে দৃষ্টিলাভ করিয়া থাকেন, লেখক তাহার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত —হাতে-হেতেড়ে, আচারে অনুষ্ঠানে জ্ঞানলাভ ভিন্ন কোন পুস্তকলব্ধ জ্ঞানে বাঙ্গালী স্বার্থ-পরতা, বিলাসিতা পরিহার করিতে, কার্য্য, মন ও বাক্যে সত্যাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক হইতে পারিবে কি?

ভারতী। (আষাঢ়)—"লামা-কুমারী" উপন্যাস; এরূপ উপন্যাস লিখিবার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না; "সমসাময়িক ভারত" প্রবন্ধে রাষ্ট্রনীতির দু'এক কথা আছে। "আমার শিকার কাহিনী" বেশ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সংসারের ঈর্ষা-হিংসার চিত্র। "মহানন্দির পরে ভারতে মহাবিপ্লব" লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি বর্ত্তমান; রাজপুতগণ ও ক্ষত্রিয় নহে। মুসলমানদিগের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতের এই দশা। "আকবর সাহের তাসখেলা"—লেখা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। "জীবন ও যম" কবিতার লেখক জীবন ও যমকে সমান ভালবাসিতে পারিয়াছেন কি? "চাকমাজাতি" একটী ঐতিহাসিক সুপাঠ্য প্রবন্ধ, অনেকগুলি ঐতিহাসিক সংবাদ আছে। "মহীশূর ভ্রমণ (২) প্রবন্ধটী পড়িতে ভাল লাগিল বটে, কিন্তু জ্ঞাতব্য বিষয় বড় বেশী পাওয়া গেল না। "শিরী-ফরীদ" (৩য় দৃশ্য) শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মতামত প্রকাশ অনুচিত। "পঞ্জাবে প্রতাপাদিত্য উৎসব" কাহিনী পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। "কাঙালিনী" কবিতাটী সময়োপযোগী। "খেয়াল-খাতা" বেশ হইয়াছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা। (আষাঢ়)—"নববর্ষ ও নবজীবন" প্রবন্ধ পাঠে বুঝিলাম লেখক হিন্দুর সৃষ্টিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি কিছুই মানেন না; আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধেও খৃষ্টানিমত শিরোধার্য্য করিয়া হিন্দু-দার্শনিক মত অবহেলা করিয়াছেন।

"অমলা" উপন্যাস। বাঙ্গালা উপন্যাসে এতদিন অবিবাহিত নায়ক নায়িকার প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হইতে ছিল, তাহা ইংরাজি কোর্টসিপের অনুকরণ। এ গল্পটী বিবাহিত পুরুষের অবিবাহিতা রমণীর প্রতি তীব্র অনুরাগের চিত্র, বামাগণকে এরূপ কুদৃষ্টান্ত দেখান বড়ই লজ্জার কথা। "প্রাতঃকৃত্য"—প্রত্যেকের কণ্ঠস্থ করিয়া নিত্য প্রাতে আবৃত্তি করা উচিত; সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ পিতামাতার চরণ-বন্দনা করিলে একদিকে ভক্তি অন্যদিকে স্নেহ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইবে এবং দিন দিন পরস্পরের চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকিবে। "দার্জ্জিলিং ভ্রমণ" —দু'একটী জানিবার কথা আছে। "সংকল্প" কবিতাটী বেশ প্রীতিপ্রদ ও সাময়িক। "স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাজনের উক্তি"—প্রায় ভাল, তবে সবগুলিই বিলাতী। "ফুলার-বন্দনা" —ফুলারকে শ্লেষ করিয়া একটী কবিতা। "রসায়ন"—এরূপ রসায়ন লিখিয়া আমাদের কি উপকার হইবে? "বালক ধর্ম্মার্থদিগের প্রতি"—দশবিধি ও দশনিষেধ, উত্তম হইয়াছে। "ভারিলা" কাহিনী। "দেশাচার" (শব-সৎকার) ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রথার কথা। "বামারচনা" কবিতাগুলি মন্দ নহে।

সাহিত্য (বৈশাখ)—"বঙ্কিম-মঙ্গল" ভক্তকবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচনা হইলেও কবিতায় ভাবের গভীরতা নাই। "ভারতচন্দ্রের পরস্বাপহরণ" লেখকের মোট কথা (১) প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে—সংগ্রহ। "অপহৃত" সম্পদ নিজস্ব সম্পদাপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট হইলে তাহাকে পরস্বাপহরণ বলে—নতুবা নহে। (২) পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ পরবর্ত্তী লেখকগণের জন্য উপাদান সংগ্রহ করেন। "ভাগ্য" (গল্প) পরিস্ফুট মর্ম্মস্পর্শী চিত্র। "মলবর-সুন্দরী"—লেখক মলবর দেশের নায়ার রমনীদের অনাবৃত বক্ষ, বহুপতিত্ব এবং রমণীগণের দল বাঁধিয়া নৃত্যে বিমোহিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন "এমন প্রফুল্লতা ও স্বাধীনতা অন্য কোথাও নাই।" ইহা মলাবর সম্বন্ধীয় একখানি ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। "বিদেশী গল্প" বেশ লাগিল। "সাহিত্য সেবকের ডায়েরি"—এবারকার ডায়েরির সার্থকতা ১৯শে আশ্বিনের ডায়েরিতে "অমলা"—সুদীর্ঘ ও সুমিষ্ট কবিতায় একটী সতীর কাহিনী। কবিতা পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে আমাদের নয়ন ভরিয়া গিয়াছিল; কণ্ঠ ও দৃষ্টি উভয়ই রুদ্ধ হইয়াছিল। এরূপ কবিতা লেখক বাঙ্গালীর গৌরব, কবিতা বঙ্গভাষার বড় গৌরবের সামগ্রী। "শিবাজী সঞ্জীবনী"—কবিতায় প্রকৃতই সঞ্জীবনী শক্তি আছে। 'কবিতা-কুঞ্জ" কবিতা কয়টী মন্দ নহে।

বিবিধ।

গত ১৩ই শ্রাবন তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদগৃহে বিদ্যাসাগর ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃতাহ উপলক্ষে একটী স্মৃতি-সভা হয়। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সরকার, নগেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ জে চৌধুরী, ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভাবময়ী বক্তৃতা দ্বারা মৃতমহাত্মার স্মরণোৎসব করেন।

বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মপ্রচারকগণ।

অনেকের বিশ্বাস, আজকাল খ্রীষ্টান মিশনারিগণ যেরূপ দেশে দেশে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া বেড়ান, পূর্ব্বকালে হিদেন্‌জগতে সেরূপ কোন প্রথা আবিষ্কৃত হয় নাই। মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি প্রাচীন জাতি-সমূহ রাজনৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত জ্যোতিঃ অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই, এই হেতু তাঁহাদের ইতিহাসে, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন লোকসমূহকে আলোকে আনয়ন করিবার কোন বিধানই দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টান ধর্ম্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বুঝি মিসনারি বা ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বুঝি কেহ কোথায়ও দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচারের রীতি জানিত না। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতের ইতিহাস আলোচনা করেন নাই। হিদেন জগতে রাজনৈতিক হিসাবে ভাতরবর্ষ নগণ্য হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মের দিক দিয়া ভাবিতে গেলে ভারতের প্রাধান্য কাহারও অস্বীকার করিবার সামর্থ্য নাই। ভারতবাসিগণ নিষ্ঠুর তরবারির অবাধ পরিচালন দ্বারা স্বসাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মজ্যোতিঃ সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিয়াছে। ভারত-বর্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বৈদিকধর্ম্ম ও বৈদান্তিকধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও স্মার্ত্তধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম ইত্যাদি সমস্ত প্রকার ধর্ম্ম স্বাভাবিক বিরোধ ত্যাগ করিয়া ভারতক্ষেত্রে পরস্পর বন্ধুভাবে অবস্থিতি করিয়াছে। বৈদিকধর্ম্ম ভারতের কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, উহা ভারতের বহিঃপ্রদেশে প্রবেশ লাভ করিবার অবসর পায় নাই বটে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীর মধ্যে সভ্য ও অসভ্য সর্ব্বজনপদে উপস্থিত হইয়া সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যমুনি যীশুখৃষ্টের জন্ম গ্রহণের অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইরাছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল, "অন্যান্য সকল দানের অপেক্ষা ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠ।" জাতি ও দেশ নির্ব্বিশেষে অকাতরে ধর্ম্মদান করিবার জন্য তিনি জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জগতে এ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন, বুদ্ধের সহিত তাঁহাদের কাহারও তুলনা নাই। অসীম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াও সমস্ত প্রকার সুখসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের লোকের দুঃখমোচনের জন্য তিনি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন অতুল ক্ষমতাশালী রাজচক্রবর্ত্তী অপেক্ষা একজন সামান্য দরিদ্র মিসনারী জগতের অধিকতর হিতসাধন করিতে পারে; এই হেতু তিনি রাজপদকে শ্লেষ্মপিণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়া অনাগারিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অশীতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরকাল তিনি ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে বিচরণ করিয়া তত্তদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত করিয়াছিলেন। তিনি অন্তর্ব্বাস, বহির্ব্বাস ও উত্তরীয় এই ত্র্যবয়ব ভিক্ষুবেশ পরিধান করিতেন; অনাবৃত পদে ভিক্ষা করিয়া অহোরাত্রির মধ্যে একবার মাত্র ভোজন করিতেন। অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে ধর্ম্মদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তিরোহিত হয় নাই। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের লাভের নিমিত্ত ও বহুজনের হিতের নিমিত্ত ও জগতের মঙ্গল কামনায় সর্ব্বত্র বিচরণ কর; স্বয়ং পবিত্র ও বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া উদার সদ্ধর্ম্ম দেশ বিদেশ প্রচার কর।" চিরকাল জগৎকে শিক্ষা দিবে, সকল লোকের মধ্যে চিরকাল আদর্শরূপে বিরাজ করিবে, এই ভাবিয়া বুদ্ধদেব নিজের শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নাম বৌদ্ধ ভিক্ষু। সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র অথবা যে কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহাদের কাহারও মর্য্যাদা ভিক্ষুর মর্য্যাদার লক্ষাংশের একাংশও নহে। ভিক্ষু বিনীত ভাবে জীবন যাপন করেন; দারিদ্র্য আহ্বান করেন, স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দীন হীন ভাবে দিন পাত করেন, কখনও কাহারও নিকট হইতে সম্মান প্রার্থনা করেন না অথচ জগতের সকল সম্মান স্বয়ংই তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়ে। ভিক্ষুগণ দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন না, উচ্চ শয্যায় শয়ন করিতে পারিতেন না, সুবর্ণ ও রৌপ্য প্রতিগ্রহ করিতে পারিতেন না, বিংশতিবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কাহারও ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশের অধিকার ছিল না, ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশের পর হইতে তাঁহাকে "প্রাণি হত্যা করিব না, পরদ্রব্য অপহরণ করিব না, ব্যভিচার করিব

না, মিথ্যা কথা বলিব না” ইত্যাদি দশ প্রকার শীলগ্রহণ করিতে হইত। প্রত্যেক দিন তিন বার তাঁহার চরিত্রের বিষয় তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত এবং প্রাতিমোক্ষসূত্রের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন কি না তাহা প্রত্যেক মাসে দুইবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হইত। প্রাতিমোক্ষসূত্রে ভিক্ষু জীবনের যে ২২৭টি নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, উহা পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয়, কোন সাধুসম্প্রদায়ের জীবন পবিত্র রাখিবার জন্য মানবমস্তিষ্ক উহা অপেক্ষা কঠোরতর নিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। এই ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধদেব জগতে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারের একটি উৎকৃষ্টতম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যে সম্প্রদায় সংসারের লাভ ও ক্ষতিতে বিজড়িত ছিলেন না, যাঁহাদের পুত্রকলত্রাদির বন্ধন কিছুমাত্র ছিল না, যাঁহাদের সমগ্রশক্তি মানব জাতির সেবায় ব্যয়িত হইত, সেই অদর্শচরিত্র ভিক্ষুসম্প্রদায় ধর্ম্ম জগতে কিরূপ প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ হইতে অশোকের রাজত্ব পর্য্যন্ত আড়াই শত বৎসরকাল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ও পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বৌদ্ধনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ২৬০ অব্দে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। সমস্ত জম্বুদ্বীপ পীতবসনে বিভূষিত দেখিয়া তিনি বৌদ্ধগণের একটী মহতী সভার আহ্বান করেন, উহাই তৃতীয় বোধিসঙ্গম। ঐ সভার আদেশ মতে মহারাজ অশোক দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মিসনারি প্রেরণ করেন। মহাস্থবির মহ্যন্তিক কাশ্মীর গান্ধারে প্রেরিত হন; স্থবির মহাদেব মহিষমণ্ডলে গমন করেন; স্থবির রক্ষিত বনবাসী দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন; যোনধর্ম্মরক্ষিত অপরান্তক প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন; স্থবির মহাধর্ম্মরক্ষিত মহারাষ্ট্র দেশে গমন করেন; স্থবির মহারক্ষিত যোন দেশে গমন করিয়াছিলেন; স্থবির মহিম হিমবন্ত প্রদেশে ধাবমান হন, এখানে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারকের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহারা যে একাকী বিদেশে গমন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু গমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ অশোক সদ্ধর্ম্মের রক্ষক নামে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর নামের আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “মহারাজ, আপনি সদ্ধর্ম্মের রক্ষক হইয়াছেন,

কিন্তু এখনও সদ্ধর্ম্মের বন্ধু হইতে পারেন নাই।” অশোক জিজ্ঞাসা করেন, “কি করিলে সদ্ধর্ম্মের বন্ধু হওয়া যায়?” ভিক্ষুগণ উত্তর করেন, “যিনি আপনার পুত্র বা কন্যাকে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের হস্তে অর্পিত করিয়াছেন, তিনি সদ্ধর্ম্মের বন্ধু”। এই কথা শুনিয়া অশোক তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুত্র মহীন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। উহারা ভিক্ষুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সদ্ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিলেন। মহারাজ অশোক লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত পুত্র ও কন্যাকে বহু ভিক্ষুসমভিব্যাহারে লঙ্কাদ্বীপে প্রেরণ করেন। সে সময়ে লঙ্কাদ্বীপ ইদানীন্তন কালের ন্যায় সভ্য ছিল না; পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় তখন লঙ্কায় নরভোজী রাক্ষসের অধিবাস ছিল। ভিক্ষুবেশধারী যুবরাজ মহীন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন ঐ দেশে সূক্ষ্ম নির্ব্বাণতত্ত্ব ও কঠোর বৌদ্ধনীতি প্রচারের কোন সুবিধা হইবে না। রাক্ষসদিগের মস্তিষ্ক ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে কিনা ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য মহীন্দ্র লঙ্কার তদানীন্তন রাক্ষসরাজকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নিম্নে একটী প্রশ্ন উল্লিখিত হইল:—

মহীন্দ্র—মহারাজ, পুরোভাগে যে বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম কি?

রাজা—ইহার নাম আম্রবৃক্ষ।

মহীন্দ্র—এই আম্রবৃক্ষ ব্যতীত সংসারে আর আম্রবৃক্ষ আছে কিনা?

রাজা—ইহা ব্যতীত সংসারে আরও অনেক আম্রবৃক্ষ আছে।

মহীন্দ্র—এই আম্রবৃক্ষ ও ঐ সকল আম্রবৃক্ষ ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন বৃক্ষ আছে কি না?

রাজা—পৃথিবীতে আর অনেক বৃক্ষ আছে কিন্তু উহারা আম্রবৃক্ষ নহে।

মহীন্দ্র—ঐ সকল আম্রবৃক্ষ এবং আম্র ব্যতীত যে সকল বৃক্ষ আছে, সেই সকল বৃক্ষ ব্যতীত পৃথিবীতে আর বৃক্ষ আছে কিনা?

রাজা—এই আম্রবৃক্ষ।

মহীন্দ্র—মহারাজ, আপনি অতিশয় বিজ্ঞ।

এইরূপে যখন মহীন্দ্র বুঝিতে পারিলেন লঙ্কেশ্বর অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক বুদ্ধির দুইটী সাধারণ নিয়ম গ্রহণ করিতে সক্ষম তখন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যেই সেই অসভ্য দেশ সুসভ্যতা ও সদ্ধর্ম্মের লীলাভূমি হইয়া পড়িল। মহীন্দ্র ও তাঁহার সহচর

ভিক্ষুগণ ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পালিগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন উহার অধিকাংশ সিংহলী ভাষায় অনুবাদিত হইল। তথাকার ভিক্ষুগণ মূল পালিগ্রন্থ সমূহ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ঐ সকল মূলগ্রন্থ তথায় পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়। প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক লঙ্কাদ্বীপে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন; ইহার পর ভারতে ও লঙ্কায় অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে কিন্তু অশোকের মহৎ কার্য্য লোকস্মৃতির অতীত হয় নাই। যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল সেখানে এক খানিও পালিগ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। গত একশত বৎসরকাল ভারতে বৌদ্ধগ্রন্থের অনুসন্ধানে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় একখানিও পালিগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক বিপ্লবে ভারতে পালিগ্রন্থ সমূহের সমূল ধ্বংস ঘটিয়াছিল; অধুনা যে সকল পালিগ্রন্থ এ দেশে বা ইউরোপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে উহার অধিকাংশই লঙ্কাদ্বীপ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদি মহীন্দ্র ভারত হইতে পালিগ্রন্থ সমূহ লঙ্কাদ্বীপে লইয়া না যাইতেন, তাহা হইলে অধুনা পৃথিবীতে একখানি পালিগ্রন্থ থাকিত না, ভারতের অনেক পুরাতত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। অশোক লঙ্কাদ্বীপে যে মিসনারী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে লঙ্কা সুসভ্য হইয়াছিল এবং ভারতেরও অনেক কীর্ত্তি সুরক্ষিত রহিয়াছে।

সম্রাট অশোকের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম অতি দ্রুতবেগে বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। অশোকের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন। আফ্রিকার অন্তর্গত মিশর দেশে তাঁহাদের গতায়াত ছিল। কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক ইউরোপের মাসিডোনিয়া প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোকের ত্রয়োদশ অনুশাসনে এইরূপ লিখিত আছে:—মহারাজ অশোক কলিঙ্গদেশ জয় করিতে যাইয়া অনেক লোককে হত ও আহত করিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি সতত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। মহারাজের মতে কোন দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ঐ দেশের লোকের চিত্তানুরঞ্জন করাই সেই দেশের প্রকৃত জয়। মহারাজ তদনুসারে এক্ষণে ধর্ম্মের দ্বারা দেশ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মহারাজ বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছেন। যে মিশরদেশে টলেমি ফিলাডেলফস্ রাজত্ব করিতেছেন, যে মাসিডোনিয়া নগরীতে আণ্টীগোনোস্ গোনেটস্

রাজত্ব করিতেছেন, যে এপিরস নগরের অধীশ্বর আলেকজান্দার এবং যে সাইরেনী নগরীতে মগস শাসন দণ্ড পরিচালিত করিতেছেন সেই সকল দেশেই মহারাজ অশোক ধর্ম্মদূত প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সকল দেশেই সদ্ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আকাশ। *

অনাদি অনন্ত তুমি হে আকাশ!
কোথা হ'তে তব হয়েছে প্রকাশ?
যতদূর দেখি ততদূর যাও,
শেষ কি তোমার নাহিক কোথাও?
কে তোমায় দিল পাঠায়ে ধরায়?
নাম কি তাঁহার, থাকেন কোথায়?
কত শত রঙে হও সুশোভিত,
শ্বেত, পীত, নীল, হরিত, লোহিত।
কভু শশধর হাসিছে তোমাতে,
কখন বা ঘিরে আঁধার নিশাতে।
কখন বা ঢাল অরুণ-কিরণ,
পুলকে ভরিয়া উঠে প্রাণ মন।
কভু বারিধারা, অশনি-পতন,
কভু তারা-হাসি হৃদয় মোহন।
কত শোভা তব কি লিখিব আর?
তোমার ও শোভা অনন্ত অপার।
কোটী প্রণিপাত চরণে তাঁহার
যে জন করিলা সৃজন তোমার।

শ্রীধ্রুবলাল দত্ত।

---

* এ কবিতাটি বালকের রচনা বলিয়া আমরা সাগ্রহে প্রকাশ করিলাম। জাঃ সং।

স্বপ্ন।

(৩)

গতবারে যে ফরমটী পূরণ করিয়া দিবার জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই পূরণ করিয়া দেন নাই। আশা করি ক্রমে ফরমের উত্তর পাইতে থাকিব। এবার আরও কয়েকটী সত্য-স্বপ্নের বিষয় জানাইতেছি। বৃত্তান্তসংগ্রহ হইলে মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

এ স্বপ্নটী কিছু বিস্তৃত; এবং কোন বিশেষ কারণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা এক্ষণে সঙ্গত বোধ করি না। সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে এক পুত্র-শোক জর্জ্জরিতা ধর্ম্মপ্রাণা, নির্ম্মলহৃদয়া অর্দ্ধবয়স্কা নারী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা * আসিয়া বলিতেছেন "মা, তুমি দুঃখ করিও না; আমিই তোমার নিকট আসিতেছি। তুমি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে আমাকে কোলে পাইবে।" এই কথার সঙ্গে ঐ পিতা তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের একটী চিহ্নও বলিলেন। অবিলম্বে ঐ নারীর গর্ভ লক্ষণ দেখা গেল; এবং সত্যই তিনি পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে পুত্রলাভ করিলেন। তাঁহার পিতার কথিত সেই চিহ্ন ঐ কুমারের শরীরে দেখা গেল; অদ্যাপি সেই ব্যক্তির ঐ চিহ্ন আছে; এবং তাহার আকৃতি অনেকাংশে তাহার মাতামহের ন্যায়।

গত ২০শে শ্রাবণ জেলা রাজসাহী, ষ্টেশন বড়াইগ্রামের অধীন, নগর গ্রাম নিবাসী জানকীনাথ রক্ষিত রামপুর-বোয়ালিয়াতে শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "আপনি এখানে কি করিতেছেন? আপনার কন্যা যে বাঁচে না!" কন্যা ইন্দুপ্রভা তখন নগরগ্রামে তাঁহার নিজবাটীতে ছিল। রক্ষিত মহাশয় এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হন। তৎপরদিন বেলা ২টার সময় টেলিগ্রামে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার কন্যা অত্যন্ত কাতর। ঐ টেলিগ্রাম প্রাতে ১০॥ টার সময় নগরের নিকটবর্ত্তী চাটমোহর আফিসে করা হইয়াছিল। এই স্বপ্নটীর সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবেন যে, তৃতীয় ব্যক্তি কন্যার কাতর সংবাদ বলিয়াছিল, কন্যা স্বয়ং বলে নাই।

এস্থলে আমার নিজের জন্ম সম্বন্ধে আমার স্বর্গগতা মাতৃদেবী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিতেছি। এই বৃত্তান্ত আমি প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে আমার মাতা, এবং পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়াছি। আমার

---

* পিতা সে সময়ে মরিয়া গিয়াছিলেন।

দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মাতৃদেবী পুত্রশোকে অতীব কাতরা হন। তৎপর দীর্ঘকাল তাঁহার আর সন্তান হইল না। এই অবস্থায় আমার পিতামহী আমার পিতৃদেবের পুনরায় দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব করেন। তাহাতে মাতৃদেবী আরও ব্যথিতা হন। তিনি একদিন শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার পরলোকগত পিতা তাঁহাকে বলিতেছেন "তুই আর দুঃখ করিস না, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে আমাকে কোলে পাইবি; আমার পৃষ্ঠে যে ছিদ্রটী তুই বাল্যকালে টিপিয়া দিতিস, সেই চিহ্ন দ্বারাই আমাকে চিনিতে পারিবি।" এস্থলে বলা আবশ্যক যে আমার মাতামহ আমার মাতৃদেবীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মাতৃদেবী এই স্বপ্ন দেখিয়া তখনই জাগ্রত হইয়া আমার পিতৃদেবকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। বাবার আর বিবাহ করা হইল না। আমার পিতামহীও এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ বন্ধ করিলেন। মা এই স্বপ্ন মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে দেখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মায়ের গর্ভসঞ্চার হয়, এবং সত্যই সত্যই আমি অগ্রহায়ণ মাসে ভূমিষ্ঠ হই। আমার পৃষ্ঠে ঐ ছিদ্রটী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আমার মাতৃদেবী অতীব ধর্ম্মপরায়ণা ও শুদ্ধচিত্তা ছিলেন।

রাজসাহী জেলার নওগাঁও মহকুমার অধীন মৈনমগ্রামে হারাণচন্দ্র রায় মহাশয় বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পর এক রাত্রিতেই তাঁহার মাতা ও পত্নী প্রায় এক মুহূর্ত্তেই স্বপ্ন দেখেন যে, হারাণ রায় মহাশয় বলিতেছেন "আমি বেশীদিন থাকিতে পারিলাম না, আবার তোমাদের নিকটই আসিতেছি।" উভয়ে এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার ৩।৪ দিন পরে রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ স্বপ্ন দেখিলেন যে, রায় মহাশয় তাঁহাকে বলিতেছেন "আমি আবার আসিতেছি, তোমার সন্তান হইলে তাহাকে বলিও না যে, সে আমিই। আমার মাকে ও স্ত্রীকে এই কথা পূর্ব্বে জানাইয়াছি, অদ্য তোমাকেও জানাইলাম।" রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ এই সময়ে চার কি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, পরে যথা সময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই বালকের বর্ত্তমান নাম হেমচন্দ্র রায়, বয়স এখন ৮।৯ বৎসর। হারাণ রায় মহাশয় স্বপ্ন-দর্শন কালে "আসিয়াছি" কি "আসিতেছি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায় নাই।

শ্রীশশধর রায়।

বাসনা।

অনন্ত অতৃপ্ত সদা, তুমিলো বাসনা!
মানবের আশাভূমি,—তুমি সে কামনা!
জন্ম জন্ম আছ সাথে, নাহি তব সীমা,
অলীক স্বপন তুমি,—কি দিব উপমা?
শানিত ছুরিকা কভু, দারুণ পিপাসা,—
নরকের বহ্নি সম, প্রদীপ্ত লালসা,—
মরুভূমে মরীচিকা, কুসুম-সুষমা,
ঘনশ্যাম তরুশিরে, গলিত চন্দ্রমা।
নিষ্পাপ তাপসী হৃদে, পাই দেখা কভু,
দুর্গম অরণ্য মাঝে, অনুপম বপু,
রণস্থলে, মৃত্যুমুখে, শোণিতের মাঝে,—
সেথাও গো, পাই দেখা নবনব সাজে।
নির্ব্বাণে নিবৃত্তি বুঝি, নাহি তব পাশে,
নত জীব হে বাসনা! তোমার সকাশে।

শ্রীফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গার্হস্থ্য চিত্র।

(গোবরার কীর্ত্তি।)

খুকিগুলো যে কেন জন্মায়! আমাদের অমনি একটা খুকি আছে। মা আবার তাকে আদর করে 'খুকু খুকুন' কত কি বলে। বাবাও তাই। আদর একেবারে ধরে না। এত যে আদর কিসের—তা ত দেখতে পাইনি, পোড়ারমুখীটার যদি একটু বুদ্ধি আছে। জানবার মধ্যে জানেন কেবল কাঁদ্‌তে, পা আছড়াতে, চুল ছিঁড়তে আর আমার মুখে লাল মাথাতে। আর আমার সমস্ত ভাল ভাল খেলনা ভেঙ্গে দিতে। বেরালটা অবধি ওকে ভয় করে না। ওর চেয়ে আমাদের বেঘো কুকুর ঢের ভাল। মা আবার বেঘোকে তাড়িয়ে দিতে চায়। বেঘোর চেয়ে যে ওঁর খুকুন কিসে ভাল তা ত দেখতে পাইনি, তবু ঝিয়েতে মায়েতে ২৪ ঘণ্টাই কচ্চেন 'খুকুন আমার সোণা খুকুন চাঁদের কোণা' 'খুকুনকে দেখলে চোক জুড়োয়'। বাবার আবার আরও বাড়াবাড়ি; আহ্লাদে মেয়েটা যখন নাক কামড়ে মুখময় লাল

মাখিয়ে-দেয়, কোথায় ধুয়ে ফেলবে, না—বাবা একেবারে হেসে-গড়িয়ে পড়ে। হতভাগা মেয়েটাকে যদি আমি দু' চখে দেখতে পারি। আর তেমনি হয়েছে, আমাকেই কেবল বলা হয় একবার খুকুনকে ধর্‌নারে গোবরা, ওকে একটু নেনা, হ্যাঁরে একটু কি ওকে ভোলাতে নেই। ওঁর বেলা খুকুন—আর আমার বেলা গোবরা। কেন, আমার ভাল নাম নেই নাকি, তাই ধরে ডাকলেই ত হয়। নাম রাখবার বেলা প্রমথ, ডাকবার বেলা গোবরা। বাবারই ত যত দোষ। বাবাইত অমনি করে ডেকে নাম খারাপ করেছে। দাদা শক্ত ছেলে কি না, তার কাছে ঘেঁসবার যো নেই। সে অমনি নিলে আর কি, 'আমার কাজ আছে' বলে চলে যাবে। আমি ভাল মানুষ কি না, তাই আমারি যত দোষ। তখন কেমন 'লক্ষিটি একবার ধরনা বাবা।' তার পর যেই আমি কোলে করে নিয়েছি অমনি মাতে ঝীতে 'হাঁ, হাঁ এই করিস কি! কোলে নেবার রকম ছ্যাখ, ওরে গেলরে ওর নড়াটা ভেঙ্গে গেল যে, অমনি করে ওটাকে মেরে ফেলবি না কি! ভাল করে সোজা করে ধরনা, লাগলইবা তোর গায়ে একটু নাল, ভারি যে বাবু হয়েছিস, দেখতে পাই।'—বলে খেতে এল। বাবা অমনি বাইরে থেকে তাড়াতাড়ি আরসী হাতে কামাতে কামাতে উঠে এল, যেন একেবারে কি হয়েছে। তবু আমাকে দিতে আসে কেন, আমি ত আর সেধে সেধে নিতে যাইনি। আমি মরে গেলে তখন টের পাবে। ঝী মাগীটা কি কম পাজী, ওটা আবার মাকে বলে—ওগো খুকুনটি একে টুকটুকে তাতে আবার কোলেরটি কিনা, তাতে আবার এতদিন পরে হয়েছে তাই ওর ওপর ছোটদাদার এমন রাগ। বুট দিয়ে কেমন মাগীর একদিন পা মাড়িয়ে কাঁদিয়ে দিয়েছিলুম। আবার আমার সঙ্গে লাগচে! এইবার একদিন মাগীর প্যাঁটরার ভেতর ভাল ভাল জিনিষ যা আছে হুঠাৎ কে নিয়ে যাবে, তখন মাগী টের পাবে। অ্যাঁঃ মামার বাড়ীর ঝী, তবে ত একেবারে মাথা কিনেছে। ছোট মামাকে শিখিয়ে দেব, মাগী যখন এবার তত্ত্ব নিয়ে মামার বাড়ী গিয়ে দিদিমার ঘরের দালানে পড়ে হাঁ করে ঘুমুবে, তখন খাটের খুরোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে মাগীর চুল-না বেঁধে আর বড় মামার নস্যির কৌটা থেকে নস্যি-না দিয়ে মাগীর নাকে খুব গুঁজে দেবে। ছোট মামা কিছু নস্যি নেয় না যে, তাকে ধরবে; বড় মামাকে ত আর কিছু বলতে পারবে না। ন' মামা কি নতুন মামা হলে এক ধরত, তা তারাত এখন মধুপুরে।

আমি যেন কিছু বুঝতে পারিনি। ঐ মাগীই ত হচ্চে আসল পাজী। গোদামাগী কেমন সকালসকাল কাজ কর্ম্ম সেরে মাকে অমনি ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে থিয়েটার দেখতে চল্‌ল। আমায় অমনি মা বুঝিয়ে দিলে—'দেখ বাবা আমি একবার নতুন মার বাড়ী যাচ্চি। এখুনি আবার ফিরে আসব রাজীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি, মানুর বাড়ীর খবরটা একবার নিয়ে আসবে। আমি এখুনি আসব, যদি দেরী হয় ত নেচী টেচী সব ব্যালা রইল, ঠাকুরকে বলে গেলুম। তোর মতন খাবার সকাল সকাল করে দেবে এখন, আর সকালের পাঁটা রাঁধা আছে, তাই গরম করে দেবে এখন—বুঝলি, আর এই দু' আনা পয়সা রাখ—যদি কিছু মিষ্টি খাস ত রামচরণকে বলিস, এনে দেবে। মোচা-চপ সকালে খেয়েছিস ত। তা না হয় ঠাকুরকে বলিস আর এক খানা দেবে এখন। বুঝলি না—ছি বড়ার অম্বল দুবেলা খায় না। আর লক্ষীধন আমার—খুকু ঘুমুচ্চে, উঠলে পরে তাকে একটু ভুলিও, আর রামচরণকে বলো বড় ঘরের তক্তার নীচে তার দুধ আছে, যেন গরম করে খাইয়ে দেয়। আমি এই যাব, আর আসব। তা নে না এই আরও ৪টা পয়সা রাখনা, যদি ঠাকুর আসবার আগে খিদে পায়—৩।৪ পয়সার কচুরী কি পাঁপর আনিয়ে খাস। আর দ্যাখ—যদি এর মধ্যে বাড়ী এসে জিগ্‌গেস করে ত বলিস আমি বার-সিমলেয় গেছি।' আমি ন্যাকা কিনা—তাই রাজী মাগী সকালে ডাল বাটবার সময় বলছিল, নতুন মামা আজ বাইশকোপ দেখতে যাবে, আর আমাকে দেখে অমনি চুপ কল্লে। দাদা যে নমামাদের সঙ্গে মধুপুরে গেছে নইলে থিয়েটারে যাওয়া বের করে দিত। বাবার কি! সুরেশ বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে বসে বসে তাস পিটছে। আমি কেবল কোথাও যেতে পাব না। মনে করেছিলুম—আজ ফটকেদের বাড়ী গিয়ে কোথায় খানিক ঘুড়ী উড়িয়ে আসব, তা হল না। শচেদের বাড়ীও ত আজ যাবার কথা ছিল। আজ ত তারা সেই নতুন গেরোবাজ জোড়াটা ওড়াবে। বলে ছিল—এক টাকায় সেই কাল মুখ্‌খী জোড়াটা আমায় কিনে দেবে। মাগীর তত্ত্ব বিদেয়ের টাকাটাও ত সেই জন্যে কেড়ে রেখেছি তাও হল না। নীলুকাকা বলেছিল—আজ জল বদলাবার সময় গেলে এক জোড়া চারনেজা লাল মাছ দেবে। সেখানেও যাওয়া হ'ল না। খুকুনকে আগলে বসে থাক, তাহলেই আর কি, সব হ'ল! আবার একমাস না হলে নীলুকাকা আবার মাছের চৌবাচ্চার জল বদলাচ্চে কি না।

আমিও তেমনি। আমি অমনি ফাঁকি পড়বার ছেলে কিনা? দিদিমা সেদিন আমচুর, ছড়া তেঁতুল, কুলকুটো সব পাঠিয়েছে, আমি ত আর খবর পাইনি কিনা? যাও না থিয়েটারে, আমি এ দিকে সব ঠিক করে রাখছি। এই যে আবার ভাঁড়ার ঘরের চাবিটি লুকিয়ে না রেখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বটে! তবে ত আর আমি খুলতে পারব না। সইসের ঘরের যে ঠিক এই রকম কুলুপ তার কি? সে বেটা ত আস্তাবলে পড়ে ঘুমুচ্চে তার চাবি আন্‌তে কতক্ষণ। দেখেছ, এই এমন ভাল ভাল সব আচার টাচার দিদিমা পাঠিয়েছে আর আমাদের খেতে দেবার নামটি নেই। কেবল মানীর মাকে পাঠাবে আর ওদের ঐ রাঙ্গা বউটাকে দেবে। এসে 'দিদিমণি দিদিমণি' করে খোসা-মোদ করে কি না? কই ছড়া তেঁতুলে ত তেমন ঝাল নেই—ওই যে পোড়ার মুখো মেয়ে এরি মধ্যে উঠে সুর ধরেছে। রামচরণটা এখুনি এসে সব দেখে ফেলে এই। লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! আগে চট করে হাতে একটা যা হক কিছু দিয়ে আসি, ততক্ষণ চুপ করুক, তারপর এসে এ সব তুলে টুলে ভাঁড়ার ঘর বন্ধ করে যাব। কিই বা দি'—মুখপুড়ীটা থামে। বাবার ওই জুতোয় মাখাবার কালীর শিশিটা দি,' ওটা ত আর খুলতে পারবে না মুখ খুব আঁটা আছে, আমিই খুলতে পারিনি।

যাক্, সহিস বেটা টের পাইনি। যে হাঁ করে ঘুমচ্চে। হাতে কাঁচি ছিল না, নইলে বেটার দাড়ী চারটি ছেঁটে দিতুম। রামচরণটাও টের পায়নি—বাঁচা গেছে। আর ত আজ একশবারি তামাক দিতে হচ্চে না—খুব ঘুমচ্চে মজা করে।

* * * * *

এই—এই—হতভাগা মেয়ে কি—কল্লি কি—কল্লি! খেয়েছিস নাকি? দেখি দেখি, রামচরণ দেখ, দেখ খুকি কি কল্লে! এ যে কুটের মতন দেখাচ্ছে! মা বাবা দেখলে কি বলবে, তার চেয়ে এমনি করে সব জায়গায় মাখ যে একরঙা দেখাবে আমার পিঠেও একটু দি', বলব আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তুই মাখিয়েছিস, রামচরণ—রামচরণ ও হতভাগা রেমো—*

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

---

* উপরে লিখিত আত্মকাহিনীতে প্রিয় গোবর বা গোবরা যে সকল কথা বলিয়াছে তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নয়। গোবরের পিতা আমাদের বন্ধু এবং তাঁহার মুখে উপরোক্ত কাহিনী সপ্রমাণিত হইয়াছে,—অর্থাৎ এ স্বদেশীর কালে ইংরাজী বুকনি দিয়া

হরিনদী।

মহাকালের করাল কবলে কাহারও নিস্তার নাই। আমাদের এই 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমি একদিন ভীষণতিমিনক্রসঙ্কুল ভীতিপ্রদ-তরঙ্গরাজি সমাকীর্ণ গভীর সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল; মহাকাল গণ্ডূষে সমুদ্রসলিল পান করিয়া, স্তরের পর স্তর সাজাইয়া, কে জানে কতকালে কতযত্নে মনুষ্য-বাসোপাযোগী এই বঙ্গভূমির সৃষ্টি করিয়াছে! আবার কোন-দিন মহাকালের কুটিল কৌশলে, এই "ফলফুল সুশোভিতা শ্যামা" বঙ্গভূমিকে হয়ত ভূগর্ভের কোন অজ্ঞাতস্থানে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে হইবে! যে মহাকাললীলা এত দুর্জ্ঞেয় ও এত অদ্ভুত, যে মহাকালের ক্ষমতা এত গূঢ় ও এত রহস্য জড়িত, সেই দুর্জ্জয়শক্তি অক্ষয়প্রতাপ মহাকালের করস্পর্শে ক্ষুদ্র "হরিনদী" কতদিন তিষ্ঠিতে পারে?

বঙ্গের পুরাতন গ্রাম হরিনদীকে ক্ষুদ্র বলিতেছি বটে, কিন্তু হরিনদী যখন ভাগীরথীর উত্তর তীরে সুদৃশ্য সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তখন সে ক্ষুদ্র ছিল না। তখন সে শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ে পরিগণিত গ্রামসমূহের মধ্যে গণ্য ছিল! আর আজ? আজ কেবল নাম আছে, গ্রাম নাই!

বুঝাইবার পদ্ধতি থাকিলে বলা যাইতে পারিত এ 'confession corroborated.' গোবরের পিতা রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক। তিনি একবার যা ধরেন তা আর বড় সহজে ছাড়িতে চান না। সুতরাং জুতার কালী সম্বন্ধেও তাঁর ব্যবস্থা যে সাবেক ধরণের ছাড়া আধুনিক প্রথার অনুযায়ী হইবে না তাহা স্বাভাবিক। এই কারণেই তিনি আজও সেই সেকালের "Noubian Ink" ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহার এই রক্ষণপ্রিয়তার ফলে তাঁহারি পরিবারে যে দুর্ঘটনার জন্য আমরা পাঁচজনে দুঃখিত হইতেছি তিনি সেই বিশেষ কারণেই সুখী, কেন না তিনি রক্ষণশীল হইলেও মঙ্গলবাদী এবং তাঁহার বিশ্বাস যে দুঃখের আকারে আমরা যে সকল কষ্টভোগ করিয়া থাকি, তাহা আর কিছুই নয় দুঃখের নামে সুখের প্রকারান্তর মাত্র। এই জন্যই উক্ত ব্যাপার উপলক্ষে মেজাজের প্রতারণায় গোবরের কাণ মলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি একথা স্বীকার করেন যে, ভগবানের শুভ ইচ্ছা সফল হইবার জন্যই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। নচেৎ বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মেডিক্যাল কালেজের কোনও বিশেষ ও বিশিষ্ট ছাত্র এই কালী তুলিবার জন্য ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর পরিশ্রমের পর সফল কাম হইয়া খুকুনের স্বামী; তার পিতামাতার গৌরব ও গোবর বেচারী সুরুচির হইয়া আজ স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবার অবসর পাইবে কেন?—অতএব আমরাও বলি—তথাস্তু!—

জাং—সং।

যখন ভাগীরথীর শাখানদী সরস্বতী, বঙ্গের পুরাতন বন্দর সপ্তগ্রামের বাণিজ্যবহন করিবার জন্য স্বদেশী ও বিদেশী বণিকবৃন্দের পোতাদিতে সুশোভিতা ছিল,—যখন সুরমা-রাজপথ-বেষ্টিত সুদৃশ্য-সৌধমালা-পরিশোভিত সপ্তগ্রাম শ্রীসম্পন্ন ছিল,—যখন গৌড়াধিপতির প্রতিনিধি হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস এই সপ্তগ্রামে থাকিয়া বার্ষিক চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ মুদ্রা রাজকর সংগ্রহ করিতেন, সেই সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যে আমরা হরিনদীর উল্লেখ দেখিতে পাই। সপ্তগ্রামের হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসের বাটীতে পণ্ডিত-সভায় এই হরিনদী গ্রামের একজন দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ রূপবান যুবা পণ্ডিত প্রসিদ্ধ ভক্ত হরিদাসের সহিত কিছু তর্ক করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতের নাম গোপাল চক্রবর্ত্তী। "চৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস এই ঘটনাটি এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।—

"হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন,
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন।
ওহে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার?
ডাকিয়া যে নাম লহ কিহেতু ইহার?
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়,
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়?
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে,
এইত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে।"

বৈষ্ণবকবি বৃন্দাবন দাস "দুর্জ্জন" বলিয়া বর্ণনা করিলেও, এই ব্রাহ্মণ যুবার পাণ্ডিত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন না শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইনি "পরমসুন্দর পণ্ডিত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তৎসময়ে হরিনদী গ্রামে বিদ্যাচর্চ্চা ছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্বান ছিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন হরনদীর নিম্নে পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী প্রবাহিতা; সুতরাং হরিনদীও বাণিজ্যস্থান। বাণিজ্যাদির সুবিধাহেতু তৎকালে এই গ্রামে বহুসংখ্যক লোক বাস করিত এবং জাতিভেদ অনুসারে এক এক জাতি এক এক দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিত। দেড় সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবার পৃথক ভাবে নগরের এক দিকে এবং বহু কায়স্থ, বৈদ্য, কামার, কুমার ইত্যাদি জাতিসমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নগরের ভিন্ন

ভিন্ন অংশে বাস করিতেন। মনুষ্য-বাসের এরূপ প্রণালী, আজ এই আলোকময় বিংশ শতাব্দীতে অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু হরিনদীতে প্রকৃতই একদিন এই প্রকার পল্লীনির্দ্দেশ ছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণগণের দেবমন্দিরস্থ শঙ্খঘণ্টাধ্বনি মুসলমান সমাজকে বিচলিত করিত না এবং মুসলমান-গৃহের পলাণ্ডুগন্ধ-সমন্বিত ধূমরাশি ব্রাহ্মণবর্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া তাঁহাদিগকেও উত্তেজিত করিত না।

এই হরিনদীতে ব্রাহ্মণকুলতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন অনেক কুলাচার্য্য ঘটক বাস করিতেন। এই মহাত্মাগণের মধ্যে গোপাল শর্ম্মা ঘটক মহোদয় কৃত "ধ্রুবানন্দমত ব্যাখ্যা" নামক কুলগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। এই ঘটক মহোদয়গণের কাহারও কাহারও বংশধরগণ এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হরিপুর নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। হরিনদীর ঘটকবংশ বলিয়া সমাজে ইঁহারা বিশেষ সম্মানিত।

বর্ত্তমান হরিনদীর প্রায় তিন মাইল উত্তরে বাগাঁচড়া নামক গ্রামে প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতবৎসর পূর্ব্বে চাঁদরায় নামক একজন ধনবান্ ব্যক্তি বাস করিতেন। তখন বাগাঁচড়াও শ্রীসম্পন্ন ও গৌরবান্বিত ছিল। এই বাগাঁচড়ার ব্রাহ্মণ বংশ-গৌরব চাঁদরায় ১৫০৭ শকে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি চাঁদরায়ের বৃহৎ বাটীর ইষ্টকস্তূপের উপর জঙ্গলাবৃত হইয়া অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া চাঁদরায়ের পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দান করিতেছে। চাঁদরায় প্রতিষ্ঠ এই শিবমন্দিরের পূর্ব্বদ্বারে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে।—

"শ্রীশিবঃ।
শাকেবারমতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কেনাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশুসুধাকরকরক্ষীরোদনীরোপমং।
তস্মৈ সৌধমিদং মুদাম্বুজলদা নিল'ন লোলধ্বজং
তৎপাদাহিত ধীর ধীর বিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ॥"

এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ চাঁদরায় হরিনদী গ্রামের নিম্নে নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন এবং হরিনদীর পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞানার্জ্জন জন্য গমনাগমন করিতেন। হরিনদীর সহিত এই চাঁদরায়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন স্বরূপ "চাঁদরায়ের জাঙ্গাল" অদ্যাপি বর্ত্তমান। চাঁদরায়ের বিস্তৃত বাটীর দক্ষিণদ্বার হইতে হরিনদী পর্য্যন্ত প্রায় ৮০ হাত প্রসারিত এক পথের বর্ত্তমান নাম "চাঁদরায়ের জাঙ্গাল।" এই রাস্তায় চাঁদরায়ের রথ চলিত।

বর্ত্তমান সময়ে এই রাস্তা কয়েক স্থানে লাখরাজ জমিরূপে আবাদ হইতেছে।

এখন সে হরিনদী নাই, হরিনদীর নিম্নে সে ভাগীরথীও নাই, চাঁদরায়ের বংশে বাতি দিতেও কেহ নাই। আছে কেবল হরিনদীর নাম, ভাগীরথীর খাত, চাঁদরায়ের বাটীর ইষ্টকস্তূপ, আর এই জাঙ্গালের লুপ্তাবশেষ! হয়ত কালের কঠোরকরস্পর্শে এ সকলের চিহ্নও বিলুপ্ত হইবে। সরস্বতীর স্রোত বন্ধ হওয়ায় বাণিজ্যপ্রধান সপ্তগ্রাম শ্রীহীন হইল; ভাগীরথীর গর্ত্তে পতিত হইয়া হরিনদী বিলুপ্ত হইল! বর্ত্তমান সময়ে যে ক্ষুদ্র গ্রামকে হরিনদী বলে, তাহা হরিনদী নহে; "ভাতশালা" নামক হরিনদীর এক ক্ষুদ্র অংশ। এখানে এখন কয়েক ঘর মালো ও মুসলমানের বাস আছে! ইহা বর্ত্তমান কালনা হইতে দুই মাইল উত্তরে ও শান্তিপুর হইতে চারি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পুরাতন হরিনদী যে স্থানে ছিল, তাহা এখন বিস্তৃত "চর" রূপে পরিণত। এই চরে সাহেবডাঙ্গা, বাব্‌লা বাগান, নৃসিংহপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম পত্তন হইয়াছে। ঐ সকল গ্রামের কৃষকেরা ধনৈশ্বর্য্য বিদ্যা-বাণিজ্য গৌরবান্বিত হরিনদীর রূপান্তরিত মৃত্তিকা হইতে শস্যরাশি সংগ্রহ করিতেছে।

হরিনদীর অভাবনীয় পতনের কারণ ভাগীরথীর নিশ্মম অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু কোন সময় হইতে হরিনদী শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। হরিনদী যখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, হরিনদীর লোকসকল যখন গঙ্গাগর্ত্তে বাস্তভূমি বিসর্জ্জন দিয়া দূরে দূরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, তখন হইতেই হরিনদীর শোভা সমৃদ্ধির ক্ষয় আরম্ভ হয়। দক্ষিণাংশ এইরূপে গঙ্গাগর্ত্তে পতিত হওয়ার পর, উত্তরাংশের অধিবাসীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখনও ভাগীরথী হরিনদীকে গ্রাস্ করিতেছেন।

হরিনদীর উত্তরাংশে জগন্নাথ কয়াল নামে একজন ধনাঢ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি বাস করিতেন। হরিনদীর বন্দর তাঁহার ইজারা ছিল। এজন্য তাঁহার উপাধি ছিল "কয়াল।" তিনি হরিনদীর অবস্থা দেখিয়া যখন বুঝিলেন যে, আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই হরিনদীর চিহ্নমাত্রও ভাগীরথী অবশিষ্ট রাখিবেন না, তখন তিনি বাস করিবার জন্য নূতন স্থান মনোনীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তিনি জন্মভূমি হরিনদীর মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাই হরিনদীর নিকটেই স্থান মনোনীত করিয়া

গ্রাম-পত্তনের জন্য নদীয়ার মহারাজ-সমীপে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। তখন নবদ্বীপ-সমাজের মধ্যে কোন কার্য্য করিতে হইলে নবদ্বীপ-রাজবংশের অনুমতি আবশ্যক ছিল। বিশেষতঃ মহারাজের জমিদারীর মধ্যে নূতন গ্রাম বসাইবার জন্য মহারাজের অনুমতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। আবেদনের কতদিন পরে বলা যায় না, ১১৯৩ সালে মহারাজের স্বাক্ষরিত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া জগন্নাথ "বালিয়াডাঙ্গা" নামক গ্রাম পত্তন করেন। অদ্যাপি এই "বালিয়াডাঙ্গা" গ্রামে জগন্নাথের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন।

সেকালের সে হরিনদীও গিয়াছে এবং যে গঙ্গার প্রবলস্রোতে হরিনদীর মৃত্তিকা বিগলিত হইয়াছিল, সে গঙ্গাও সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছেন। তাই গঙ্গার সেই শুষ্ক খালের তীরে দাঁড়াইলে মনে হয়—

"চিরদিন কখনও সমান না যায়!"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুমি মোর।

তুমি মোর পূর্ব্বজন্মে বিষাদের স্মৃতি
এত মোরে বাস ভাল,
তবু মোরে দগ্ধ কর নিতি।

তুমি মোর বসন্তের যূথীর সৌরভ,
ঘ্রাণে শুধু মাতে মন,
সৌন্দর্য্যের নাই অনুভব।

তুমি মোর চিরপুষ্ট অতৃপ্ত পিয়াসা,
কথা কিছু পারিনা শুনাতে,
বলিবার নাই কিছু ভাষা।

আলম্‌গীরি কথা।

প্রভূত প্রতাপান্বিত, দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের (আলমগীর) সম্বন্ধে আমি কতকগুলি ঐতিহাসিক কথা নানা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম। পুস্তকগুলি দুস্মূল্য ও দুস্প্রাপ্য। মেনুশী, বার্ণিয়ার ও উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে আজ যাহা বলিব সে গুলি উপকথা নহে। ইংরাজীতে যাহাকে Annecdotes বলে, ইহা তাই। স্মৃতি মন্থন করিয়া সেগুলি জাহ্নবীর পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

ঔরঙ্গজেব, কি কৌশলাবলম্বনে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান মোরাদকে নিজের আয়ত্বাধীন করিয়া তাঁহার ও নিজ সৈন্যবলের সহায়তায় সুলতান দারা এবং সুজাকে পরাজয় করেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অজ্ঞাত নহে। ঔরঙ্গজেব, সম্রাট্ সাহজাহানের সেনাপতি, রাঠোর-রাজ যশোবন্তসিংহকে কি করিয়া পরাজিত করেন, তাহাও সাধারণ ইতিহাসের সত্য। ক্ষত্রিয়বীর যশোবন্ত পরাজিত হওয়ায়, তাঁহার তেজোময়ী সহধর্ম্মিণী কিরূপ অশ্রদ্ধার চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, কিরূপ লাঞ্ছিত করিয়া তাঁহার দুর্গ-প্রবেশ-পথ রহিত করিয়াছিলেন, তাহাও সাধারণ ইতিহাসের কথা। বস্তুতঃ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত না হইলে, হয়তঃ ঔরঙ্গজেবকেই বন্দীভাবে সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইতে হইত; কিন্তু কৌশলী ঔরঙ্গজেব ভাগ্যবান পুরুষ। রাজপুত-বীর, প্রবীণ সেনানী মহারাজ যশোবন্ত ঘটনাচক্রে পড়িয়া পরাজিত হইলেন। যশোবন্তের এই পরাজয়-ব্যাপারে দিল্লীর সমস্ত প্রধান প্রধান আমীরওমরাহ ও সেনাপতিগণ চমকিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অনেকের মনে, একটা সন্দেহের ছায়াও উঠিয়াছিল যে, যশোবন্ত ঔরঙ্গজেবের সহিত গুপ্ত বন্দোবস্তে, ইচ্ছা করিয়াই পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা যশোবন্তের এ কলঙ্কে বিশ্বাস করি না।

ঔরঙ্গজেব সম্রাট সেনাপতি মহারাজ যশোবন্তকে পরাজয় করিয়া, আরও দর্পিত ও বলীয়ান হইয়া উঠিলেন। তিনি মোরাদকে সঙ্গে লইয়া একেবারে আগরার দুই ক্রোশ দূরে "আরামবাগে" উপস্থিত। মোরাদ তখনও ভবিষ্যৎ মসনদের সুখ চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত চিত্ত। চতুর ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য-সংকল্প সবই বুঝিতে অক্ষম।

ঔরঙ্গজেব আগরার সন্নিহিত হইয়া পিতাকে বিনীতভাবে এক পত্র লিখিলেন। পত্রের সারাংশ এই—"আপনার পীড়ার সংবাদে আমি সুদূর

দাক্ষিণাত্য হইতে, কনিষ্ঠ সুলতান মোরাদকে লইয়া রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দুনিয়ার বাদসা সাহান্‌শার নিকট আমার বিনীত নিবেদন তিনি যেন তাঁহার নিজ ব্যবহার্য্য মনিমুক্তা-অলঙ্কারগুলি আমাদের পাঠাইয়া দেন। দীনবেশে আমরা ভারত-সম্রাটের সহিত সাক্ষাতে অনিচ্ছুক। রাজবেশে দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করা যুক্তি-সঙ্গত, আমি এ ক্ষেত্রে তাহাই করিতে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি। আমি সসৈন্যে রাজধানীর অনতিদূরে অপেক্ষা করিতেছি।"

সাধারণের চক্ষে এ পত্রখানি বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু দিল্লীশ্বর সাহজাহান এই পত্রখানি পড়িবামাত্রই, তাহাতে দর্পের ও তীব্র শ্লেষের গন্ধ পাইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ঔরস-জাত সন্তান হইয়া, যে এতটা ধৃষ্টতা করিতে পারে—তাহাকে উপযুক্ত উত্তর দেওয়াই উচিত।

সাহজাহান তখন দারুণ মূত্রকৃচ্ছ রোগে শয্যাশায়ী। সেই তাজমহলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই মতিমহলের মালিক, সেই আসমুদ্র হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, বৃদ্ধ বাদসাহ আগরার মর্ম্মরমণ্ডিত, গুলাব-বাস-বাসিত, যমুনা শীকর সম্পৃক্ত, বায়ুকণা-পূরিত শীতল কক্ষে, রুগ্ন-শয্যায় শুইয়া পত্রের মর্ম্ম শ্রবণ করিলেন। তাঁহার রোগের যাতনা আরও বাড়িয়া উঠিল; শরীরের প্রত্যেক রন্ধ্রে অনলকণা ছুটিল।

গম্ভীরস্বরে বাদসাহ তোষাখানার কর্ত্তাকে আদেশ করিলেন—"আমার নিজের ব্যবহার্য্য যা কিছু মূল্যবান মণিমুক্তাজহরতঅলঙ্কারাদি আছে এখনি সম্মুখে লইয়া আইস। হকিম-খানা হইতে রূপার হামান-দিস্তাগুলা সব আনিয়া হাজির কর। যে পাপিষ্ঠ সন্তান আমা হইতে সূর্য্যালোক দর্শন করিয়া রাজ-বিদ্রোহী, তাহার অলঙ্কার পরিবার বাসনা আজই শেষ করিয়া দিব। এই হামান-দিস্তায়, এই বহুমূল্য রত্নালঙ্কারগুলি চূর্ণ করিয়া ধূলি-রূপে সহরের রাজপথে ছড়াইয়া দিব।"

ব্যাপার অতি ভয়ানক হইল দেখিয়া, উপস্থিত ওমরাহগণ বাদসাহকে অনেক বুঝাইলেন। কথাটা কি সহজ! ভাবিলেও যে শরীর শিহরিয়া উঠে। কোটী কোটী টাকার বহুমূল্য মণিমাণিক্য চূর্ণীকৃত হইয়া রাজপথে গড়াইবে? দিল্লীশ্বর কি উন্মত্ত হইয়াছেন। অনেক চেষ্টায়, অনেক বোঝা-পড়ার পর, বাদসাহ তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্প ত্যাগ করিলেন। রৌশনআরা

বেগম; কিন্তু সংবাদটা সহোদর ঔরজেবের কর্ণগোচর করিলেন। ইহার পরই ঔরঙ্গজেব সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতাকে বন্দী করেন।

এতো গেল—সাহজাহান-ঔরঙ্গজেব ঘটিত কথা। এইবার ঔরঙ্গজেবের নিজের সম্বন্ধে গোটা দুই চার কথা বলিব।

ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা তাহাকে (Bigot) এই আখ্যাটী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্বধর্ম্মে ঔরঙ্গজেবের যে অসাধারণ অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা ছিল বাস্তবিকই তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগীর অনুকরণীয়। একটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি। একদিন ঔরঙ্গজেব জুম্মা-মস্‌জিদে প্রার্থনায় নিরত। তাঁহার মন ঈশ্বরের অতুলনীয় মহত্ত্বচিন্তায় সমাচ্ছন্ন। তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত। এই সময় পায়ে একটী বৃশ্চিক দংশন করিল; যন্ত্রণা হইতেছে তবু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বাদসাহের শরীরে দংশন করিয়া বৃশ্চিক চলিয়া গেল, কিন্তু ঔরঙ্গজেব স্থানত্যাগ করিলেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রার্থনা শেষ হইল, তিনি অটল ভাবে নিস্পন্দ অবস্থায় নেত্র মুদিত করিয়া রহিয়াছিলেন।

র‍্যালফ্ ফিচ্ বলিয়া একজন ভ্রমণকারী এই সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত হন। লোকটী ইউরোপ হইতে আসিয়ার উপর দিয়া হাঁটিয়া, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিত, লোকটার একটু ছিট্ ছিল। নিয়ম এই প্রার্থনার পূর্ব্বে জুম্মা ও মতি-মস্‌জেদ হইতে আজান দেওয়া হয়। পাগল ফিচের সখ হইল—সে আজান দিবে। একদিন মধ্যাহ্ন কালে কাহাকে কিছু না বলিয়া সে মসজেদের খিলানের উপর উঠিয়া আজানের মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল। তাহা অনেকের কাণে পৌছিল। অনেকে মস্‌জেদের দিকে ছুটিল। বাদসাহের কাণেও যে সে শব্দ যায় নাই, তাহা নহে। বাদসাহ অসময়ে এই আজানের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন—"পাগ্‌লা ফিচই এই কাণ্ড বাধাইয়াছে।" বাদসাহ্ তাহাকে পাগল বলিয়া জানিতেন। সে যে একটা দুঃসাহসিক লোক—তাহাও তিনি জানিতেন। সকলেই অনুমান করিল, ধর্ম্মান্ধ বাদসাহ তাহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দিবেন; কিন্তু ঔরঙ্গজেব ফিচ্‌কে কাণ মলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন।

কাহিনী অনেক। বলিলে সব একবারে ফুরাইবে না। তাহাতে জাহ্নবীর স্থান কম। তবে একটী বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। এইটীতে সে কালে সম্রাট নিন্দার কি ভীষণ শাস্তি হইতে তাহা প্রমাণ করিবে।

ঔরঙ্গজেবের স্বভাব—নিজে ছদ্মবেশে গভীর রাত্রে দুর্গের চারি দিক দেখিয়া বেড়াইতেন। একদিন নৈশ ভ্রমণকালে তিনি দেখিলেন দুইজন ওমরাহ দুর্গ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহারই নামোল্লেখ করিয়া কি বলাবলি করিতেছে। কৌতুহলপরবশ হইয়া বাদশাহ এক প্রস্তর স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় দুইজন উচ্চপদস্থ ওমরাহ। বাদশাহ স্বকর্ণে শুনিলেন তাহারা তাঁহার নিন্দা করিতেছে। তিনি সহসা তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা বুঝিল তিনি সব শুনিয়াছেন। বাদশাহকে দেখিয়া তাঁহারা অবনত জানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু সে অপরাধের নিস্তার নাই। ঔরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ দুই জন ভীমকায় কাফ্রি খোজা আসিয়া উপস্থিত। বাদসাহের আদেশে নিন্দাকারী বলিয়া তখনই তাহাদের জিহ্বা উৎপাটিত হইল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

আয়ু-ভিক্ষা।

(আজি) শিথিল সব ইন্দ্রিয়, চরণকর নিষ্ক্রিয়,
তিমিরময় প্রাণপ্রিয় গেহ;
(ও কে) শান্তিসুখ দূর করি, বজ্রকরে কেশ ধরি,
বেগভরে শূন্যে তোলে দেহ!
হে, পুঞ্জ অলিগুঞ্জরণ মঞ্জুল-নিকুঞ্জবন!
সজ্জিত বিলাস গৃহ রম্য!
দাসগণসুষ্ট, পরিপূরিত সুগীত রবে,
দীনজন চির-অনধিগম্য!
হে হেমমুকুট! মণিরঞ্জিত সুমঞ্চ শত!
দীপ্ত, মতিহীরক প্রবালে!
হে, চন্দন প্রলিপ্ত মৃগনাভি! হে কস্তুরী!
সুরভিত সুগন্ধি ফুলমালে!
হে, কমল-কুলমণ্ডিত, মধুপ-কল-গুঞ্জিত,
নির্ম্মল প্রশান্ত শত বাপি।

হে বনভবন-চারি শুকসারি! পিক পাপিয়া!
পুচ্ছধর সুন্দর কলাপি!
হে রাজদৃত্র! হে রাজপদ গৌরব,
হে ধর্ম্ম! রত্নগজবাজি!
বিপুলমিত আয়ু কর দান, চিরসেবিত
বন্ধুমম! হে বিভবরাজি!

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

দীনের আত্মনিবেদন।

রাজা তুমি প্রজা আমি, ধনী তুমি নির্দ্ধন আমি—জ্ঞানী তুমি অজ্ঞান আমি—শিক্ষিত তুমি অশিক্ষিত আমি, তোমায় আমায় স্বর্গ মর্ত্ত—আকাশ পাতাল—দিবা রাত্রি প্রভেদ। তুমি দিবানিশি সুখের অম্লান জ্যোৎস্নায় আত্মহারা—আর দারুণ দুঃখের দুশ্ছেদ্য আলানে সমাবদ্ধ আমি নিয়তই নিষ্পেষিত; দুশ্চিন্তা রাক্ষসী তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার সুযোগ ও অবসর অনুসন্ধান করিয়াও অকৃতকার্য্য—আর আমার ন্যায় দীনাতিদীনের শূন্য হৃদয় দুশ্চিন্তার চির আবাসস্থান; অজস্র অর্থের অপব্যয় করিতে তুমি কদাচিৎ কুণ্ঠিত—বিমুক্তহস্ত, আর একটী কপর্দ্দকের আশায় শীতাতপের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আমি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে অকুণ্ঠিত; ফলতঃ তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ—বহুল ব্যবধান।

দীন আমি, দীনতায় দগ্ধ জীবন পর্য্যবসিত করিবার জন্যই কি জগতে আসিয়াছি? অনাহারে জীর্ণশীর্ণ-কলেবরে, অভাবের দুর্জ্জয় অবসাদে একান্ত অবসন্ন হইয়া দুর্বহ জীবন-ভার বহন করিবার নিমিত্তই কি নিদারুণ সংসারের কঠোর বক্ষে জন্মলাভ করিয়াছিলাম? অশনাভাবে কালকবলে চির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও কেহ দেখিবার নাই—একটী কথা বলিবার নাই—সন্তপ্ত ও শোকার্ত্ত হইলেও আমার দিকে ফিরিয়া চাহিবার লোকাভাব; হায়! হায়!! ইহাই আমার জীবন-ধারণের পরিণাম! দীনের জীবন কি এতই মূল্যহীন, এমনই অসার, এরূপ অপদার্থ যে, সংসারের এত দয়া, মায়া, ভালবাসা, সহানুভূতি; ইহার বিন্দুমাত্র লাভ করিবার অনধিকারী!

সংসার কি এতই স্বার্থপরতা-বিজড়িত যে, দুঃখ-কষ্ট-রোগশোকের দাবদাহে কাহারও আশ্বাস-বাণীর আশা করাও বিফল! জগতের অগণ্য অসংখ্য নরনারী কাহারও হৃদয় কি দীনজনের দীনতা দেখিয়া দ্রব হয় না? প্রেমময়ের প্রেমের নিত্য-নিকেতনে একি পৈশাচিক লীলা! ভালবাসা মাত্র কথার কথা—পরদুঃখে হা হুতাশ কেবল মনভুলান মাত্র—ভ্রমক্রমে দুই চারিটা মিষ্টকথার অবতারণা ব্যবসাদারীর নামান্তর মাত্র! আমার দুঃখেকষ্টে তোমার ভাবান্তর হয় না—শত যন্ত্রণাতেও কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক হয় না—অনশনে অবশাঙ্গ চলচ্ছক্তি বিরহিত হইলেও তোমার দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের প্রত্যাশাও নাই; হরি! হরি!! এই কি সংসার? এই কঠোর নির্দ্দয় সংসারবক্ষে তোমরাই খ্যাতি-প্রতিপত্তি-মান-সম্ভ্রমের অধিকারী!

দীন-দুঃখ দূর করাই সংসারের পরম ধর্ম্ম—সংসারীর সার ধর্ম্ম এবং মানব মাত্রেরই মঙ্গল নিকেতন। জগতের ইতিহাস পর্য্যাবেক্ষণ কর দেখিবে দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত—ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন কর, দেখিবে দয়াই দুস্তর সংসারার্ণবের একমাত্র তরণী মহাজনগণের শরণাপন্ন হও সেখানেও দয়াই জীবজগতের অমূল্য কোহিনূর—এই উপদেশ প্রাপ্ত হইবে; ফলতঃ সংসারে যদি কিছু অমূল্য অতুল্য পদার্থ থাকে তবে তাহা দয়া—মানবকে যদি কিছুতে চরমোৎকর্ষে উপনীত করাইতে পারে, তাহা একমাত্র দয়া; এই দয়াই স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ সংসারে মানবকে দেবত্ব প্রদান করিতে সক্ষম। দয়ার ন্যায় অমূল্য স্বর্গীয় ধনে যাঁহার হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ—দয়ার অলৌকিক শক্তিতে যে নরশ্রেষ্ঠ সম্পন্ন, সংসারের শত শত রজতকাঞ্চন তিনি ধূলি মুষ্টির ন্যায় ফুৎকারে উড়াইতে পারেন। আজ তুমি যে ধনমদে মত্ত হইয়া দাক্ষিণ্যাদি সৎপ্রবৃত্তি সমূহকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছ—যে অহংজ্ঞান বিভোর হইয়া বিশ্বেশ্বরের পূত-পবিত্র নামে কলঙ্ককালিমা আরোপিত করিতেছ যাহার বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া আত্মহারা, জ্ঞানহারা যে ঐশ্বর্য্যগরিমায় স্ফীতবক্ষ হইয়া তুমি দীন-দরিদ্রের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছ না তাহা কয়দিনের জন্য একবার চিন্তা করিয়াছ কি?

"দীনজনে দয়া কর" এই শিক্ষাবীজ সর্ব্বপ্রথম তোমার উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা সময় দোষে ক্ষেত্রের দোষে উপযুক্ত যত্নের অভাবে

আজ পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইল না, সুতরাং তাহার পল্লবিত হইয়া মুকুলিত হইবার আশা কোথায়? আর দয়া-ধর্ম্মে উপেক্ষা করাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়--দীনজনের দীনতাকে উপেক্ষা করাই যদি শিক্ষার পরিণাম হয় তবে ঈদৃশ শিক্ষা সংসার হইতে যত শীঘ্র অন্তর্হিত হয় ততই মঙ্গল। অর্থব্যবহার শাস্ত্রে যাহাদের জ্ঞান মাত্র স্বকীয় দগ্ধোদরের পূর্ণতা সংসাধন--ভোগ-বিলাসের বিপুল আয়োজন--নরকের অভিনয়ের দৃশ্যপট প্রদর্শন, তাহাদের মনুষ্যত্ব ও অর্থের সার্থকতা সম্পাদিত হইবার উপযোগীতা কোথায় কে বলিতে পারে?

নিরন্ন আমি, জীর্ণ-শীর্ণ কলেবরে তোমার দ্বারদেশে একমুষ্টি অন্নের আশায় উদ্গ্রীব হইয়া সাগ্রহ দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান, আর তুমি আমায়—এই দীনহীন পথের কাঙ্গালকে দেখিয়াও দেখিলে না, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলে না--একটী সামান্য কথা কহিয়াও আমার দারিদ্র্য-নিপীড়িত হৃদয়কে শান্ত না করিয়া সগর্ব্বে সদম্ভে সানুচরে পরিবৃত হইয়া বিলাসিতার ভীষণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য অগ্রসর হইলে! হায়, হায়! এই কি তোমার অর্থের সদ্ব্যবহার? এই কি তোমার মনুষ্যত্ব? এইরূপেই কি ধনীগণ অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে? দীনজন অর্থের বিনিময়ে পুরুষার্থকে পদদলিত করিয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করে না—চাটুবাক্যে তোমার গর্ব্বোন্নত বক্ষকে উচ্চগ্রামে উন্নীত করাইয়া স্বার্থসাধন করাও তাহাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির শক্তি-সামর্থের বহির্ভূত—তাহারা মাত্র তোমার করুণাপ্রার্থী। তাহারা চাহে তোমার শ্রীমুখের দুই চারিটা মিষ্টকথা—সদ্ব্যবহার—মানবোচিত দয়া। আর চাহে যখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয় তখন একমুষ্টি অন্ন—বিপদের সময় অভয় বাণী; ইহার অধিক তাহারা আর কিছু চাহে না—তাহাদের আর প্রার্থনা নাই।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

বিদ্যাসাগর।

মিশ্র মেঘ—ঝাঁপতাল।

জয় মরণজয়ী, তব জয় !
জয়, জয়, জয় !
জ্ঞান-গুণের সাগর, দীনের দুঃখ-নাশন,
অতুল তব কীর্ত্তি, অটুট তব আসন ;
স্মরিছে তোমা কোটি হৃদয় !
দীন মোরা, হীন অতি, পর-পীড়িত জাতি ;
ভাবী ঢাকা তিমিরে, ম্লান অতীত-ভাতি ;—
সহসা দূর পার হ'তে তব আশীষ লাগে,
শিহরি সব প্রাণ নব গরবে জাগে,
ঘোষে তোমার বাণী—অভয় !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

চিত্র।

১

ত্রয়োদশ বৎসর পরে পার্ব্বতী শ্বশুরগৃহ হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই তাহার বিবাহের দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিবাহের পরদিনই সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, এইজন্য তাহার পিতৃগৃহের স্মৃতির সহিত বিবাহ-রাত্রির স্মৃতি এমন ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল যে একটীর কথা মনে করিতে গেলেই আর একটী মনে পড়িয়া যাইত। এইস্থানে দেবদারুর তোরণ হইয়াছিল, এইস্থানে নহবৎ বসিয়াছিল, এই সমস্ত থাম ফুলের মালা দিয়া ঘেরা হইয়াছিল। সেই দীপের মালা, সেই লোকের কোলাহল, সেই শঙ্খের ধ্বনি, সে সমস্ত যেন এখন স্বপ্ন! সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে বিবাহের অন্য সমস্ত চিহ্নই মুছিয়া গিয়াছে, কেবল পাঁচ বৎসরের শিশু অমরেশ এখন শেষ চিহ্ন। বিবাহ-সভায় যখন সে সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, "যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"—সে কথা এখনও কানে বাজিতেছে। তখন কে জানিত যে সেই লক্ষ্মী আবার অলক্ষ্মীর বেশে ত্রয়োদশ বৎসর পরে তাহার শৈশব নিকেতনে ফিরিয়া আসিবে।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহার দুই চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল, মূর্চ্ছিতের মত পার্ব্বতী ধূলায় বসিয়া পড়িল। অমরেশ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পার্ব্বতীর মনে পড়িল কন্যা-বিদায়ের দিন তাহার ভাই নরেনও এমনি ব্যাকুলভাবে "দিদি, দিদি" বলিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়াছিল। নরেনের সেই শৈশবের সুন্দর মুখ ত্রয়োদশ বর্ষ একই ভাবে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, কালে তাহার উজ্জ্বল রেখা বিন্দুমাত্রও মুছিতে পারে নাই।

২

হরশঙ্কর বাবুর বাড়ীর পাশেই তাঁহার ভ্রাতার বাড়ী, প্রাচীরে একটী ছোট দুয়ার কাটান ছিল, তাহাতেই উভয় বাড়ীতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইত। পার্ব্বতী আসিয়াছে শুনিয়া খুড়িমা তাহাকে দেখিতে আসিলেন।

নরেনের স্ত্রী সুহাসিনী আসন পাতিয়া দিয়া দেয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া অপ্রসন্ন ভাবে নথ খুঁটিতে লাগিল।

সুহাসিনীর অপ্রসন্নতার কারণ যথেষ্টই ছিল। যদিও তাহার বয়স কেবল চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার সাংসারিক জ্ঞান ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। পার্ব্বতী ছেলে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ ছেলের ও পার্ব্বতীর জন্য মাসে মাসে কত খরচ পড়িবে সে বিষয়ের একটা মুখে মুখে হিসাব ঠিক করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে আবার রাঁধুনীকে বিদায় করিয়া দিবার কল্পনা তাহার মনে উদয় হওয়ায় কতকটা আশ্বাসেরও সঞ্চার হইয়াছিল। আজ আবার খুড়িমাকে অযাচিত ভাবে আত্মীয়তা করিতে আসিতে দেখিয়া তাহার মনটা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।

খুড়িমা পার্ব্বতীকে কোলের কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "একি আমাদের সেই বুড়ি? তোর একি চেহারা হয়েছে রে!" খুড়িমার চোখের জল পার্ব্বতীর রুক্ষ কেশের উপর আর পার্ব্বতীর চোখের জল খুড়িমার পায়ের উপর পড়িতে লাগিল।

অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া খুড়িমা পার্ব্বতীকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্ব্বতীর পিতা পার্ব্বতীকে রাজার ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন, তবু তাহার জীবনে কি সুখ ছিল? স্বামীর প্রেম?—তাহা সে কখনও পায় নাই। বিলাসে উন্মত্ত স্বামী পত্নীর দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া শ্বশুরালয়ে সম্মান ছিল না, ধনীর পুত্রবধূর দরিদ্র পিতৃগৃহে আসিবার পথও ছিল না। তিনটী সন্তান হারাইয়া কেবল অমরেশ তাহার শেষ সান্ত্বনার উপায়। স্বামী যেদিন সঙ্গী বন্ধুবর্গ লইয়া শিবরাত্রির উৎসব আমোদে কাটাইবার জন্য কাশীতে গিয়াছিলেন, সেদিন পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একবার তাহাকে বলিয়াও যান নাই। সেই তাঁহার শেষ বিদায়। সাঁতার দিতে গিয়া তাঁহার শরীর গঙ্গার স্রোতে যে কোথায় ভাসিয়া গেল তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, এই সংবাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরালয়ে পার্ব্বতীর সকল অধিকার শেষ হইয়া গেল, দরিদ্রের কন্যা ভিখারিণী বেশে সন্তান-ক্রোড়ে দরিদ্র পিতৃগৃহেই ফিরিয়া আসিল, তাহার ত্রয়োদশ বর্ষের এইমাত্র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

খুড়িমা বলিলেন "দিদি যদি এসময় এখানে থাকিতেন তাহা হইলে বড় ভাল হইত। দিদি কাশী গিয়ে অবধি এদিকটা যেন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে, সেই অবধি আমি আর এদিকে আসিতেও পারি না।"

পার্ব্বতী চোখের জল মুছিয়া বলিল "বাবা তো আর দেশে আসিবেন না, মা বাবাকে একলা রেখে কেমন করিয়া আসিবেন।"

"তবে না হয় তুই একবার কাশীতেই যা, তাঁরা কখন আছেন কখন নাই। হয়তো আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না। আমাদের পঞ্চু শিগ্‌গির কাশী যাবে সেই সঙ্গে যেতে চাস্‌তো আমি সব ঠিক করে দিতে পারি।"

৩

বৈঠকখানায় হরশঙ্কর বাবুর একখানি তৈল-চিত্র ছিল। অনেকদিন ধূলি পড়িয়া পড়িয়া সেখানি আর ভাল করিয়া দেখা যাইত না। পার্ব্বতী দ্বিপ্রহরে বাহিরে গিয়া একমনে ছবিখানি পরিষ্কার করিতেছিল।

সুহাসিনী বিরক্ত হইয়া বলিল "নেই কাজ তো খই ভাজ, ঠাকুরঝির হ'য়েছে তাই, যদি ততক্ষণ কাঁথাগুলো সেলাই করেন তো কাজ হয়।"

ছবি পরিষ্কার করিতে করিতে পার্ব্বতীর মন এতই একাগ্র হইয়াছিল যে তাহার সময়ের জ্ঞান ছিল না। হাতের কাপড়খানি চোখের জলে ভিজিয়া যাইতেছিল।

নরেন আপিষ হইতে সাহেবের বকুনি খাইয়া আসিয়াছিল, তাহার মেজাজটা সপ্তমে চড়িয়াছিল। আসিয়াই প্রথমে পার্ব্বতীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল,—রুক্ষস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "দিদি, বাইরে এসে কি হচ্ছে?"

দিদি নরেনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তখনও তাহার চোখে জল ছিল। "নরু!" বলিয়া ডাকিতে গিয়া মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল "বাবার ছবিখানি বড় অপরিষ্কার হ'য়েছিল তাই পরিষ্কার কর্‌ছিলাম।"

সুহাসিনী দুয়ারের পাশে আসিয়া বলিল, "আজ বুঝি খাবার তৈরী হয়নি?"

পার্ব্বতী খাবার করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, ভ্রাতার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। "এই আমি যাচ্ছি" বলিয়া পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আর কাজ নাই, থাক্।" বলিয়া ক্রুদ্ধ নরেন ছবিখানি পাশে সরাইয়া রাখিতে গেল, কিন্তু তাহার অস্থির হস্তচালনায় ছবিখানির উপর কপাটের ধাক্কা লাগিয়া ছবির একপাশের ফ্রেম ভাঙ্গিয়া গেল।

এমন সময় নীচের দরজায় হাঁক পড়িল "বাবু, তার আয়া।"

নরেন ব্যস্ত হইয়া নীচে গেল। পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "দিদি, কাশীতে বাবার বড় অসুখ, টেলিগ্রাম এসেছে।" বলিয়াই ভগ্ন তৈল-চিত্রের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

পার্ব্বতী ব্যস্ত হইয়া নরেনের হাত ধরিল, বলিল "নরেন, অত অস্থির হ'য়ো না, আগে হাতে মুখে জল দাও।"

৪

কাশীতে কে যাইবে ইহা লইয়া দুই ভাই বোনে অনেক পরামর্শ হইল। নরেনের ছুটী পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর সুহাসিনী সন্তান-সম্ভাবিতা, তাহাকেই বা কোথায় রাখিয়া যাওয়া যায়। এক খুড়ামহাশয়ের বাটী নিকটে আছে, কিন্তু সুহাসিনী সেখানে থাকিতে কোন মতেই রাজী নহে।

অবশেষে পার্ব্বতী বলিল "তবে তুমি থাক। আমি পঞ্চুর সঙ্গে রাত্রের মেলে চলিয়া যাই। তারপর তুমি যাহাতে ছুটী পাও সে চেষ্টা করিও।

নরেন বলিল "অমরকে তো সঙ্গে নিয়া যাইবে?"

পার্ব্বতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল "কাশীতে? না না, কাশীতে আমি অমরকে নিয়ে যেতে পারব না।"

অমর সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া গিয়াছিল, পার্ব্বতী ঘুমন্ত অমরের মুখচুম্বন করিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় পার্ব্বতী সুহাসিনীর দু'টী হাত ধরিয়া বলিল "রাণি, অমরকে একটু ভাল করিয়া দেখিস্ দিদি!"

অমর সকালে উঠিয়া মাকে দেখিতে না পাইয়া ঘরের চারিদিক খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও মায়ের কোন সন্ধান না পাইয়া বাহিরের দুয়ারের পাশে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বড় বড় চোখ দু'টী ক্রমেই লাল হইয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। সুহাসিনী জ্বালাতন হইয়া উঠিল, বলিল "ভাল এক বিপদে পড়েছি যা হোক্।"

নরেন সকালে প্রাইভেট টিউসনে বাহির হইয়াছিল। অমরেশকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল "কি হয়েছে অমর!"

অমর "মা কই!" বলিয়া উচ্চৈস্বঃরে কাঁদিয়া উঠিল।

নরেন আদর করিয়া বলিল "মা আস্‌বে এখন, আয় আমার সঙ্গে— রাণি, অমরকে কিছু খাবার দাও তো!"

সুহাসিনী খাবার লইয়া আসিল, বলিল "নিজে কিছু মুখে দেবে, না ভাগ্নেকে আদর করিয়াই পেট ভরিবে।"

এই রকম করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল, ইহার মধ্যে খবর পাওয়া গেল হরশঙ্কর বাবু কিছু ভাল আছেন।

৫

পার্ব্বতীর অন্য কোন দিকে মন ছিল না, ধ্যানমগ্না পার্ব্বতীর ন্যায় পার্ব্বতী একমনে পিতৃসেবায় মগ্ন ছিল। ক্রমে হরশঙ্কর বাবু একটু ভাল হইলে পার্ব্বতী বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে গেল।

মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া পার্ব্বতী গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া একমনে গঙ্গার স্রোতের দিকে চাহিয়াছিল। এই স্রোতে তাহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ভাসিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতী ভাবিতেছিল "আমি যদি এই স্রোতে ভাসিয়া যাইতাম!" নিকটেই একটা চিতার আয়োজন হইতেছিল, পার্ব্বতী ভাবিল "আমার চিতা যদি এইখানে জ্বলিত!"

গঙ্গাস্নান করিয়া যাহারা ঘরে ফিরিতেছিল, যাহারা স্নানে আসিতেছিল সকলেই বিস্মিত হইয়া পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিতেছিল, পার্ব্বতী তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টি কেবল গঙ্গার বারিরাশিতে নিবদ্ধ ছিল। কেবল তাহার মনে হইতেছিল, এখানে তাহার যে অমূল্য মাণিক হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিলে হয়ত তাহা পাওয়া যাইবে।

এমন সময় একটী বালকের ক্রন্দনে তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, একজন রমণী গঙ্গাস্নানে নামিয়াছেন, তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার আঁচল ধরিয়া চলিয়াছে হঠাৎ কাদায় পা পিছ্‌লাইয়া ছেলে পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

পার্ব্বতীর অমরের কথা মনে পড়িল, অমর যে মা ছাড়া একমুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। পার্ব্বতী আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিল "এখনও আমার মরিবার সময় হয় নাই।"

পূজা শেষ করিয়া ঘরে আসিতেই অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার স্বভাব-প্রসন্ন মুখখানিতে কালিমার সঞ্চার হইয়াছে।

পার্ব্বতী ভীতা হইয়া বলিল "কি হয়েছে মা?"

"বুড়ি, তোর দেরী দেখে উনি ভারি ব্যস্ত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন তুই বুঝি গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছিস্।"

"তাই তুমি এত ভয় পেয়েছ মা?"

"না, মা,. তা নয়, ক'ল্‌কাতা থেকে তার এসেছে, অমরের কলেরা হ'য়েছে।"

শুনিবা মাত্র পার্ব্বতী সেইখানেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

৬

হরশঙ্কর বাবুর বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া পার্ব্বতীর গাড়ী লাগিল। পার্ব্বতী নামিয়াই উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া উপরে গেল। নরেন পঙ্কুর সহিত বৈঠকখানায় দাঁড়াইয়াছিল—পার্ব্বতী তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল "অমর, আমার অমর কোথায়?"

নরেনের দিদির মুখের দিকে চাহিবার সাহস হইল না। অবনত নেত্রে ভূমিতলের দিকে চাহিয়া রহিল।

পার্ব্বতী বলিল "অমর কি নাই?" এই শব্দ কয়টী যে স্বরে পার্ব্বতীর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিয়া নরেন ও পঙ্কু শিহরিয়া উঠিল।

নরেন রুদ্ধস্বরে বলিল "অমর হাঁসপাতালে।"

"বাঁচিয়া আছে?"

"আছে।"

পার্ব্বতী আপনার অসংযত বস্ত্র সংযত করিয়া লইল। দেয়ালের দিকে আঙ্গুল হেলাইয়া বলিল, "নরেন, দেয়ালের দিকে চাহিয়া দেখ, এ কাহার ছবি? যাঁর ছবি, তুমি তাঁর সন্তান। মুমূর্ষু রোগী পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তিনি কুড়াইয়া কোলে করিয়া গৃহে আনিতেন। আর তুমি—আমি তোমার নিকট আমার সর্ব্বস্ব ধন অর্পণ করিয়া গিয়াছিলাম, তুমি সেই অসহায় রুগ্ন মুমূর্ষু শিশুকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছ। তাই বুঝি ও ছবি যেন দেখিতে না হয় বলিয়া ধুলায় ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে। আমি চলিলাম। পঙ্কু তুমি হাঁসপাতালের রাস্তা চেন?"

পঙ্কু বলিল "দিদি তোমার ভাবনা নাই, আমার এক বন্ধু সেখানে কাজ করেন; আমি তোমাকে অমরের কাছে নিয়া যাইতে পারিব।"

৭

নরেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল, ঘরে আসিয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল। সেদিন রবিবার, আফিস ছিল না। কতবার ইচ্ছা হইতেছিল যে অমর কেমন আছে একবার দেখিয়া আসে, কিন্তু লজ্জার গুরুভার পর্ব্বতের মত তাহার মাথায় চাপিয়াছিল, সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। কি

বলিয়া সে অমরকে হাঁসপাতালে দিয়া আসিল। তখন এ বিষয়ে কত অনুকূল যুক্তিই তাহার মাথায় আসিয়াছিল, এখন তাহার একটী যুক্তিও সে মনে করিতে পারিল না। কেবল আত্মগ্লানি আসিয়া বারবার তাহাকে কষাঘাত করিতে লাগিল।

সুহাসিনী যখন তাহাকে আহার করিবার জন্য ডাকিতে আসিল তখন আর তাহার সুহাসিনীর মুখের দিকেও চাহিতে ইচ্ছা হইল না। সুহাসিনীর পরামর্শেই সে এই অতি গর্হিত কাজ করিয়াছে; কিন্তু সুহাসিনীর দোষ কি? তাহার নিজের মন কেমন করিয়া এ কাজে সায় দিল।

সমস্ত দিন অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় ছট্‌ফট্ করিয়া সন্ধ্যার সময় নরেন আর শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিল না। শয্যা-কণ্টকী রোগীর ন্যায় শয্যা-ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায় আসিল। আসিয়াই দেখিল সুহাসিনী ভূমিতলে পড়িয়া আছে, তাহার দিকে চাহিয়া সে যে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহা আর নরেনের বুঝিতে বাঁকি রহিল না।

নরেন ব্যস্ত হইয়া বলিল "রাণি, অসুখ করেছে আমাকে কেন বল নাই?"

ভগ্নস্বরে সুহাসিনী বলিল "ব'লে কি হবে? তুমি বিছানায় শু'য়ে আরাম কর গিয়া।"

মরিতে বসিয়াও রমণী অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না।

নরেন আর বিলম্ব না করিয়া ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইল।

৮

ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিয়াই নরেন দেখিল তাহার ঘর লোকে পরিপূর্ণ। তাহার খুড়িমা, ভজু, পঞ্চু প্রভৃতি খুড়া মহাশয়ের বাটীর সকলেই প্রায় উপস্থিত। সুহাসিনী শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, পার্ব্বতী তাহার মাথার কাছে বসিয়া।

নরেন দিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখ প্রশান্ত, কোন বিকারের চিহ্নমাত্রও তথায় নাই। হস্ত-সঙ্কেতে নরেনকে নিকটে ডাকিয়া পার্ব্বতী বলিল "অমর ভাল আছে।"

সমস্ত রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। সুহাসিনী বিকারের ঘোরে "মা, মা" করিয়া যখনই ছটফট করিতেছে তখনই পার্ব্বতী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এদিকে দ্রুত ও নিপুণ হস্তে ডাক্তারের সমস্ত আদেশ সুশৃঙ্খলায় পালন

করিতেছে, যখন যাহা প্রয়োজন তাহাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইতেছে না। সেই অমৃতময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মৃত্যুও যেন সুহাসিনীর শয্যার নিকট আসিতে সাহস করিল না।

প্রভাতে সুহাসিনী একটু ভাল বোধ করিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "এখন তবু আশা হইতেছে।"

পার্ব্বতী তখন কোথায়? নরেন পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, পার্ব্বতী ভূপতিতা। দারুণ রোগের আক্রমণে সংজ্ঞাশূন্যা। "দিদি" বলিয়া নরেন তাহার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। "নরু, ভাই!" বলিয়া পার্ব্বতী তাহাকে কোলে লইবার জন্য দুর্ব্বল হস্ত বাড়াইয়া দিল।

ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে ভাইবোনে ছাড়াছাড়ি হইবার সময় এমনি স্নেহে দিদি ভাইকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী ত্রয়োদশ বর্ষ কোথায় মিলাইয়া গেল।

নরেন কাঁদিয়া বলিল "দিদি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। দিদি, তোমাকে বাঁচিতে হবে।"

দিদি ক্ষীণহাস্যের সঙ্গে বলিল "তোর মুখে আবার সেই 'দিদি' ডাক শুনে আমি জীবন পেয়েছি। ছবির কথা মনে আছে? বাবার ছবি ভাল করে বাধিয়ে সম্মুখে রাখ্‌বি। বাবার ছবি দেখে মনে কর্‌বি বাবার মত হ'তে হবে। তার পাশে একখানি মায়ের ছবি, রাণী যেন মায়ের মত অন্নপূর্ণা ——"

দিদির মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, মূর্চ্ছা আসিয়া তাহার সংজ্ঞা হরণ করিয়া লইল।

উদ্ভিদের দুষ্টামি।

আমার মনে হয় যে উদ্ভিদের চরিত্র ভাল নয়। তবে সম্পাদক মহাশয়ের ভয়ে মুখ ফুটিয়া বলি না। আজি একটা আরোহীলতার * ব্যবহার দেখে মন বড় চটে গেছে; তাই নিশ্চয় দু'কথা শুনাইয়া দিব।

নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, জঙ্গলটী অন্ধকার।

* Climbing plant.

জঙ্গলে একটী লতা ছিল। ঐ লতাটী উপরেও উঠিতে পারিত না, আলোও পাইত না। উহার উদ্ভিদ-জন্ম ঐখানেই শেষ হইত। একটা মোটা আমগাছ ছিল; তার পায়ে-হাতে ধরে কান্নাকাটী করায় সে ভালমানুষ ওকে আশ্রয় দিল। তখন তা'র উপর দিয়া জড়িয়ে উঠে, একবারে মাথায় চড়ে বসিল। এতক্ষণ বেশ নিরীহ ভদ্রলোকের মত ছিল। যেই মাথার উপর চড়েছে, অমনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে কোথা থেকে কতকগুলো পাতা বাহির করে, নিজে সমস্ত আলোটাকে দখল করে বসেছে; সমস্ত হওয়াটাকে নিজেই নিয়েছে। গরীব আমগাছটাকে একটুও রৌদ্র দিতেছে না।

সে বেচারী রৌদ্র না পাইয়া মরার মত হইয়াছে। কি ভয়ানক বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং কৃতঘ্নতা। ইহাদের দলের আর একজন (লতা) আর একটী গাছকে মারিয়া ফেলিবার জো করিয়াছে। যতক্ষণ ইহারা নীচে থাকে ততক্ষণ যেন শুধু একটী ক্ষীণ, দুর্ব্বল, নিরাশ্রয় লতাই। তা'রপর যেই আশ্রয়দাতার মাথার উপর উঠে, অমনি ছোট ছোট ডাল, গাঁইট এবং পাতাগুলি বাহিরে করে, আশ্রয়টার রৌদ্র আলো একবারে নিজেই সব লয়; সেটাকে দুষ্টামি করে ঠকাইয়া অবশেষে মারিয়া ফেলে*। এমন দুশ্চরিত্র! এই ত গেল লতার কথা। এখন একটী সর্ব্বজন প্রশংসিত বটগাছের কথা শুনিবেন! ইনি নিকটস্থ আশ্রয়-দাতা একটী দেবদারু বৃক্ষের চারিদিকে এমনই জড়াইয়া ধরিয়াছেন,—তাহাকে নাগ-পাশে এমনই দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন, যে দেবদারুটী এখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত; আর তাহার খরচায় বট মহাশয় বিলক্ষণ পরিপুষ্ট। এমন কত গাছ দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকের গোড়া দুর্ব্বল; তাহার গোড়াতে উপরের ভার বহন করিতে সমর্থ হয় না। তাই তাহারা আস্তে আস্তে অপর বৃক্ষের নিকট গিয়া কতই ভালবাসা জানায়; বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন করে। শঠতাপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অবশেষে আশ্রয়-বৃক্ষের স্কন্ধে উঠিয়া দাঁড়ায়। তখন আশ্রয়ের রসভাগ এমন করিয়া টানিয়া লইতে আরম্ভ করে যে, অবিলম্বেই তাহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হয়। ইহাদিগের নৃশংসতা কি ভীষণ।†

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গাছগুলিকে নিতান্ত অসচ্চরিত্র মনে হয়। ইহাদিগের বুদ্ধি নাই, কে বলে? অন্য বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক দুষ্ট বুদ্ধি

---

* Taylor's sagacity and morality of plants p. 47—8.

† Taylor's sagacity and morality of plants. p. 229—30.

নিশ্চয়ই আছে। ইহারা যে কৌশলে পতঙ্গগুলিকে ভুলাইয়া নিজের বংশ-বিস্তারের কার্য্যটী সমাধা করিয়া লয়, তাহা নিতান্ত শঠেরও অকর্ত্তব্য। তা'র-পর অনেক সময় এমন চতুরতার সহিত নিজের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া আত্ম-রক্ষা করে (Protective coloration) যে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমি বলি, ইহারা যেমন দুষ্ট তেমনি চতুর।

শ্রীশশধর রায়।

কাঙ্গালিনী মা।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কে তোরে সাজালে মাগো কাঙ্গালিনী।
সোণার দেউল ছেড়ে কেন শ্মশানবাসিনী ?
কোথায় মা তোর সোণার আসন,
ছত্রদণ্ড মাণিকভূষণ ?
ছল ছল কমল নয়ন—বিষাদিনী!
ডাকাত এসে ডঙ্কা মেরে,
সর্ব্বস্ব তোর নিচ্ছে কেড়ে,
অন্নদা তুই—অন্নহীনা ভিখারিণী।
একি মা নিয়তির খেলা,
কোলের ছেলে করে হেলা,
ভুলেও তোরে 'মা' বলে না জীবনদায়িনি!
(তারা) পরের মায়ায় ভুলে আছে,
পরের পায়ে প্রসাদ যাচে
শূন্য ঘরে অন্নহারা দিবসযামিনী।
বারেক যদি দেখ্‌ত চেয়ে
কত দয়ায়, কত স্নেহে
ভারে ভারে বিলাও অন্ন স্নেহশালিনি,
তোমার চরণ-রেণু মেখে,
তোমার নামটী বুকে এঁকে
সিংহ সম উঠত জেগে কাঁপত মেদিনী!

তুচ্ছ করে জীবনমরণ
হৃদয়-রক্তে পূজ্‌ত চরণ
সকল দুঃখ করতে হরণ দুঃখহারিণি !
শ্মশান তোমার হ'ত স্বর্গ
ফল্‌ত সুফল চতুর্ব্বর্গ
লক্ষ্মীরূপে দিতে দেখা—লক্ষ্মীরূপিণি !
(ওমা ভুবনপালিনি !)

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটী পদ।

বাঙ্গালা-সাহিত্যজগতে বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চে। জ্ঞানদাসের মধুস্যন্দিনী পদাবলী অনেকে অনেকবার সংগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল সংগ্রহ-পুস্তকের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নহে। তথাপি বোধ হয় বাঙ্গালার অন্যান্য কবিকুলের ন্যায় জ্ঞানদাসের পদগুলিও কোন সংগ্রহকারই এ পর্য্যন্ত সমগ্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। নিম্নোদ্ধৃত পদটী ঐ অপ্রকাশিত পদনিচয়ের অন্যতম। কারণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত কোন সংগ্রহ-পুস্তকে পদটী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মাধবের মধুর লীলা-কীর্ত্তনানুরক্ত জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে পদটী সংগৃহীত।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। ঐ সকল পদাবলীর একটী মাত্র পদেরও বিলোপ হইলে বাঙ্গালীর তথা বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি। সুতরাং বিস্মৃতির অন্ধকারময় কক্ষ হইতে উদ্ধৃত করিয়া সাহিত্যের সিংহাসনে ইহাদের স্থায়ী আসন নির্দ্দেশ করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য ; এবং তজ্জন্যই রসভাব প্রভৃতির বিচারভার পাঠকসাধারণের উপর অর্পণ করিয়া পদটী যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম—

আমি সুজন দেখিয়া পিরীতি করিনু
কুজন করিল কে।
যেমত জ্বলিছে রাধার অন্তর
তেমতি জ্বলুক সে॥

সই সে কেন এমন হৈল।
কঠিন গাধিনী তনয়া কি গুণে
তারে উদাসীন কৈল॥
আমি কামসাগরে কামনা করিয়া
পূরাব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দনন্দন
বঁধুরে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশীটী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
বাঁশীটী শুনিয়া উতলা হইবে
সহজে কুলের বালা।
জ্ঞানদাস বলে তবে সে বুঝিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা॥

শ্রীজগদীশ্বর রায়।

ঝড়।

(টনি-রেভিয়েঁার ফরাশী হইতে।)

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী খাড়ী-সমুদ্রের উপকূলে একবার খুব ঝড় হয়। সেই ঝড়ের সময়, একটী গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল তাহা অতীব মর্ম্মস্পর্শী।

ঘটনাস্থানটী নর্ম্মাণ্ডি-প্রদেশের একটী ছোট বন্দর-গ্রাম; তাহার নামোল্লেখ অনাবশ্যক।

শ্রীমতী বোদোয়ঁ্যা একজন ধনাঢ্য ভূম্যাধিকারিণী। তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে সম্পত্তি দিয়া যান, তাহা তাঁহার পতি মদ্যপানে উড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে মৃত্যু আসিয়া ঠিক সময়ে বাধা দিল। বিধবা বোদোয়ঁ্যা, বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী, একটী মনোমত পাত্রীর সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া, নিজ বংশের আরো শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এইরূপ মৎলব করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পুত্র, একজন

ধীবর—যাহার একটা নৌকা পর্য্যন্ত ছিল না—তাহারই কন্যার প্রেমে আসক্ত হইয়া পড়িল, তাহাকেই বিবাহ করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইল। বিধবা এই বিবাহে সম্মতি দিলেন না; কিন্তু পুত্র অটল; বিধবাও আপনার জেদ ছাড়িলেন না। এক বৎসর ধরিয়া এইরূপ যুঝাযুঝি চলিতে লাগিল। অবশেষে, জননী পুত্রকে বলিলেন:—

—"ইচ্ছা হয় ত তুই ওকে বিবাহ কর্, কিন্তু আমি তোর স্ত্রীর মুখদর্শন কর্‌ব না; আর, আমি বেঁচে থাক্‌তে, তুই আমার কাছ থেকে একটী কাণা কড়িও পাবি নে।"

পুত্র 'লুই' বলিল:—"তোমার যা মর্জ্জি"। ধীবর-দুহিতার সহিত তার বিবাহ হইয়া গেল।

পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তিনটী শিশু যথাক্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। লুই নিজ শ্বশুরের সহিত মাছ ধরিবার জন্য বহিঃসমুদ্রে চলিয়া গেল। লুইয়ের স্ত্রী, শিশুসন্তানদিগকে পালন করিতে লাগিল। বিষম অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইল। সংসার চালানো কঠিন হইয়া উঠিল; কিন্তু ভালবাসার খাতিরে সাধ্বী স্ত্রী সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। মুখে একটী কথা নাই। শ্রীমতী বোদোয়্যাঁর নিকটেও সে কোনদিন কিছু চাহে নাই। কেবল প্রতি রবিবারে যখন শাশুড়ী ঠাকুরণ ভজনালয় হইতে বাহির হইতেন, সেই সময়ে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে অভিবাদন করিত; কেন না, গুরুজনকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু তিনি কোনপ্রকার প্রত্যাভিবাদন না করিয়া, পায়ে যেন একটা সর্প দংশন করিয়াছে এই ভাবে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া যাইতেন। উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ নাই, পত্র ব্যবহার নাই, কোন প্রকার সংস্রব নাই। সংস্রবের মধ্যে এক পক্ষ হইতে অভিবাদন এই মাত্র।

গত মঙ্গলবারে একটা ভয়ানক ঝড় উঠিল! সমুদ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। উপকূলস্থ সমস্ত ঘর বাড়ী কাঁপিতে লাগিল। সেই সময়ে শ্রীমতী বোদোয়্যাঁর সহিত তাঁহার স্থূলকায়া দাসী অ্যানেট্ ভিন্ন আর কেহই ছিল না।

অ্যানেট্ দুই হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করিয়া বলিল:—

—"উঃ! আজ কি দুর্য্যোগ! আজ না জানি কত লোকেরই ভয়-ভাবনা হ'চ্চে।"

শ্রীমতীর একটা ধরণ আছে,—তিনি সব কথাই একটু ছুঁইয়া যান,

কোন কথা লইয়া অধিকক্ষণ নাড়াচাড়া করেন না। এই অভ্যাস-বশে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"কাদের ভয়-ভাবনা ?"

"এই যারা এখন সমুদ্রের উপর আছে তাদেরই আত্মীয়স্বজনের ভাবনা, আবার কাদের ?"

বোদোয়ঁ্যা ঠাকুরুণ আর কোন কথা না বলিয়া, রুক্ষভাবে শুধু বলিলেন,

"যাক্ যাক্, ওকথা যাক্ !"

এই বলিয়া একটা শেলাইয়ের কাজ হাতে লইলেন ; এবং যখন আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইল, দিনের আলো কমিয়া আসিল, তিনি জান্‌লার কাছে আসিয়া বসিলেন।

অ্যানেট্ দাঁড়াইয়া, জান্‌লার শাশিতে মুখ লাগাইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল। ঠাকুরাণী তাহাকে থামাইয়া দেওয়ায়, সে এখন বড় একটা কথা কহিতেছে না ; তবে, একেবারে চুপ করিয়াও থাকিতে পারিতেছে না ; মধ্যে মধ্যে এক একটা কথা বলিয়া উঠিতেছে ;

"ঐ দেখ ঠাকুরণ, ও বাড়ীর চিম্‌নিটা পড়ে গেল। ঐ নৌকাখানা কি ভয়ানক নাচ্‌চে ! ঐ দেখ, আর একটা নৌকা ডাঙ্গায় আছাড় খাচ্চে ! ওখানে কত কি হ'চ্চে, দেখতে ভারি মজা !"

"আঃ ! এত বক্‌তেও পারে।" এই কথা বিধবা গুন গুন স্বরে বলিলেন। অ্যানেট্ আর কথা কহিবে না, স্থির করিল ; কিন্তু শাশির গায়ে আরো নাক্‌টা বেশী করিয়া চাপিতে লাগিল। পরে, ভূমির উপর পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "না, এমন দুর্য্যোগ আমি বাপের জন্মে দেখি নি।"

শ্রীমতী বোদোয়ঁ্যা শেলাইয়ের কাজটা গুটাইয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে আবার বেড়াইতে লাগিলেন।

শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে লোকের চীৎকার, লোহা-লক্কড়ের ঝঞ্চনা,—শুনা যাইতেছে। জান্‌লা হইতে খড়খড়িগুলা খুলিয়া আসিয়া, খটাখট্-শব্দে দেয়ালের গায়ে আঘাত করিতেছে।

সমুদ্র না জানি এই সময়ে কি ভীষণ মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে ! বিধবা রমণী একেবারে সিধা তাঁহার দাসীর নিকট আসিলেন।

"ভাল ! তোর যদি খবর জান্‌বার এতই ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, কাঠের জুতো পর্ ; কাঠের জুতো পরে' অন্তদের মত চারিদিক্‌কার খবরাখবর জেনে আয়।"

এক মিনিটের মধ্যেই অ্যানেট্ যাইবার জন্য প্রস্তত হইল। দরজা পার হইয়া যাইবে এমন সময় শ্রীমতী বলিলেন,

"খবরাখবর জেনে শীঘ্র এসে আমাকে বল্‌বি!"

বৃদ্ধা আবার ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বাহুদ্বয় বক্ষের উপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন করিয়া, ওষ্ঠে ওষ্ঠে চাপিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছেন, আর সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। এইরূপে দশ মিনিট অতিবাহিত হইল।

"কৈ! অ্যানেট যে এখনো ফিরিল না।"

ঝড়ের বেগ দ্বিগুণ বাড়িল। আর কিছুই শুনা যায় না।

সহসা শ্রীমতীর দৃষ্টি এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া পড়িল। শয়ন-কক্ষের কোণের দিকে একটী শিশুর ক্ষুদ্র শয্যার উপর দৃষ্টি নিপতিত হইল।

এই সব গৃহস্থের গৃহে, যেখানকার যে জিনিসটী, সেইখানেই বরাবর একইভাবে থাকে।

এই শিশু-শয্যাটী তাঁহার পুত্রের; -সেই পুত্র,যে এখন সমুদ্রে ভাসিতেছে।

শ্রীমতী এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া সেই পুত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। যে এখন ধীবর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; তিনি বিবাহ করিতে নিষেধ করায়, যে বলিয়াছিল, "তোমার যা মর্জ্জি" এবং নিষেধ সত্ত্বেও যে বিবাহ করিয়াছে, সেই ২৫ বৎসরের পুর্ণবয়স্ক লুইই এত দিন তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত ছিল; কিন্তু এখন তাঁহার শিশু লুইকে যেন আবার তিনি দেখিতে পাইলেন; সেই তার রেশমি কেশগুচ্ছ, সেই তার টোল খাওয়া গাল দু'টী, সেই তার নীল চক্ষু। তাহার প্রথম কান্না, প্রথম হাস্যোচ্ছ্বাস তাঁহার মনে পড়িল; তিনি যে দুই হাতে তার গাল দু'টী ধরিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতেন, সে কথা তাঁর মনে পড়িল; তিনি যে তাহার পাশে বসিয়া তাহার সম্বন্ধে কত কি মৎলব আঁটিতেন, তাহাও তাঁর মনে পড়িল।

ঠাক্‌রণ! তুমি যে ধনী, তুমি যে একগুঁয়ে, তুমি যে পাষাণে গঠিত; এই বায়ুর গর্জ্জনে, আজ এই সব জিনিসে তোমার মন বিচলিত হইল কেন বল দেখি?

"অ্যানেট্ এখনো ফিরিল না!"—এই বলিয়া বিধবার শোকাবগুণ্ঠন বস্ত্রটী খুলিয়া তিনিও গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

যেমন তিনি রাস্তার মোড় লইবেন, এক দল লোক সেইখানে দাঁড়াইয়া

থাকায়, তাঁহার পথ রোধ হইল। এই দলটী দুই তিন জন ধীবরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ধীবরদের পরিধেয় বস্ত্রাদি জলে পরিপ্লুত। তাহাদের পায়ে কাদা-মাখা বড় বড় জুতা; তাহাদের হাত ও মুখ, রক্তে রক্তময়। শ্রীমতী এইখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"তারা কি ফিরে এসেছে?"

উহাদের মধ্যে একজন চ'খের ইসারায় অন্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর করিল;——"হঁ।।"

তিনি আবার রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ঐ দলের একজন, দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেল।

"ঠাকৃরণ! ঠাকৃরণ! আপনি যাচ্চেন কোথায়?"

"ঐ হোথা।" এই বলিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সমুদ্র দেখাইয়া দিলেন।

ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে আটকাইল।

"ওখানে গিয়ে কি হবে? দেখছেন ত আজ কি দুর্য্যোগ, বাড়ী ফিরে যান। আমরা ত সবাই ফিরে এসেছি।"

নেত্র বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন;—

"সবাই?"

"সবাই না ত কি।"

"আমার গা ছুঁয়ে বল দিকি।"

সমুদ্র-নাবিক মুস্কিলে পড়িল।

"ঠাকৃরণ! দু'জন এখনো ফেরেনি; হয় 'ইপোর্টে', নয় 'ফেকাঁয়' নেবেছে।"

তিনি তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার পথ চলিতে উদ্যত হইলেন। নাবিক আবার তাঁহাকে আটকাইল। এই সময়ে, অ্যানেট আসিয়া পড়িল তার মুখে 'আকুলি ব্যাকুলি' ভাব। মনিবকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল;—

"না! না! ঠাকৃরণ, ওদিকে যেও না।"

বৃদ্ধার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল! তাঁহার শুষ্ক মুখ নীল হইয়া গেল। চোখ বুঁঝিয়া আসিল। পতনের আশঙ্কায় তিনি তাঁহার দাসীর স্কন্ধের উপর ভর দিয়া রহিলেন।

——"আমারি দোষ! আমারি দোষ!"—এইরূপ তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন। দাঁতে দাঁত লাগিতে লাগিল। কোন একটা নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে আশ্রয় লইবার কথা বলায়, তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন।

——"অ্যানেট্, আমি তাদের দেখ্‌তে চাই ?"

তাঁহার এই অবস্থায় সেখানে যাওয়া অসম্ভব; কিন্তু সহসা যেন তাঁহার শরীরে নূতন বল আসিল। যেখানে লুই বাস করিত, সেই দিক্‌কার রাস্তা ধরিয়া দুইজনে চলিতে লাগিলেন।

সেইখানে পৌঁছিয়া অ্যানেট দরজা ঠেলিল; শ্রীমতী প্রবেশ করিলেন।

ধীবরদের গৃহ সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে—গৃহের ভিতরটা ঠিক সেইরূপ! নীল রঙ্গের মশারীতে ঘেরা একটা বড় খাট্। তারই পাদদেশে দু'টী ছোট ছোট শয্যা;—মাঝে শিশুর দোলনা। সমুদ্র-নাবিকদিগের এই জিনিসগুলি অতি সামান্য হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একটী সদ্য-প্রসূতা যুবতী রমণী তাঁহার শয্যার উপর অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন। নব কুমারটী তাঁহার কোলে; আর দু'টী শীর্ণ অস্থিসার শিশু একটা চাম্‌ড়ার ঝোলার মধ্যে ঝুলিতেছে। রমণীর মুখের পাণ্ডুতা, ভাবনা-চিন্তায় আরো যেন বাড়িয়াছে। নিজে ঘরের বাহির হইতে না পারায়, সংবাদ আনিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে বাহিরে পাঠাইয়াছেন। এখন তিনি তাহাদিগকেই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতিকষ্টে নিঃশ্বাস পড়িতেছে। অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। শাশুড়ীঠাক্‌রণকে দেখিয়া তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন, এবং গুণ গুণ স্বরে বলিলেন;—

——"ঠাক্‌রণ!"

বৃদ্ধা একেবারে সোজা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন;

——"বাছা আমার!"

তাহার পর দু'টী শিশুকে তিনি কোলে লইলেন; কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদিগকে চুম্বন করিতে লাগিলেন।

এইবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

——"আহা বেচারা শিশু দু'টী! * * * অ্যানেট তুই কি * * * জানিস নে? * * * কি আশ্চর্য্য!"

স্থূলকায়া অ্যানেটও কাঁদিতে লাগিল।

সহসা রাস্তায় কাহার যেন কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল;—উহা আনন্দের কণ্ঠধ্বনি।

আবার দরজা খুলিল; আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পূর্ণবয়স্ক লুই দ্বারদেশে আসিয়া খাড়া হইল।

—"ঐ এসেছে, ঐ এসেছে!"

মুহূর্ত্তের মধ্যেই সকলেই আসিয়া জুটিল। যুবতী রমণী তাহার স্বামীর নিকট একেবারে ঝাঁপাইয়া আসিল। বাপের কাছে শিশু দু'টীও আসিল।

কেবল বৃদ্ধা যেখানে ছিলেন সেইখানেই প্রতিমার ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন।

ধীবর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, মাথার টুপিটা মাথা হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল এবং গদগদস্বরে বলিল;—"মা!"

বৃদ্ধা জননী বাষ্পাকুল লোচনে বাহু বাড়াইয়া দিলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদকের প্রতি।

১

সাধ ক'রে কি চুপ ক'রেছি,
ওগো সম্পাদক!
মুখের কথা বল্‌লে খুলে,
কি জানি কে দেবে শূলে,
দেখনি কি পয়লা ব'শেখ
পুলিশগুলার রোখ!
বরিশালের কাণ্ড দেখে,
লেখা চাচ্ছ চিঠি লিখে,
কেন ভায়া, পেয়েছ কি
এতই আহাম্মক!

২

সাধ ক'রে কি চুপ ক'রেছি,
ওগো সম্পাদক!
তুমি আছ নগর মাঝে,
মন দিয়েছ দেশের কাজে,
মাঝে মাঝে জাগ্‌য়ে তোল
বরিশালের শোক;

হেথা হোথা মিটিং ক'রে,
কাঁপালে দেশ গলার জোরে ;
পুলিশ দেখে পলায় তোমার
"সন্ধ্যা"—উপাসক।

৩

সাধ ক'রে কি চুপ ক'রেছি
ওগো সম্পাদক !
হাহাকারে ভর্‌ল দেশ,
আকাশে নাই মেঘের লেশ,
শুষ্ক পুকুর—বেস হ'য়েছে
ম'রেছে সব জোঁক ;
সাত টাকা মণ উঠেছে চা'ল,
ভাব্‌ছি ব'সে খা'ব কি কা'ল,
এতে কি আর থাকে প্রাণে,
লেখাপড়ার ঝোঁক ?

৪

সাধ ক'রে কি চুপ ক'রেছি,
ওগো সম্পাদক !
ঘরে ঘরে দলাদলি,
কটুকথা বলাবলি,
কাণ্ড দেখে হাস্‌ছে ব'সে
শত্রুপক্ষ লোক ;
শিখ্‌লেনা কেউ এত ঠেকে,
বুঝ্‌লেনা কেউ এত দেখে,
বিষবড়ীতেও কাট্‌ল না এ
ঘোর বিকারের ঝোঁক ?
সাধ ক'রে কি চুপ ক'রেছি,
ওগো সম্পাদক !

শ্রীচমৎকার শর্ম্মা।
সাং—মফঃস্বল।

বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মপ্রচারকগণ।

(২)

উপরে যে অনুশাসন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, মহারাজা অশোকের সময়ে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ পশ্চিম এসিয়ার সীরিয়া, আফ্রিকার মীসর এবং ইউরোপ খণ্ডের মাসিডোনিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত অনুশাসনের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ উহা প্রাচীন অশোক অক্ষরে লিখিত এবং উহাতে যে কয়েক জন বৈদেশিক নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণের মতেও ঐ সকল নরপতি স্ব স্ব দেশে খৃঃ পূঃ ২৬৯ খৃঃ পূঃ ২৫৮ মধ্যে যথার্থই রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অশোকের মৃত্যুর পর হইতে তিনশত বৎসর মধ্যে অসংখ্য ধর্ম্মপ্রচারক খোটান, খাসগড় এবং মধ্য এসিয়ার অন্যান্য অংশে গমন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, জার্মানাচেগোস্ বা শ্রমণাচার্য্য নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২৯ অব্দে ইটালীর রাজধানী সর্ব্বজনবিদিত রোমনগরে উপস্থিত হন। এই সন্ন্যাসীর জন্মভূমি গুজরাটের সন্নিহিত বারিগাজা (ভৃগুকচ্ছ বা বরোচ) বন্দর। কথিত আছে ভারতের তদানীন্তন রাজা পোরোস্ রোমের অধীশ্বর অগষ্টস্ সীজারের সহ বন্ধুত্ব স্থাপন মানসে ও রোমের সহ ভারতের অবাধ বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের জন্য কতিপয় লোক প্রেরণ করেন। শ্রমণাচার্য্য ইহাঁদের অধিনায়ক হইয়া প্রধান দূতরূপে রোমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ইটালীর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে গ্রীসের রাজধানী আথেন্স নগরীতে উপস্থিত হন। এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ প্রোথিত না করিয়া যেন ভস্মীভূত করা হয়। গ্রীকগণ তদনুসারে আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া তাঁহার দেহ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ করে এবং দগ্ধাবশেষ ভস্মের উপর এক স্তম্ভ উত্তোলিত করে। স্তম্ভের উপর গ্রীকভাষায় নিম্নলিখিত স্মৃতিবাক্য উৎকীর্ণ হয় ;—

"ভৃগুকচ্ছ নগরের ভারতীয় শ্রমণাচার্য্য এই স্থানে শয়িত, ইনি ভারতবাসীগণের প্রাচীন প্রথা অনুসারে অমৃত বা নির্ব্বাণ অন্বেষণ করিতেন।"

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে নীত হয়। ১২১ খৃঃ পূঃ অব্দে হিয়ুঙ্গুন (হূণ) জাতির সহিত যুদ্ধকালে চীন সৈন্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে বুদ্ধের

একটী সুবর্ণ মূর্ত্তি চীন দেশে লইয়া যায়। চৈনিকগণ ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হয় ও বুদ্ধদেবের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য উৎসুক হয়। খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দে তুরস্কবংশীয় রাজা কনিষ্ক কাশ্মীর ও পঞ্জাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি জালন্ধর নগরে ৪র্থ বোধি-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। কনিষ্কের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধমত চীন দেশে প্রচার লাভ করে। ইহার পর হইতেই বহুসংখ্যক ধর্ম্মপ্রচারক ক্রমে ক্রমে চীনরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করেন। কতিপয় প্রচারকের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল ;—

(১) কাশ্যপ মাতঙ্গ—ইঁহার জন্মভূমি ভারতের মধ্যপ্রদেশে। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। চীনসম্রাট মিঙ্ তি ভারতে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ দূতের আহ্বানে খ্রীষ্টীয় ৬৭ অব্দে কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনদেশে গমন করেন। তিনি চীনের লো-যঙ্গ নামক স্থানে শ্বেতাশ্ববিহারে অবস্থান করিয়া একখানি সুবিপুল বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত করেন।

(২) গোভরণ—ইনি সামান্যতঃ ভরণ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার জন্মভূমি ভারতের মধ্যপ্রদেশ। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিনয়-পিটক বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন এবং পরিশেষে উক্ত পিটকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়েন। একদা চীন সম্রাট তাঁহাকে চীনদেশে যাইবার জন্য আহ্বান করেন। মধ্যভারতের তদানীন্তন রাজা তাঁহাকে প্রথমতঃ যাইতে দেন নাই। কিছুকাল পরে ভরণ গুপ্তভাবে চীনযাত্রা করেন ; এবং খ্রীষ্টীয় ৬৭ অব্দের শেষভাগে চীন রাজধানীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে কাশ্যপ মাতঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা উভয়ে ৪২ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একখানি সুবৃহৎ বৌদ্ধ সংস্কৃত সূত্র চীন ভাষায় অনূদিত করেন। কাশ্যপ মাতঙ্গের মৃত্যুর পর ভরণ নিজেই পাঁচখানি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত করেন। খৃষ্টীয় ৭০অব্দে এই অনুবাদ-কার্য্য শেষ হয়। চীনের লো-যঙ্গ প্রদেশে ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ভরণের মৃত্যু হয়।

(৩) ধর্ম্মকাল—ইনি মধ্যভারতবর্ষ হইতে খ্রীষ্টীয় ২২২ অব্দে চীনে উপস্থিত হন। চীনদেশের বৌদ্ধগণ বৌদ্ধবিনয়ের নিয়মাদি সম্যক্ জানিতেন না। ইহা দেখিয়া ধর্ম্মকাল খ্রীষ্টীয় ২৫০ অব্দে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের প্রাতিমোক্ষ-সূত্র চীনভাষায় অনূদিত করেন। ইহাই চীনভাষায় বিনয়-পিটকের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ ; কিন্তু দুঃখের বিষয় ৭৩০ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) সঙ্ঘবর্ম্ম—ইঁহার জন্মভূমি ভারতের উত্তর প্রান্ত হৈমবত প্রদেশে। খৃষ্টীয় ২৫২ অব্দে ইনি চীনের লো-যঙ্গ প্রদেশে শ্বেতাশ্ববিহারে অবস্থিতি করিয়া কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত করেন।

(৫) বিঘ্ন—ইতি ভারতের একজন সাগ্নিক গৃহস্থ। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অন্য একজন ধর্ম্ম-প্রচারকের সমভিব্যাহারে চীন দেশে গমন করিয়া খৃষ্টীয় ২২৪ অব্দে ধর্ম্মপদ সূত্র চীনভাষায় অনূদিত করেন।

(৬) ধর্ম্মরক্ষ—ইঁহার পিতৃপুরুষগণ চীন প্রাকারের সন্নিধানে বাস করিতেন। ইনি নিজে ৩৬টী ভাষা জানিতেন। ২৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি চীনের লো-যঙ্গ প্রদেশে আগমন করিয়া কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত করেন। কয়েকখানি বৈপুল্য গ্রন্থও এই সময়ে অনূদিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৩১৭ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

(৭) কালরুচি—ইহাঁর জন্মভূমি পশ্চিম ভারতবর্ষ। ইনি চীনদেশে গমন করিয়া ক্যাণ্টন নগরে অবস্থান করেন; এবং ২৮১ খ্রীষ্টাব্দে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত করেন।

(৮) শ্রীমিত্র—ইনি পশ্চিম ভারতের একজন রাজপুত্র। কনিষ্ঠভ্রাতাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া ইনি শ্রমণ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ৩০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি চীনদেশে গমন করেন এবং ৩১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসর মধ্যে তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত করেন। ইনি অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ৩৪২ খৃষ্টাব্দে ন্যাংকিন্ নগরে দেহত্যাগ করেন।

(৯) গৌতম সঙ্ঘদেব—ইনি কাবুলের একজন শ্রমণ। ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে চীনে উপস্থিত হইয়া ইনি ৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আমরাও তাই ?

১

একটী একটী করি,　　　　নিশার ললাটে যথি,
কত তারা ভাসে,
আবার মিলায়ে যায়,　　　　গগণের কোলে তা'রা
যবে উষা আসে;

তারা দিয়েছিল দেখা, নাহি তার চিহ্ন-রেখা
নাহি সে গায়ের গন্ধ, আলোকণা নাই
যেন পথ ভুলে এসে, ধূয়ে মুছে গেছে দেশে,
তুমি কি ভেবেছ সখি, আমরাও তাই ?

২

বসন্ত পরশ পে'য়ে, উপবনে ধীরে ধীরে
ফোটে কত ফুল,
বাতাসে খেপায়ে দিয়ে দিগন্তে উছলি উঠে
সৌরভ অতুল !
আবার দু'দিন পরে, তা'রাই নীরবে ঝরে,
সুষমা সৌরভ অত কোথা কিছু নাই,
তরুলতা শূন্য কোলে, শুধু শুষ্ক বৃন্ত দোলে,
তুমি কি ভেবেছ সখি আমরাও তাই ?

৩

বরষার ভরা বিল, দুকূল উছলে সই
ঢেউ শত শত,
না পে'য়ে আপন সীমা, গরবে ফুলিয়া উঠে
আত্মহারা মত।
তুমিতো দেখেছ তায়, লাগিলে শারদ-বায়,
সে উল্লাস, সে উচ্ছ্বাস কিছু থাকে নাই,
বসি' সে সবুজ মাঠে, কৃষকেরা ধান কাটে,
তুমি কি ভেবেছ মনে আমরাও তাই ?

৪

আমরা তাদের সম, ক্ষণস্থায়ী নহি সই
ভাবিও তা' মনে,
তবে নিরাশায় হেন, আকুল রোদন কেন,
পুড়ি হুতাশনে !
জীবনের আছে স্তর, শত জনমের পর
পাইব সে অমরতা কেন কর ভয়,
মানব-জীবন কভু দু'দিনের নয়।

শ্রীমানকুমারী দাসী।

স্বপ্ন-প্রসঙ্গ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় জাহ্নবীতে 'স্বপ্ন' নামক যে প্রসঙ্গ লিখিতেছেন তাহা আমি একান্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। স্বপ্ন-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমার একটা ঔৎসুক্য বহুকাল হইতেই আছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এবিষয় অবলম্বন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়া কোনও পত্রিকাতে প্রকাশ করি নাই। শ্রীযুক্ত শশধর বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিলাম আমার চিন্তা ও তাঁহার চিন্তাতে অনেকটা মিল আছে। আমার সেই পূর্ব্ব-লিখিত প্রবন্ধ হইতে অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম তাহা হইতে এবিষয় বুঝা যাইবে।

"মানব-জীবনে স্বপ্ন একটা জটিল রহস্য। লোকে স্বপ্ন দেখে কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা পরিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণও এ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অনেক মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। জ্যোতিষী ইহার নানারূপ ফলাফলও ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের সংশয়ের নিরসন যে বিশেষ কিছু হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। আমরা আপাততঃ নানা মতামত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। তবে স্বপ্ন-রহস্যের জটিলতা কিরূপে দূর করা যাইতে পারে তাহার বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি। ভগবানের জগতে একটা কিছু সূত্র ব্যতীত যেমন কোন কিছুই হয় না, এই স্বপ্ন ব্যাপারেও নিশ্চয়ই সেইরূপ একটা সূত্র আছে যদবলম্বনে ইহার সরলতা সম্পাদন করা যাইতে পারে। সেই সূত্রটীর অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেই ঠিক হয়। এজন্য আমার বোধ হয় যে এবিষয়ে যাঁহার যে অভিজ্ঞতা আছে তাহা প্রকাশ করিলে উদ্দেশ্যের সফল সম্বন্ধে সুবিধা হয়।

আমি নানাস্বপ্ন আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, স্বপ্নসমূহকে প্রধান দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একপ্রকার স্বপ্নের মধ্যে আগাগোড়ায় একটা সামঞ্জস্য নাই; সবই যেন ছাড়া ছাড়া। আর একপ্রকারের মধ্যে রীতিমত সামঞ্জস্য আছে।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন অনেক সময় সত্য হইতে দেখা

যায়। প্রথম শ্রেণীর স্বপ্ন প্রায়ই অসম্ভব ঘটনাবলীতে পূর্ণ। মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছে, আমি হাঁসিতেছি শূন্যে উড়িতেছি ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পেট গরম, অজীর্ণ বা বায়ুর প্রকোপ হইলে এই প্রকার স্বপ্ন দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন যে কি ভাবে কখন সত্য হয়, তাহা বলা কঠিন। কখন তাহা তৎক্ষণাৎ 'ফলিয়া' যায়, কখন তাহা ২।৪।১০ বৎসর পরেও ফলিয়া' থাকে।

এইরূপ 'সত্য স্বপ্ন' কি একটা কাকতালীয় ব্যাপার? আমার নিজের তাহা বোধ হয় না, ইহার মধ্যে কোন একটা উদ্দেশ্য ও রহস্য আছে কিন্তু তাহা ঠিক করিয়া উঠা সহজ নহে।"

উক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে শ্রদ্ধেয় শশধর বাবু এবং পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন আমিও ঐরূপ ভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। শশধর বাবু ও স্বপ্নকে দেহজ ও মনোজ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনিও এই বিষয়ে সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি জানি। তাঁহার ন্যায় মনীষী এবিষয়ে স্বীয় চিন্তা-শক্তি নিয়োগ করিলে অনেক সাফল্য-লাভের আশা আছে; এবিষয়ে অদ্য আমি আমার মতামত ব্যক্ত করিব না। আমার নিজ জীবনে কতকগুলি স্বপ্ন সত্য হইয়াছে ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অদ্য তাহারই কয়েকটী সকলের বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত শশধর বাবুর অবগতির জন্য লিখিতেছি। এগুলি আমার নিজের দৃষ্ট সফল স্বপ্ন সুতরাং আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে অতিরঞ্জিত নহে একথা বলিতে পারি।

১। আমি যখন কার্য্যোপলক্ষে ফরিদপুরে বাস করিতেছিলাম সে সময় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একটী একবৎসর বয়স্কা কন্যা ভয়ানক পীড়িতা ছিল। আমি একদিন স্বপ্ন দেখিলাম যে আমার মাসীমাতা ঠাকুরাণীর কোলে মেয়েটী রহিয়াছে, হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পড়িল, আর তাহাকে পাওয়া গেল না। এই স্বপ্ন দেখার পরের পরের দিন বাটীর পত্রে অবগত হইলাম যে, যে রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম সেই দিনই বালিকাটী ঠিক ঐ ভাবেই হঠাৎ চীৎকার করিয়া মারা যায়। এই ঘটনা ১৮৯৮ সালে ঘটিয়াছিল।

২। ১৮৯০ কি ১৮৯১ সালে আমি কার্য্যোপলক্ষে একবার আমার শ্বশুরালয় তালবাড়িয়াতে গিয়াছিলাম। আমার শিরঃপীড়া আছে। মধ্যে

মধ্যে শিরোবেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাই। ঐ সময় একদিন আমি শিরঃপীড়ায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম, আমার স্ত্রীর কনিষ্ঠা এক ভগ্নী এবং আমার এক শ্যালকের স্ত্রী এই উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার শুশ্রূষা করেন। আমার স্ত্রী ঐ সময় আমাদের বাটীতে ছিলেন। যে রাত্রিতে আমার ঐরূপ শিরঃপীড়া হয় তৎপরদিনই আমি তথা হইতে বাটীতে আসি। আমি আসিবার পরই আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার গত রাত্রিতে শিরঃপীড়া হইয়াছিল কিনা? আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ জিজ্ঞাসার অর্থ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, গত রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন আমি তালবাড়িয়াতে শিরঃপীড়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। সুরবালা ও গৌরী আমার সুশ্রূষা করিতেছে আমি অমুক ঘরের অমুক খাটে শুইয়া আছি, শুশ্রূষা-কারিণীদের মধ্যে অমুকে অমুক দিকে ছিলেন। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ তাঁহার কথা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল।

অদ্য অবসরাভাবে আর আর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না। বারান্তরে আরও কয়েকটী বিস্ময়কর বৃত্তান্ত জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈষ্ণব উপাসক।

বিষ্ণু উপাসনা অতি প্রাচীন। ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব্ব এই চারি বেদেই বিষ্ণু উপাসনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋক্‌বেদে অগ্নি সূর্য্য ইন্দ্র বায়ু যম বরুণ রুদ্র সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বিষয়ে যতগুলি ঋক্ ব্যবহৃত আছে, বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে তদপেক্ষা ন্যুন নাই, বরং কোন কোন দেবতা অপেক্ষা অধিক। বেঁদে বিষ্ণুর সগুণমূর্ত্তির উল্লেখ নিতান্ত বিরল, কেবল কয়েকটী ঋকে ত্রিবিক্রমাবতারের আভাস পাওয়া যায়, তজ্জন্য বোধ হয় বিষ্ণুর বামন অবতারই সর্ব্বপ্রাচীন। উহা [illegible] বলির উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। তৈত্তিরিয় সংহিতা ও বাজসনেয় সংহিতায় অদিতি বিষ্ণুপত্নী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; কিন্তু রামায়ণ মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়, বিষ্ণু বামন-অবতারে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণু এবং নারায়ণ অভিন্ন। শতপথ ব্রাহ্মণ ও শাঙ্খ্যায়ন শ্রৌত-সূত্রে নারায়ণ পরব্রহ্ম বা প্রথম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে

নারায়ণ বা কৃষ্ণের দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ এই দুই প্রকার মূর্ত্তিরই বর্ণনা আছে। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ও গোলোকে দ্বিভুজ মূর্ত্তি অধিষ্ঠান করেন। চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী; আর দ্বিভুজ নারায়ণের পত্নী গঙ্গা এবং তুলসী; কিন্তু কোন কোন স্থলে সরস্বতীকে নারায়ণের পত্নীরূপে দেখা যায় না। রাজশেখর স্থরি-বিরচিত প্রবন্ধকোষে নৈষধ চরিত মহাকাব্যের প্রণেতা এবং কাশীর রাজা জয়চ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত মহাকবি শ্রীহর্ষের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে;—কাশীরাজের আদেশ অনুসারে শ্রীহর্ষ স্বীয় মহাকাব্যের দোষ গুণ পরীক্ষার নিমিত্ত কাশ্মীরে গমন করেন। তত্রত্য শারদা-পীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাক্ষাতে ঐ কাব্য শারদার হস্তে অর্পণ করিলে দেবী তৎক্ষণাৎ উহা ভূতলে নিক্ষেপ করেন। ঐ প্রসিদ্ধ পীঠের নিয়ম এই যে, যে গ্রন্থ শারদা দেবী হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, উহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, জানিতে হইবে। আর যদি তিনি হস্তে না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে জানা গেল উহা তাঁহার অভিমত হয় নাই। পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে ঐ কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীহর্ষ সহজে ক্ষান্ত হইলেন না; দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেবি! আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন, আমার কাব্যে কি দোষ আছে? না বলিলে আমি এখানে প্রায়োপবেশন করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব।" অগত্যা শারদা বলিলেন "কবিবর! তোমার কাব্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তুমি আমার কুমারীত্ব লোপপূর্ব্বক বিষ্ণুর গৃহিণীরূপে বর্ণনা করিয়া আমার মর্য্যাদার হানি করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি।" শ্রীহর্ষ বলিলেন "দেবি! তাহাতে আমার অপরাধ কি? কেন, সমুদয় পুরাণেই ত আপনি বিষ্ণুর গৃহিণীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।" তখন দেবী বলিলেন "পৌরাণিকেরা না বুঝিয়া আমাকে বিষ্ণুর পত্নীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তুমি অবিচারিত ভাবে তাহার অনুসরণ করিয়াছ বলিয়া আমি বিরক্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি এখন প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার কাব্য অনুমোদন করিলাম।"

এই গল্প হইতে বুঝা যায়, বৈদিক দেবতা সরস্বতী যে বিষ্ণুর পত্নী ইহা সকলের অনুমোদিত নহে। বিষ্ণু এবং নারায়ণ যেমন বৈষ্ণবগণের উপাস্য, তদ্রূপ ভগবানের দশাবতার বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ প্রভৃতিও তাঁহাদের আরাধ্য। বাল্মীকি-রামায়ণে রাম সর্ব্বগুণসম্পন্ন নৃপতিরূপে বর্ণিত হইলেও অধ্যাত্ম রামায়ণে ও অন্যান্য গ্রন্থে তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাভারতের

কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাবীর ও কোন কোন স্থলে নারায়ণরূপে উক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি মহাপুরাণ ও উপপুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্মরূপে ও তাঁহার অনন্ত মহিমার বর্ণনা দেখা যায়। বিষ্ণু উপাসনা অতি প্রাচীন হইলেও বৈষ্ণব দার্শনিকগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই উপাসনা বোধ হয় তেমন সার্ব্বজনীন হয় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মের বিস্তার করেন। রামানুজ বর্ত্তমান সময় হইতে কাহারও মতে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, কাহার মতে আট শত বর্ষ পূর্ব্বে, কাহার মতে সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। তিনি নানা বিঘ্ন অতিক্রম পুর্ব্বক অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার পর মধ্বাচার্য্যও ব্রাহ্মণ সমাজে এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন। মধ্বাচার্য্য ও তৎসম্প্রদায়ের লোক অত্যন্ত রক্ষণশীল বলিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায় তত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। তাহার পর, বল্লভাচার্য্য দাক্ষিণাত্য বণিক্ সমাজে এই ধর্ম্মের বীজ রোপণ করেন। বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সর্ব্বশেষে নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে হরিনামামৃত বিতরণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আরও উদারতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ-কৃত শ্রীভাষ্য এবং মধ্বাচার্য্যের মধ্বভাষ্য, বল্লভাচার্য্যের গোবিন্দভাষ্য প্রভৃতি অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক।

আমার বোধ হয় শৈব মতের ন্যায় বৈষ্ণবমতের তরঙ্গও সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণা-পথ হইতেই বঙ্গদেশে প্রবাহিত হয়। বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভু মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়স্থ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করেন। মধ্বা-চার্য্যের জন্মস্থান মান্দ্রাজের অন্তর্গত উদীপীর সন্নিহিত পাজিকাক্ষেত্র। তিনি দ্রবিড় ব্রাহ্মণ। সুতরাং দাক্ষিণাত্য ভক্তিস্রোতই যে বঙ্গীয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমসাগরে মিলিত হইয়া বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন প্রধান প্রশ্ন এই, যে ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণের বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; অতএব তাঁহারা বৈষ্ণবমত গ্রহণ করেন কাহার নিকট হইতে? আমার একটী বন্ধু (তিনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক) বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য বৈদিক, এখন পাশ্চাত্য হইয়া পড়িয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায় মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকল হইতে শ্রীহট্টে গিয়া বাস করেন।

চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পলাঞা গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥

চৈতন্য মঙ্গল।

দক্ষিণাপথের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচার ভয়ে বহু মহারাষ্ট্রীয় কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত উৎকল ও বঙ্গদেশে আসিয়া বদ্ধমূল হন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব দুই শ্রেণীই আছেন। ইহাঁরাও পঞ্চদ্রবিড়ের অন্যতম। হয়ত মহারাষ্ট্রের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রথমে উৎকলে আগমন করেন, তৎপরে বঙ্গোপসাগরের কূল ধরিয়া গিয়া শ্রীহট্টে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহাদেরই অধস্তণ পুরুষ জগন্নাথমিশ্রের সন্তান। তজ্জন্যই বৈষ্ণবধর্ম্মও ভগবদ্‌ভক্তি তাঁহার আজন্ম সিদ্ধ। বঙ্গীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ দ্রবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাঁরা সম্ভবতঃ পঞ্চদ্রবিড়ের অন্যতম বলিয়াই দ্রবিড় নামে খ্যাত। দ্রবিড় ব্রাহ্মণের বিশেষ বিশেষ আকারের সহিত ইঁহাদের আকারের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। অধিকন্তু দেখা যায় দ্রবিড় ব্রাহ্মণেরা প্রাণান্তেও দেশত্যাগ করেন না, এমন কি গ্রাম ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত। আর দ্রবিড়ে তেমন মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের উপদ্রবের কথা শুনা যায় না। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেই সকল মুসলমান সম্রাটেরই খর দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের গোত্র ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর গোত্র অধিকাংশই এক। এই সকল কারণে মনে হয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবলতা ন্যূন ছিলনা। শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমেই উৎকল হইতে মহারাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। এরূপ কথাও তাঁহার জীবনচরিতে লক্ষিত হয়। এই জন্য আমাদের মনে হয় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা মহারাষ্ট্র হইতে যাজপুরে তৎপর শ্রীহট্টে বাস করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য রামানুজচরিতের পরিশিষ্ট ভাগে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বীরপূজা। *

জগতে বীরের পূজা কয়জনে করিতে পারেন? কয়জনে বীরের বীরত্ব হৃদয়ে-হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে সমর্থ হন? যিনি পারেন তিনি মহৎ, যিনি পারেন তিনি প্রকৃত ভাবুক ও প্রেমিক। আমরা ত জানি যিনি বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পবিত্র গাথা প্রচারপূর্ব্বক সাহিত্যের কলেবর বিভূষিত ও গৌরবান্বিত করেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। বর্ত্তমান উপন্যাসের গ্রন্থকার শচীশ বাবুকে আমরা সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদান করিতেছি।

বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু—"বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার পিতৃব্য এবং বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাঁহার শ্বশুর, বাঙ্গালার সাহিত্য-আসরে তাঁহার দাবী যথেষ্ট আছে। "বীরপূজা" লিখিয়া তিনি সে দাবীর অনেকটা প্রমাণ দিয়াছেন।

"বীরপূজার" বালক-বীর ভবানীপ্রসাদের চরিত্র এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ অপূর্ব্বত্বটুকু পুস্তক পাঠ না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এমন সুন্দর বীরচরিত্র, কেবল অস্ত্রে বীর নহে—জ্ঞানে, বিনয়ে, ভক্তিতে, ত্যাগস্বীকারে, শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শনে, আহতকারীর প্রতি প্রকৃত "নিজজনের" ন্যায় ব্যবহারে—ভবানীপ্রসাদ অদ্বিতীয় বীর। যখন ভবানীপ্রসাদ খুল্লতাত অনন্ত-রামকে কারাগার হইতে মুক্তি দিতে গিয়া নিজে তৎকর্ত্তৃক আহত হইয়া বলিলেন; "মার ক্ষতি নাই, কিন্তু শীঘ্র পলাও।" তখন মনে হইল ভবানী-চরিত্র—দেব চরিত্র।

প্রভুভক্ত জনার্দ্দন, ভ্রাতৃভক্ত দেবল, প্রেমোন্মত্তা প্রমদা, গুণমুগ্ধ জয়ন্তকুমার লেখকের নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব পরিচায়ক। নিজের সর্ব্বস্ব পরকে দিয়া তাহার পথে কণ্টক স্বরূপ না দাঁড়াইয়া জয়ন্তকুমার দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিল। বাঙ্গালা উপন্যাসে এ চরিত্র সম্পূর্ণ অভিনব। উর্ম্মিমালা ও উৎসা চরিত্র সুন্দর। ততোধিক সুন্দর উর্ম্মিমালার শেষ কথা যাহা লিখিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন;—"ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; তা' মানুষকেই বাস, বা ঈশ্বরের পায়েই ঢাল।" অনন্তরাম চরিত্র লেখক শেষটায় বেশ ফুটাইয়াছেন।

---

* শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

গ্রন্থের "সূচনার" শেষে লেখক লিখিয়াছেন, "তাই তাঁহাদের চরণধূলি মাথায় লইয়া এই গ্রন্থ জগতে প্রচার করিলাম। ধৃষ্টতা কি মার্জ্জনীয় নয়?" আমরা ইহার উত্তরে সানন্দে বলিতেছি তাঁহাদের চরণধূলি মাথায় লইয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে রত্ন উপহার দিলেন তাহা নিজগুণে চিরদিন অক্ষয় ও উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে; আর সেই উজ্জ্বলতায় তাঁহার যশ-গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইবে।

দেশের কথা।

"বীরপূজা" প্রণেতা শচীশ বাবুর "বাঙ্গালীর বল" নামে আর একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই সাধারণ্যে বাহির হইবে। আশা করি, "বাঙ্গালীর বল" "বীর-পূজার" ন্যায় সর্ব্বজন সমাদৃত হইবে।

"অবলাবালা," "আকাশগঙ্গা" "সুধাবৃক্ষ" প্রভৃতি প্রণেতা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহোদয়ের Sree Sree Sanatan Dharma নামে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ইংরাজীতে সত্বর প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক সার কথা থাকিবে।

"শঙ্করাচার্য্য চরিত" প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক "রামানুজাচার্য্যের" একখানি বৃহৎ জীবনী লিখিতেছেন। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক সার কথা থাকিবে। শাস্ত্রী মহাশয় দাক্ষিণাত্য পুরী প্রভৃতি স্থান হইতে রামানুজ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত আনিয়াছেন। তিনি এই পুস্তক প্রণয়নের নিমিত্ত দেবনাগরাক্ষরে, আন্ধ্রাক্ষরে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রচুর বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান পুস্তকখানি দেখিয়া দিতেছেন। পুস্তকখানি বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ উপকারে আসিবে।

"উদ্বোধনের" লেখক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "শঙ্করাচার্য্য" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিতেছেন। ইনি এ পুস্তক প্রণয়নের জন্য অনেক দিন হইতে দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের নিজ বাটীতে গিয়া তথাকার ফটো তুলিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার গ্রাম হইতে তাঁহার গ্রামবাসী কর্ত্তৃক লিখিত জীবনী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পৃথিবীতে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যেখানে যে ভাষায় যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সমুদয় ইনি সঙ্কলন করিতেছেন। পুস্তকখানি বাহির হইলে বাঙ্গালায় একটী মহামূল্য জিনিষের প্রচার হইবে।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় এক অপূর্ব্ব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে কাব্যসুন্দরীগণের বিবরণ উদ্ধার করিয়া এক একখানি সুখপাঠ্য, চমৎকার ভাষাময় উপন্যাস রচনা করিতেছেন। মনসার ভাষাণের "বেহুলা", কবিকঙ্কণের "ফুলরা" এবং "সতী" চরিত্র লইয়া তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রথমখানি লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্যে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রভাতী।

এস এস প্রভাতী তপন,
ধরণীর নবীন জীবন!
ওই যে পূরব তীরে, ফুটিয়া উঠিছে ধীরে
শুভ, স্নিগ্ধ, মাঙ্গল্য-কিরণ,
নৈশ-হিম-স্তব্ধ মেঘে রক্তিম কিরণ লেগে,
ফলায় কি অপূর্ব্ব বরণ,
আকাশে নবীন জাগরণ!
আকাশের ম্লান ঠোঁটে রাঙ্গা হাসি ফুঠে ওঠে,
ঘুম-ভাঙ্গা শিশুর মতন।
অচেতন বিশ্ব-মাঝে চৈতন্য-ঝঙ্কার বাজে ;
আঁধারে আলোক বিকীরণ!
এস, এস, প্রভাতী তপন!

এস, এস, প্রভাতী তপন,
ধরণীর নবীন জীবন!
ঢাল আলো ঢাল, ঢাল, জ্বাল প্রাণ-বহ্নি জ্বাল,
বিকশি' উঠুক ফুলবন,
বিহঙ্গের কলরবে— আন দেব, আন তবে,—
অরণ্যের চিত্তের স্পন্দন,
ঢাল আলো, ঢাল, ঢাল, জ্বাল প্রাণ-বহ্নি জ্বাল,
জড়-হৃদে সঞ্চার চেতন,—
জগতের প্রতি কেন্দ্রে, সংগ্রাম-সঙ্গীত ছন্দে
আন, আন কীর্ত্তি-আবাহন,
কর্ত্তব্যের প্রীতি-সম্ভাষণ!
সুপ্ত তটিনীর জলে ক্ষেপণীর ছল ছলে
অনন্ত কর্ম্মের স্রোতে শত দিকে শত পথে
কর প্রাণ-উৎস উৎসারণ!
এস, এস, নবীন তপন!

এস, এস প্রভাতী তপন,
ধরণীর নবীন জীবন!
ওই যে মেঘের তীরে ফুটিয়া উঠিছে ধীরে—
শুভ, স্নিগ্ধ, মাঙ্গল্য-কিরণ,
হউক তোমার জয় হে দেব মঙ্গলময়,
দৃপ্ত তেজ করি বিকীরণ,
কর দীপ্ত নিখিল ভুবন!
ওই স্নিগ্ধ দীপ্তি মাঝে যে বহ্নি লুকায়ে আছে—
সে অনল কর বরিষণ!
মরণে চরণে দলি', কর্ত্তব্য সাধিয়া চলি,
তুচ্ছ সুখদুঃখের বন্ধন।
উদ্যম-উৎসাহ ছবি—— এস ভানু, এস রবি,
এস, এস, চির জাগরণ,
এস, এস নবীন তপন!

শ্রীসরলাবালা দাসী

লয়।

'লয়' নামক এই অক্ষরদ্বয়টী একটী শব্দ। এ শব্দটী অপরাপর প্রত্যেক শব্দের মত সেই শব্দসমষ্টিরূপাত্মক শব্দ-ব্রহ্মের একটী ব্যষ্টিরূপ; সুতরাং এটী একটী বড় মহৎসংসর্গী বলিয়া নিজেও মহান্। কাজেই এটী একটী বড় আদর করিয়া দেখিবার জিনিষ। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে এখন বুঝা যাক্ এ এমন মহৎসংসর্গী আদরের জিনিষকে দেখা যায় কি প্রকারে? ইহার উত্তর ভাবিতে যাইলে প্রথমেই ভাবিতে হয়,—এটী যখন শব্দ তখন ইহা দেখা যায় কি না। ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাই যে ইহা দেখা যায়, শব্দ-ব্রহ্মের প্রত্যেক শব্দরূপ ব্যষ্টিরূপই আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। যে যে শব্দের যেমন যেমন উচ্চারণ স্থান তাহার তাহার সাহায্যে সেই সেই শব্দ উচ্চারিত হইয়া বায়ুযানে আমাদের কর্ণরন্ধ্র পথে প্রবেশ করতঃ যেমন আমাদের জ্ঞানের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় অমনি আমরা সেই সেই শব্দকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অবশ্য সে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ নহে, শ্রাবণ। তা

যে প্রত্যক্ষই হউক, শব্দব্রহ্মের প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপই এই নিয়মে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহাই যখন নিয়ম, তখন আজিকার আমার এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত "লয়' শব্দটীও দেখা যাইতেছে যে, যতবার ইহা উচ্চারিত হইতেছে ততবারই ইহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রত্যক্ষ তো করিতেছি, কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে ইহাকে কি আমরা চিনিতে পারিতেছি? এই 'লয়' যাহাকে আমরা সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি এ কে? ইহার স্বরূপ কি, অর্থাৎ এ কি প্রকারের বস্তু ইত্যাদি যত কিছু তন্ন তন্ন করিয়া জানার নাম যে 'চেনা' সেই 'চেনা-শুনা' ইহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র হইতেছে কি? যিনি জানেন, যাঁহার সহিত ইহার পরিচয় আছে তাঁহার কথা বলিতেছি না, তিনি চিনিতে পারেন; কিন্তু সাধারণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সাধারণের হই-তেছে কি? আর শব্দ-চেনা সম্বন্ধে সাধারণের হইয়াই বা থাকে কি? সকলে কি সব শব্দকেই প্রত্যক্ষ করিবামাত্র চিনিতে পারেন? ইহা সত্য বটে যে, সকল শব্দই ধ্বনিত হইবামাত্র অবিকল শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট সকলেরই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু সকল শব্দকেই কি আমরা সকলেই চিনিতে পারি অর্থাৎ শব্দসমষ্টিরূপাত্মক শব্দব্রহ্মের প্রত্যেক শব্দরূপ ব্যষ্টিরূপেরই কি আমরা স্বরূপ অনুভব করিতে পারি? অসম্ভব;—পারি না, কেন না শব্দব্রহ্মের রূপের তো সীমা নাই। আমরা সেই অসীম রূপময়ের কতটুকু রূপের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য রাখিতে পারি, আমাদের জ্ঞানই বা কতটুকু, আর আমরাই বা কতটুকু। আর এক কথা প্রত্যক্ষ হইলেই যে তাহাকে চেনা যায়, এমন নহে। যেমন এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তুমি এক এক করিয়া প্রত্যেক বস্তুকেই আমাদের চক্ষের নিকট ধর, আমরা প্রত্যেকেই (অবশ্য যাঁহার যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় অবিকল) প্রত্যেকটীকেই দেখিতে পাইব বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে যে বস্তু আমাদের জানা, যে যে বস্তু আমাদের পরিচিত, সেই সেই বস্তুর যাথার্থ্য ভিন্ন যেমন আমরা অজানা অন্য কোন বস্তুকে দেখে যাওয়া ছাড়া তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিব না, তেমনি আমরা শব্দব্রহ্মের প্রত্যেক শব্দকেই শুনিবামাত্র শ্রাবণ চক্ষে দেখিতে পাইলেও যেটী জানি না, যে শব্দটীর সহিত আমাদের পরিচয় নাই, সেটীর শুধু শুনে যাওয়া ছাড়া আর কোনরূপ স্বরূপ বুঝিতে পারি না। শব্দসামান্যের দর্শনের প্রতি শব্দসামান্যের শ্রবণই যে কারণ এ যেমন একটী নিয়ম, তেমনি শব্দসামান্যের প্রত্যক্ষ মাত্রে তাহাদের স্বরূপাজ্ঞানের প্রতি ইহাও একটী নিয়ম।

তাহা তো হইল। শব্দ শুনিবামাত্র তাহার স্বরূপবোধ বা অর্থবোধ হয় না ইহাতো ঠিক্ হইয়া গেল। এখন দেখা যাক্ এই 'লয়' শব্দটী সাধারণের কেমন পরিচিত। অথবা সাধারণের কথা বলিবার আবশ্যক নাই, কেন না কে কাহাকে কেমন চেনে তাহা আমি জানিবই বা কি প্রকারে, আর আমার তাহা জানিবার আবশ্যকই বা কি? এখন দেখা যাক্ এ 'লয়' শব্দটী আমার নিজের কেমন পরিচিত। আমি এই 'লয়'শব্দটীকে কেমন বলিয়া জানি। তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রথমে তো এ শব্দটী ধ্বনিত হইবামাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় পথে আমার জ্ঞানের নিকট যেমন আসিয়া দাঁড়ায় অমনি আমার মনে হয় এই ইনি সেই,—সেই পুরাণের 'লয়'। দ্বাদশসূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গ হইতে উদ্গীর্ণ জ্বালামালায় যাঁহার প্রথম কার্য্যারম্ভ সংসারকে দগ্ধ করা, এই ইনি সেই পুরাণের 'লয়'। তাহার পর মনে হয় ইনি ইঁহার কার্য্যের পর কার্য্য করিতে করিতে করেন কি না, বস্, কিছুই নাই। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ্, ব্যোম কিছুই নাই। এ সংসারে যাহা কিছু থাকে তাহার কিছুই নাই, সংসার নিজেও নাই, বড় ভয়ঙ্কর! তখন যে অবস্থা তাহা আমি কোন ছার, আমি কি বলিব ঋষি নিজে বলিয়াছেন, তখন—যখন 'লয়' আসিয়া সৃষ্টি নাশ করিয়াছিল বিধাতার যখন আবার সৃষ্টি করিবার আবশ্যক হইল তখন আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং—অর্থাৎ 'লয়ের' পরে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে কি অবস্থা ঋষি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, তাহা অপ্রজ্ঞাত, তাহা জানিবার যো নাই; সুতরাং তাহা অলক্ষণ—নামশূন্য, কিছুই নহে। সর্ব্বনাশ! 'লয়' শব্দটীকে দেখিবামাত্র যেমনি মনে হয় ইনি এই স্বরূপের পদার্থ, তখনি যেন বলিতে ইচ্ছা করে, "কর্ণ, কেন তুমি তোমার দ্বার রুদ্ধ কর নাই, কেন তুমি তোমার দ্বার দিয়া অমন শব্দকে আমার সমক্ষে উপস্থিত করিলে? আমি চাহি না অমন সর্ব্বনেশে যাহার স্বরূপ, আমি তাহাকে দেখিতে চাহি না।" এই তো গেল 'লয়ের' একপ্রকার স্বরূপ, কিন্তু এ স্বরূপ তো বড় ভয়ঙ্কর! ইনি শব্দব্রহ্মের অন্যতম রূপ বলিয়া হউন না কেন মহৎসংসর্গী, তথাপি ইনি এ স্বরূপে বড় অনভিপ্রেত; সুতরাং ইনি এইখানেই পরিহার্য্য। তবে কি তাই করিব? ইঁহাকে এইখান হইতেই কি প্রণাম করিয়া ইঁহার দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পলায়ন করিব? অথবা পুরাণের ও পুরাণ তুলিতে আঁকা 'লয়ের'ঐ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই ভয় না পাইয়া, আমি আমার মস্তিষ্ককে শীতল করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিব যে, আর কোথাও ইহার আর

কোন মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে কিনা? মনের এই দোলায়মান অবস্থায় যখন মনে হয় আচ্ছা দেখি দেখি ঐ কটু-তিক্ত-কষায় অনভিপ্রেতাস্বাদ ঔষধের ভিতর যেমন সর্ব্বজন সমাদৃত সঞ্জীবন রস নিহিত থাকে তেমনি 'লয়ের' এই রুদ্র মূর্ত্তির ভিতরে কোনরূপ সৌম্যমূর্ত্তি নিহিত আছে কি না? তখন দেখি—আছে, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—আছে একটী অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি উহার ভিতরে নিহিত আছে। উহাও সেই 'লয়ের' সেই 'কিছুই নাই' মূর্ত্তিই বটে; কিন্তু এ 'কিছু নাই' যেন সে 'কিছু নাই' নহে, সে 'কিছু নাই'র মত যেন এ 'কিছু নাই' ভয়ঙ্কর নহে। বরং এ 'কিছু নাই' বড় সুন্দর, বড় সৌম্য, বড় শীতল, বড় উজ্জ্বল; যেন চন্দ্রের অঙ্গে সূর্য্যের রশ্মি, ঔজ্জ্বল্যে দিবাকারী কিন্তু অতীক্ষ্ণ। যেন নীলাকাশে অচঞ্চল বিদ্যুৎ, মেঘে নহে নীলাকাশে, মেঘে যে অশান্তি ঢের। যেন যমুনার জলে রক্তপদ্ম, নীলিমায় রক্তিমা, মাধুর্য্যে ঔজ্জ্বল্য, মরি, মরি, কি সুন্দর মূর্ত্তি!!! ঐ যে 'লয়ের' ঐ সুন্দর মূর্ত্তি দেখনা,—দেখিতেছ ঐ তপস্বিনী শকুন্তলা। কুটীরে কেহ নাই, মালিনীতীরে লতামণ্ডপান্তরিত শকুন্তলার কুটীর আজ এখনও নির্জ্জন, অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ফুল তুলিতে গিয়াছে। শকুন্তলা আর ফুল তোলে না, গাছে জল দেয় না, শকুন্তলার এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে। শকুন্তলা চুপ করিয়া কুটীরের একপাশে বসিয়া রহিয়াছে। হাতে একটী আঙ্‌টী। আঙ্‌টীটি বড় সুন্দর, শকুন্তলার চক্ষে ঐ আঙ্‌টীটি আজ বড় সুন্দর। সে যে বহুমুল্য রত্নে নির্ম্মিত বলিয়া সুন্দর, তাহা নহে। ছার! রত্ন ছার! এ আঙ্‌টীটি শকুন্তলার যাঁহার, তাঁহার কাছে পৃথিবীর আর কোন রত্ন না শকুন্তলার চক্ষে ছার। শকুন্তলা একতানমনে আঙ্‌টীটি দেখিতেছে। আঙ্‌টীটির গায়ে তিনটী অক্ষর। আমরি! যে মহাপ্রাণ বলিয়াছেন অক্ষর ব্রহ্ম, তাঁহাকে শত শত নমস্কার!!! শকুন্তলা ভাবিতেছে এই আমার ব্রহ্ম। আর ভাবিতেছে—আমার এই ব্রহ্মের যিনি সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন,—

> একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
> নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
> তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধনিদেশবর্ত্তী
> নেতা জন স্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥

শকুন্তলা ভাবিতেছে আর ডুবিতেছে, ডুব্ ডুব্ ডুব্। শকুন্তলা কোথায়

ডুবিয়া গেল। শকুন্তলার 'লয়' হইয়া গেল। ইহজগতে শকুন্তলা আর নাই। তুমি দুর্ব্বাসা—ক্রোধসর্ব্বস্ব ঋষিকুলকুলাঙ্গার দুর্ব্বাসা, কর না কেন বজ্রাঘাত, শকুন্তলার তাহাতে কি? শকুন্তলার তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। থাকিবে কেন? সে কি আছে, সে কি কুটীরে আছে, সে যে এই তিনটী দিনের পর যাঁহার কাছে যাইবে, সেই তাহার প্রাণের প্রাণ—মর্ম্মের মর্ম্ম—সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব দুষ্মন্তে আপনাকে লীন করিয়া দিয়া 'লয়ের' ঐ হাস্যময়ী মূর্ত্তির কাছে আপনাকে লইয়া গিয়াছে। তুমি স্বার্থপর হৃদয়বিহীন দুর্ব্বাসা, তুমি জানিতে পারিলে না যে তুমি আজ কি সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিলে, কোন কুসুমে বজ্রাঘাত করিলে।

ঐ মূর্ত্তি—চন্দ্রালোকে সমুদিত চন্দ্রের মূর্ত্তির মত ঐ মূর্ত্তি যখন মনে করি ঐ 'লয়ের', তখন মনে হয় কর্ণ তোমার দ্বারে পুষ্পবৃষ্টি হউক, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যতবার পার ঐ 'লয়' শব্দটীকে আমার নিকট লইয়া আইস। দেখি আমি ঐ 'লয়ের' ঐ মূর্ত্তি দেখি, যে মূর্ত্তি দেখিয়া শকুন্তলা—শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, যে মূর্ত্তি দেখিয়া সীতা—সীতারাম, যে মূর্ত্তি দেখিয়া রাধা—রাধাশ্যাম, আমি সেই মূর্ত্তি দেখি। 'লয়ের' এ মূর্ত্তি বড় মধুর। প্রাণ-জগতে 'লয়ের' এই মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝি দার্শনিকদের চক্ষু ফুটে, তাই তাঁহাদের পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বা যে দার্শনিকের মতে যিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা তাহাতে লীন হইতে জীবকে উপদেশ দেন। ঐ এক মূল মন্ত্র। সকল দর্শনেরই ঐ এক মূলমন্ত্র। দর্শন বলিতেছেন—জীব তুমি বড় কষ্ট পাইতেছ, জন্মমৃত্যুজরার তাড়ণায় তুমি বড় ক্লেশ পাইতেছ, আইস, আমি তোমায় তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার হইবার উপায় বলিতেছি শুন। দেখ, তোমার আর কেহ নাই আছেন শুধু—তিনি! তুমি কায়মনোবাক্যে কেবল তাঁহাতেই লীন হইবার চেষ্টা কর, তাঁহার পাদপদ্মেই তোমার যথাসর্ব্বস্বের 'লয়' করিয়া দেও, দেখিবে তোমার জন্ম থাকিবে না, জরা থাকিবে না, মৃত্যু থাকিবে না—তোমার কোন দুঃখই থাকিবে না।

এই না? এই এক মূলমন্ত্র ব্যতীত কোন দর্শনে আর কি আসল কথা আছে। 'লয়ের' ঐ মধুর মূর্ত্তির কথা আছে বলিয়াই না দর্শন—দর্শন, নহিলে ও কথার ঝুড়ি ছাইভস্ম তো একটী কীট পতঙ্গের একখানা পায়ের যোগ্যও হইত না।

এইরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন দেখি, সংসারে যত কিছু সুন্দর আছে সকলের অপেক্ষা এই 'লয়ই' সুন্দর, তখন মনে হয়, হে ভগবন্! আমি আর কিছুই চাহি না, ঐ সারের সার, আকাঙ্ক্ষিতের আকাঙ্ক্ষিত, সুখের সুখ

শান্তির শান্তি-'লয়ের' ঐ মূর্ত্তিখানি আমায় দেও, আমি উহা লইয়া যেন তোমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া তোমায় বলিতে পারি——

হরে মুরারে মধুকৈটভভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥ *

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

সন্ধিভঙ্গ।

কহিল ফুল্ল ফুলদলে মধুমাছি,—
কভু উড়ে, কভু বসিয়া পর্ণে
ধীরে ধীরে, সুর পশিল কর্ণে,
"মুগ্ধচিত্তে ভালবেসে আসিয়াছি!"
অঙ্গ নাড়িয়া কহিল কুন্দ,
গন্ধে ভাসিয়া উঠিল ছন্দ,—
"ভাল যদি বাস, এসো হৃদে করি বন্দি।"
বক্ষে বক্ষে মিলিল, হইল সন্ধি!

ক্রমে শেষ হ'ল কুন্দ-হৃদয়-সুধা।
চারিদিকে ফোটে প্রসূনপুঞ্জ,
রূপে আলোকিত হইল কুঞ্জ,
গুঞ্জন করে ভ্রমর মিটায়ে ক্ষুধা;
ছাড়িয়া কুন্দ-কোমল-বক্ষ,
ফুল্ল গোলাপে করিয়া লক্ষ্য,
মক্ষিকা যায় ল'য়ে প্রাণে নব রঙ্গ;
ঝরিল কুন্দ—সন্ধি হইল ভঙ্গ!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* ভাটপাড়া সাহিত্য-সঙ্গীত সমাজের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

স্বপ্ন।

সত্য স্বপ্নের তালিকা প্রস্তুত করিতে গেলে দেখা যায় যে উহার শেষ হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল। এত অধিকসংখ্যক লোক এই শ্রেণীর স্বপ্ন দেখেন যে, তাহার তালিকা সংগ্রহ কোন স্থলেই শেষ হয় না। আমি এ পর্য্যন্ত যতগুলি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাতে পাঠকবর্গ যদ্যপি আপন আপন সংগৃহীত স্বপ্নগুলির বিবরণ আমাকে পাঠাইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এই গুরুতর বিষয় আলোচনা করা অনেক সহজ হইত। যাহা হউক এই গুরুতর বিষয় সংখ্যার উপর যতদূর নির্ভর করে, প্রকারের উপর তদপেক্ষা অধিক নির্ভর করে। স্বপ্নের প্রকার ভেদ, অর্থাৎ শ্রেণী বিভাগ পশ্চাৎ করা যাইবে।

নাটোর নিবাসী মৌলবী এর্সাদ আলী খাঁ চৌধুরী শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তিনি মেদিনীপুর জেলায় গিয়াছেন। তথায় তাঁহার গুরুদেবের পিতার সমাধি-মন্দিরের নিকট বসিয়া আছেন, নিকটে একটী মস্‌জিদ আছে; কিন্তু সমাধি-মন্দিরের চূড়া মস্‌জিদ অপেক্ষা উচ্চ। মৌলবী সাহেব কিছুক্ষণ তথায় বসিয়া থাকিলে পর একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে "আপনার গুরু তাঁহার পিতার সমাধি-স্তম্ভ ঐ মস্‌জিদ্‌ অপেক্ষা উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত করায় বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। একথা আমি একা বলি না, শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি প্রভৃতি অনেকেই বলেন।" ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি নিজ পরিচয় দিয়াছিল এবং মৌলবী সাহেবেরও পরিচয় লইয়াছিল। পরে ১৪।১৫ দিন অন্তে মৌলবী সাহেব সত্যই মেদিনীপুর যান, এবং তাঁহার গুরুদেবের পিতার সমাধি-স্তম্ভের নিকট বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্যই এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করেন এবং আত্মপরিচয় দিয়া, স্বপ্ন দৃষ্টমত কথা বলিয়াছিলেন। স্বপ্নে ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির যেরূপ আকৃতি দৃষ্ট হইয়াছিল, সত্যই সে তদ্রূপই; এবং স্বপ্নে মস্‌জিদের চূড়া অপেক্ষা সমাধি-স্তম্ভের চূড়া উচ্চ হওয়ায় সে যে সকল দোষারোপ করিয়াছিল, এবং মহম্মদ আলি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছিল, সত্যই সে ঠিক সেইরূপ কথা মৌলবী সাহেবকে বলিয়াছিল। এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত নিজ বা নিজের কোন আত্মীয়ের সুখদুঃখের সহিত জড়িত নহে, এবং স্বপ্নের ঐ কৃষ্ণকায় ব্যক্তি মৌলবী সাহেবের কেহই নহে। বলা বাহুল্য যে মৌলবী সাহেব

প্রকৃতই মেদিনীপুর যাওয়ায় এবং ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করার পূর্ব্বে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই।

বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী মহাশয়ের মাতা অতি প্রাচীনা। তিনি দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় নানারূপ চিকিৎসাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাযুক্ত হইয়া উঠিল। এই সময় তিনি একদিন শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, কে যেন তাঁহাকে একটী ঔষধ বলিল, এবং তাহা সেবন করিলে তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, একথাও বলিয়া গেল। তিনি ঐ কথা স্বীয় পুত্রের নিকট প্রকাশ করায় মাতৃবৎসল পুত্র অবিলম্বে ঐ ঔষধ সংগ্রহ করিয়া দিলেন, এবং সত্যই ঐ ঔষধ সেবনে চাকী মহাশয়ের মাতা অবিলম্বে আরোগ্যলাভ করিলেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে স্বপ্নে ঔষধের বস্তু পাওয়া যায় নাই; কেবল ঔষধের উপকরণ গুলির বিষয় উপদেশ পাওয়া গিয়াছিল।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালি গ্রামে শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক বাস করেন। তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। ৭।৮ মাস হইল বাওয়ালিতে একদিন প্রায় শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন তাঁহার ঠাকুরমাকে গঙ্গাযাত্রা করিতেছে এবং তিনি কাঁদিতেছেন। ঠাকুরমা তৎকালে ভবানীপুরে চিকিৎসা করাইতেছিলেন। ঐ স্বপ্ন দেখিবার পর দিবস এক ব্যক্তি আদক মহাশয়কে বলিল "তোমার ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন।" তাঁহার ঠাকুরমার প্রকৃতই সেই রাত্রেই মৃত্যু হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটী পদ।

(প্রতিবাদ।)

গত আশ্বিন সংখ্যার জাহ্নবীতে শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর রায় মহাশয় বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের নূতন অপ্রকাশিত বলিয়া যে পদটী প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি ও বক্তব্য আছে। আমরা বহুদিন হইতে নিম্নোদ্ধৃত পদটী বাঙ্গালীর আদি বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি এবং স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক প্রভৃতি বিখ্যাত সংগ্রহকারগণের গ্রন্থেও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে;—

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে, পিরীতি করিয়া, রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব, সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব, রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব, যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা, সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে, পিরীতি কেমন জ্বালা॥ *

পাঠক দেখিলেন পদটী কাহার? রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত পদের প্রথম সাতটী চরণ ব্যতীত অবশিষ্ট কয়েক পংক্তি অবিকল শেষোদ্ধৃত পদটীর সহিত মিলিয়া যায়। চণ্ডীদাস প্রাচীন কবি, কাযেই বলিতে হয় জ্ঞানদাস তাঁহার রচনা হইতে এই গানটী অপহরণ করিয়াছেন; কিন্তু তা কি বিশ্বাস করা যায়? নিশ্চয়ই ইহা লিপিকরের ভ্রম প্রমাদ; শেষ ছত্রে 'চণ্ডীদাস কয়' লিখার স্থলে 'জ্ঞানদাস বলে' অসাবধানতাক্রমে লিখিয়া ফেলিয়াই এই গোল বাধাইয়াছে।

পাঠক, আর একটু অপেক্ষা করুন! দেখিবেন প্রথম সাতটী ছত্রও চণ্ডীদাসের রচনা হইতে আহরণ করিয়া লিপিকর এই সম্পূর্ণ গানটী খাড়া করিয়াছেন—

* * * *

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে।

* * * *

যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥

---

* মৎ প্রণীত 'চণ্ডীদাস চরিত'।

এই গানটী ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লিপিকর পূর্ব্বোক্ত পদটীর শিরোভূষণ করিয়াছেন। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে এরূপ ব্যাপার আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেক স্থানেই 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানো দেখিতে পাওয়া যায়।

এতক্ষণে সম্ভবতঃ পাঠক মহোদয়গণ বুঝিতে পারিলেন, রায় মহাশয় জ্ঞানদাসের বলিয়া যে পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা জ্ঞানদাসের নয়—চণ্ডীদাসের রচিত এবং তাহা অপ্রকাশিত নহে—বহুদিন হইল মুদ্রাযন্ত্রের লৌহ-কারাগার ভেদ করিয়া লোকলোচনের অন্তর্গত হইয়াছে।

'গীতকল্পতরু', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ-পুস্তকেও এইরূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটীও জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে;—

ইক্ষু রোপিনু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়॥ ইত্যাদি।

এই সকল কারণে উক্ত গ্রন্থনিচয়ের একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

তপস্বিনী।

গান। (কানেড়া)

ব্রতধারিণী অয়ি নিরাভরণা!
ধূলি ধূসরালকা অনশনা! (মা)
যোগনিদ্রা-ঘোরে পাশরি তনয়গণে
কতদিন রবে অচেতনা?
জীর্ণ চীর পরি' ক্ষুধায় হা হা করি'
ভ্রমিছে পুত্র সব জননী তোমারে স্মরি
অন্নপূর্ণা ওমা! নিদয়া আছ যে কেন
ক্ষুধিত সুতের ব্যথা বুঝিছ না?

আপন যা' কিছু, দিয়ে পরের করে
পঙ্গু তনয়দল দাসত্ব শিরে ধরে
দাস-মাতা তুমি জগত মাঝে বটে,
তবু কপট মোহ ভাঙ্গ'না।

তুমি যে রাজরাণী স্থিতি-বিধায়িনী
যুগে যুগে কোটী লোকপালিনী
কেমন রক্ষণ এ নাশ-গ্রাসে দিয়ে
পাষাণ প্রাণে বসি' কি কর সাধনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রভাতী।

(১)

শ্রীমতী সুরবালার সহিত যখন শ্রীমান সুকুমারের শুভ বিবাহ হয় তখন শ্রীমতীর বয়স ৪ বৎসর এবং শ্রীমানের বয়স ৭ বৎসর। কাজেই যথাশাস্ত্র সুকুমারের সহধর্ম্মিনী হইবার পরেও সুরবালা যে সুকুমারকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত তাহা অশাস্ত্রীয় হইলেও তেমন অসঙ্গত শুনাইত না। পবিত্র পতি-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার পরেও তাহাদের যথারীতি 'আড়ি' ও 'ভাব' পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইল না। উভয় পক্ষের বিবাদের মীমাংসা করিতে সুকুমারের জননীর অনেক সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল।

এই দুই পক্ষের বিসম্বাদের মূলে সুকুমারের দোষটাই বেশী। সুরবালার পড়িবার পুস্তকে কালী ঢালিয়া, তাহার পুতুলের বাক্স জলে ফেলিয়া দিয়া, ঘুমাইলে তাহার চুল কাটিয়া সুকুমার নানারূপে তাহার উপর অত্যাচার করিত। সুরো বেচারী ভাল মানুষ কাজেই মা তাহার দিকেই হইতেন। সুকুমারকে বলিতেন,—"আমি সুরোর মা হ'ব, তোর মা হ'ব না।" এ শাস্তি সুকুমারের পক্ষে বড়ই গুরুতর।

দাম্পত্যজীবনের এ সূত্রপাত অভিনব। ইহার পর, দেখিতে দেখিতে বারটী বৎসর পাখীর মত পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া গেল। বার বৎসর পূর্ব্বে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সুরবালা সুকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিল, আবার

বারো বৎসর পরে সুকুমারের গৃহ শূন্য করিয়া অনন্তলোকে চলিয়া গেল। বিদায়ের সময় সুকুমারের দুটী হাত আপনার দু'খানি শীর্ণ হাতের ভিতর ধরিয়া বলিয়া গেল, "দেখ, লোকে বলে স্বামীর মত আর জগতে কিছু নাই; কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য, স্বামী যে কেমন তাহা বুঝিলাম না। ভাই-বোনের মতই চিরদিন তোমাকে ভালবাসিয়াছি, স্বামীর প্রেম কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারি নাই। তাই মনে হয় এক দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

সদ্য-মৃতার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুকুমার সেই কথাগুলি ভাবিতেছিল। এই যে চির নীরব ওষ্ঠাধর এখনই মুখর ছিল! এই যে চির-নিদ্রিত চক্ষু, এই চক্ষুতো এখনই জলপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চাহিয়াছিল, ওই চক্ষু হইতে যে অশ্রুবিন্দুগুলি মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল তাহা ত এখনও শুখায় নাই, কিন্তু তাহার উৎস চিরদিনের জন্য শুখাইয়া গিয়াছে।

(২)

পত্নীর সৎকার করিয়া সুকুমার ফিরিয়া আসিল; রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। নিঃশব্দে সুকুমার আপনার শয়ন গৃহের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল, সুকুমারের চোখে একবিন্দু জল নাই। কেবল তাহার মনে হইতেছিল—সে যেন আজ বড় শ্রান্ত, আর যেন তাহার এ শ্রান্তিতে শান্তি মিলিবে না।

সুকুমারকে ফিরিতে দেখিয়া জননী "আমার সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে এলিরে বাবা!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। সেই হৃদয়ভেদী করুণধ্বনিতে নিশীথিনী শিহরিয়া উঠিল।

"আজ আমি লক্ষ্মীহীন নারায়ণ কেমন করে দেখবো" বলিয়া জননী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, সুকুমার প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "দিদি, চুপ কর, সোনার চাঁদ বেঁচে থাক আবার স্বর্ণপ্রতিমা ঘরে আস্‌বে।"

"সেকি আমার বৌ? দিদি আমি যে ন'মাসের মা-মরা মেয়ে মানুষ করেছি। আমার বিছানায় সুকুমার এক পাশে, মা আমার এক পাশে থাক্‌তো। আমি যে বড় সাধ করে সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেম। মা আমার একদণ্ডও সুকুমারকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্ত্তো না, ইস্কুল থেকে সুকুমার বাড়ী এলে, মা আমার এলোচুলে পাগলীর মত ছুটে যেতো,

লোকে দেখে কত হাস্‌ত। সুকুমার কথায় কথায় রাগ ক'রে বোল্‌তো 'কথা বোল্‌ব না' মা আমার মুখখানি মলিন করে আমার পাশে এসে দাঁড়াতো, জিজ্ঞাসা কল্লেই অমনি চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তো। সে মুখ না দেখে কেমন করে প্রাণ ধরে থাক্‌বো।"

সুকুমার আর নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। বন্য বিহঙ্গের মত প্রাণ তাহার বুকের ভিতর ছট ফট করিয়া পলাইবার জন্য পথ খুঁজিতেছিল। সুকুমার অস্থির ভাবে বাহিরের খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল রাত্রি শান্ত ; স্থির। নীরব অন্ধকার আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র নীরবে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সুপ্ত প্রকৃতিতে কোথাও চাঞ্চল্য, কোথাও অশান্তির লেশ মাত্র নাই।

(৩)

পরদিন অরুণা আসিয়া ম্লানমুখে সুকুমারের মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইল, অরুণাদের বাড়ী সুকুমারের বাড়ীর পাশে। ছাদে ছাদে এবাড়ী ওবাড়ী করা যায়।

অরুণাকে দেখিয়াই মায়ের শোক দ্বিগুণ বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"অরুণা রে! তুই আর কাকে দেখ্‌তে এসেছিস্ মা! মা যে আমার ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।"

অরুণা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুকুমারের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "মা আমার বল্‌তো 'মা, গহনার জন্য অরুণার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। আমার গায়ের গহনাগুলি দাও না মা, তাই দিয়ে অরুণার বিয়ে হোক্, ওরা গরীব কোথা থেকে গহনা দেবে?' আমি মায়ের মন বুঝবার জন্য বল্‌তাম 'তোর গহনা অরুণাকে দিবি, তুই পর্‌বি কি?' মা আমার হাসিমুখে বল্‌তো 'গহনা পরে কি হবে মা, তুমি যে বল নোয়া আর শাঁখা সব গহনার চেয়ে ভাল গহনা। তা হাতে নোয়া থাক্‌লেই তো হলো।' আহা মা আমার যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা, নোয়া আর শাঁখা হাতে দিয়েই চলে গেল।"

অরুণা নীরবে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

গৃহিণী বলিলেন "আয় অরুণা, তুই আমার বুকের কাছে আয়।

আমার বুক যে একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে, তুই তার বড় ভালবাসার জিনিস, তোকে বুকে করে যদি বুক জুড়াতে পারি।"

বলিয়া গৃহিণী অরুণাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। এমন সময় দালানে সুকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণাকে গৃহিণীর কোলের ভিতর দেখিয়া চমকিয়া বলিল 'মা, ও কে মা?" বুঝি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে হইল সুরবালা মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। সদ্য-অতীতকে বর্ত্তমান এমনি করিয়াই ধরিয়া রাখিতে চায়।

(৪)

সেইদিন হইতে অরুণা সর্ব্বদাই সুকুমারের বাড়ী থাকিত। অরুণার বিমাতা ডাকিতে আসিলে গৃহিণী বলিতেন, "থাক্‌না, অরু আমারই কাছে থাক্। এতো একই ঘর, এতে আর দোষ কি? আমি একলা থাক্‌লে পাগল হয়ে যেতেম ও আছে তাই বেঁচে আছি।"

অরুণার বিমাতা ভাবিয়া দেখিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি। বরং কয় দিনের জন্য অরুণার খাওয়া পরার খরচটা বাঁচিয়া যায়।

অরুণা সকালে মায়ের পূজার আয়োজন করিয়া দিত। এই কাজটী সুরবালার বড় প্রিয় কাজ ছিল। পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে বসিয়া সুরবালা যে কত রকমেই ফুল সাজাইত, কখনও মন্দিরের চূড়ার মত, কখনও সমস্ত ফুল দিয়া একটী পদ্মের মত সাজাইত। মা দেখিয়া হাসিতেন; বলিতেন "ও হচ্ছে কি তোর? পূজার যোগাড়েই কি সারাদিন কাটাবি নাকি?"

ফুল সাজাইতে বসিয়া অরুণার সেই সমস্ত কথা মনে পড়িত, কখনও অসাবধানে একটী ফুলের উপর নীহারবিন্দুর মত এক ফোঁটা চ'খের জল পড়িত, ফুলটী অপবিত্র হইল মনে করিয়া সে লুকাইয়া ফুলটীকে ফেলিয়া দিত।

পূজার আয়োজন হইয়া গেলে অরুণার ইচ্ছা হইত একবার সুকুমারের নিকটে গিয়া দেখিয়া আসে সে কি করিতেছে; কিন্তু তাহার মনে যতই ইচ্ছা হইত, সঙ্কোচও ততই বাড়িয়া উঠিত। পা আর কিছুতেই চলিতে চাহে না। কতদিন সে সুরবালার সহিত অসঙ্কোচে সে ঘরে গিয়াছে সুকুমারও তখন কত আমোদ করিতেন, কিন্তু এখন যেন সে ঘরের দিকে যাইতে তার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠে।

মা যদি বলিতেন "অরু, সুকুমারের খাবারটা দিয়ে আয়।" অরুণা তখন জলখাবারের রেকাব হাতে করিয়া ধীরে ধীরে সুকুমারের ঘরের দুয়ারে গিয়া

উপস্থিত হইত। চৌকাঠে পা দিলে তাহার বুকের ভিতর কে যেন সজোরে আঘাত করিত,ঘরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা আর তাহার থাকিত না। দুয়ারের কাছে রেকাবিখানি নামাইয়া রাখিবার সময় দেখিত, হয়তো সুকুমার জান্‌লার নিকট ইজি চেয়ার টানিয়া লইয়া একদৃষ্টে বাগানের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, আর না হয়তো টেবিলের কাছে বসিয়া কতকগুলি পুস্তকের পাতা অনর্থক উল্টাইয়া যাইতেছে। তাহার মন যাহা অন্বেষণ করিতেছে, তাহা কোন পুস্তকের ভিতর কিছুতেই মিলিতেছে না।

অরুণা রেকাবি রাখিয়া মাকে বলিত "মা খাবার রেখে এসেছি, কিন্তু তিনি হয়তো দেখিতে পান নাই।"

মা বলিতেন "আ আমার কপাল! তবে তোকে পাঠালুম কি কর্ত্তে?"

কিন্তু পুত্রের একান্ত নির্ব্বাক ভাব দেখিয়া মা কিছু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন; মনে মনে ভাবিলেন—অদৃষ্টে না জানি আরও কি আছে।

(৫)

বিপদের কথা শুনিয়া প্রভাতী মাসিমাকে দেখিতে আসিল। প্রভাতী সুকুমারের মাসতুতো বোন, সুকুমারের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

প্রভাতী নাম যে রাখিয়াছিল, তাহার নাম রাখিবার ক্ষমতা আছে। প্রভাতী আসিয়াই যেন অন্ধকার ঘরে স্নিগ্ধ আলো ফুটাইয়া তুলিল।

সুকুমারের জননী প্রভাতীকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাতীও অনেক কাঁদিল। তাহার পর দাদার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। দাদা জানালার কাছে সোফায় অর্দ্ধশায়িত ছিল, প্রভাতীকে দেখিতে পাইল না।

প্রভাতী কাছে গিয়া কহিল "দাদা আমি এসেছি।"

সুকুমার চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বলিল "প্রভা এসেছিস্? আয়!" বলিয়া প্রভাতীর প্রণত মস্তকে হাত বুলাইয়া দিল।

প্রভাতী বলিল "দাদা জান্‌লার দিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছিলে?"

সুকুমারের শুষ্ক ওষ্ঠে একটু হাসির রেখা পড়িল, বলিলেন "ভাবছিলাম! কি যে ভাবছিলাম তাতো মনে করতে পার্‌ছি না।"

প্রভাতী বলিল "আচ্ছা, আমি এই জানালার কাছে বসে বলে দিতে পারি তুমি কি ভাবছিলে! তুমি ওই পাখীর বাসাটার দিকে চেয়েছিলে—ভাবছিলে অমনি সুখের বাসা আমারও ছিল—ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়েছে।—নয় দাদা?"

সুকুমার প্রভার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল, বলিল "পাখীর বাসার দিকে চেয়েছিলাম বটে প্রভা, কিন্তু কিছু ভেবেছি বলে মনে হয় না।"

প্রভাতী বলিল "দাদা ছাদে চল, ঘরে বসে কি ভাল লাগে? দেখবে কেমন আকাশ, যে দিকে চাও সেই দিকেই আকাশ। দেখে আর ফুরাতে পার্ব্বে না। আর দাদা, তোমার সেতারটা সঙ্গে নাও, অনেক দিন আমি তোমার সেতার বাজানো ও গান শুনি নাই।"

সুকুমার প্রভাতীর কথা শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিল, বলিল, "সুরেশ বাবু ভাল আছেন? অমূল্য কোথায়?"

"সকলেই ভাল আছে। অমূল্য বোধ হয় বাহিরে আছে।"

ছাদের উপর উঠিয়া সুকুমার বলিল, "প্রভা, সত্যি বলেছিস্, যে দিকে চাই সেই দিকেই আকাশ, কোন দিকেই আর শেষ নাই। আকাশেরও শেষ নাই, শূন্যেরও শেষ নাই।"

প্রভাতী মৃদুস্বরে কহিল "কিছুরই শেষ নাই দাদা!"

(৬)

বৈকালে যখন ছাদের উপর সেতার বাজিতেছিল, অরুণা দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সেতারে বাজিতেছিল—

"জনম দিয়াছ মায়ের ক্রোড়ে, পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে,
বেঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে, তুমি ধন্য, ধন্য হে।"

সুকুমার সুন্দর সেতার বাজাইতে পারিত, কিন্তু আজ অনভ্যাস অথবা দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার হাত কাঁপিতেছিল, তবু সেতারের সুরের সঙ্গে তাহার প্রাণ ক্রমে শান্ত হইতেছিল। সেতারে বাজিতে লাগিল—

"আমারে করগো তোমার বীণা লহগো লহ তুলে।"

অরুণার হঠাৎ মনে হইল "আমি যদি বীণা হইতাম!"

সেতার রাখিয়া সুকুমার একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল "হায় ভগবান!"

অমূল্য বেড়াইয়া আসিয়া মাকে না দেখিতে পাইয়া কাঁদিতেছিল, নীচে থেকে প্রভাতীর ডাক পড়িল।

প্রভাতী নীচে নামিতে নামিতে বলিল, "অরুণা, দাদার ঘর এ কি করে রেখেছিস্?" শুনিয়া অরুণার মুখের গোলাপী আভা গাঢ় লাল হইয়া উঠিল।

(৭)

সন্ধ্যার পর সুকুমারের জননী ঠাকুর ঘরে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, প্রভা গিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া বলিল "মাসিমা একটা কথা শুন্‌বে ?"

"কি কথা প্রভা ?"

"দাদার বিয়েটা শিগ্‌গির দাও।"

সুকুমারের বিবাহের কথা শুনিয়া মায়ের চোখের জল উথলিয়া উঠিল। আপনাকে সংযত করিয়া বলিলেন "তাকে বিয়ের কথা বল্‌তে আমার ভরসা হয় না। আর এর মধ্যে তেমন মেয়েই বা পাই কোথা ?"

"কেন অরুণা তো আছে ? অরুণার সঙ্গে বিয়ে দাও না কেন ?"

"সেকি অরুণার সঙ্গে ?"

"কেন মাসিমা তাতে দোষ কি ? অরুণাত দেখ্‌তে বেশ ; স্বভাবও ভাল। তবে কি তুমি গরীব বলে ঘৃণা কর ? ও রোগ তো তোমার আগে ছিল না। 'রাঙ্গা বৌদিকে' তো কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলে !"

গৃহিণী বলিলেন "না মা, তা নয় ! আমি একটু ভেবে দেখি ; সুকুমার কি রাজী হবে ?"

প্রভাতী কহিল "সে ভার আমার উপর !"

(৮)

দিন কতক আর এ বিষয় লইয়া কোন আন্দোলন হইল না। প্রভাতীর অনুরোধে তাহার সঙ্গে সুকুমার প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর যাইত, বোধ হয় তাহার ছাদে গিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছাও করিত।

প্রভাতী তখন অরুণাকে "জল নিয়ে আয়" "খোকার জামাটা দে" ইত্যাদি নানা কৌশলে আহ্বান করিয়া, ছাদে আসিতে বাধ্য করিত। অজানিত ভাবে সুকুমার তাহার হৃদয়ের অনেকখানি অরুণাকে দিয়া ফেলিয়াছিল। একদিন সুকুমার আকাশের ধ্যানে মগ্ন, অমূল্য তাহার পার্শ্বে বসিয়া মামার সেতারটী দখল করিয়া নিজের সঙ্গীত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রভা হাসিয়া বলিল "দাদা আকাশ থেকে একবার মাটিতে নামিবে কি ?

সুকুমার বলিল "কেন রে প্রভা ?"

"তুমি একদিন আমায় বলেছিলে, স্বার্থপরতায় মন ছোট হয়ে যায়, আর পরার্থপরতায় মনের প্রসার বাড়ে? মনে পড়ে,—"

"তুই সেই কথা এখনো মনে রেখেছিস?"

"তোমার কথা কি ভুলি? তুমি বলেছিলে—প্রিয়জনই আমাদের উপাস্য দেবতা, তাঁদের উপাসনায় আমরা ঈশ্বরের উপাসনা শিখি!"

"সে ত ঠিকই?" বলিয়া সুকুমার একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিলেন।

"তুমি বলেছিলে, মনের প্রসারতা আমাদের যত বাড়ে, ততই আমরা প্রিয়জনকে বেশী করে পাই; যে আগে প্রিয় ছিল না সেও প্রিয় হয়ে ওঠে ও সেই সঙ্গে ভগবানকেও পাই। আবার মন যত ক্ষুদ্র হয়ে আসে, উপাস্যকেও তত ক্ষুদ্র করে ফেলি, এমন কি হয়ত সময় সময় হারিয়েও ফেলি। তুমি কি এখন সে কথা ভুলে যাচ্ছ দাদা?"

"ভুলব কেন, সে ভুলে কি আর মানুষ মানুষ থাকে।"

"তবে কেন তুমি দিবানিশি আপনাকে নিয়েই আছ, আপনার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আপনাকে ছোট করে ফেল্‌ছো দাদা। তোমায় একটী কথা বলি তুমি আমার কথায় রাগ করো না, নিজেকে নিয়ে তুমি এতই ব্যস্ত যে অন্য কাহারও কথা ভাব্‌বার অবসরও পাও না। দাদা, আমাদের অরুণার কথা ভাববে কি কেবল তার বিমাতা? তুমি কি তার কেউ নও, না সে আমাদের কেউ নয়?"

(৯)

পরদিন দ্বিপ্রহরে সুকুমার ঘরে নাই দেখিয়া অরুণা নিঃশব্দে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। সুকুমারের টেবিল গুছাইয়া বইগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সুকুমার তখন বাহিরের বারান্দায় অস্থিরচিত্তে পাদচারণা করিতেছিল, সহসা ঘরের নিকট আসিয়া অরুণাকে দেখিতে পাইল। দেয়ালে সুরবালার একখানি ফটো ছিল অরুণা টেবিলের উপরের ফুলদানি হইতে ফুল লইয়া তাহারই চারিপাশে সাজাইতেছিল। প্রভার পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যার কথার পর যেটুকু বাকি ছিল একটীমাত্র রেখাপাতে প্রকৃতি তাহা অলক্ষ্যে ফুটাইয়া দিয়া গেল। অরুণা সুকুমারকে দেখিতে পাইল না। সুকুমার নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া মায়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মা তখন হবিষ্য চড়াইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সুকুমার বলিল, "মা তুমি এখনও রান্না চড়াও নাই?"

মা বলিলেন, "আর কি আমার রাঁধার তাড়া আছে? খাওয়া হলে তুই আর সুরো আমার পাতে খাবি বলে কতই তাড়াতাড়ি করিতাম। মা আমার হাতে হাতে সব গুছিয়ে দিত। যেদিন সুরো গিয়েছে সেদিন থেকে তুইও আর এ ঘরের ছাওয়া মাড়াস্ নি।"

সুকুমারের চক্ষুর পল্লব আর্দ্র হইল। আজ প্রথম তাহার চোখে জল আসিল। সুকুমার বলিল "মা, তুমি আমায় ডেকেছিলে?"

"হাঁ বাবা একটী কথা আছে, কিন্তু তোমাকে বল্‌তে আমার ভয় হয়।"

"বুঝেছি। আমারও তোমার কাছে আস্‌তে সেই জন্য ভয় হ'ত, কিন্তু সে ভয়ের আর কারণ নেই। প্রভা কাল সন্ধ্যাবেলায় আমায় যে জ্ঞান দিয়েছে তাতে সে ভয় ভেঙ্গে গেছে।"

মায়ের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুকুমার আপনার ঘরে প্রবেশ করিল। অরুণা তখনও ছবিতে ফুল সাজাইতেছিল। সে সুকুমারের পায়ের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল। তাহার পর সঙ্কুচিত ভাবে ঘর হইতে চলিয়া গেল। কেঁহ কথা কহিল না, কিন্তু নিমেষের জন্য চারি চক্ষুর মিলন হইল। সেই চাক্ষুষ মিলনের নীরব ভাষায় তিনটী হৃদয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়া গেল।

(১০)

আজ অরুণার ফুলশয্যা। বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল প্রভাতী। মা বলিলেন "প্রভা তোর দাদাকে ডেকে এনে ফুলশয্যা করা; রাত যে ঢের হয়ে গেল" প্রভা সুকুমারকে ডাকিতে বাহিরের ঘরে গেল; গিয়া দেখিল সুকুমার একখানি ছবি হাতে করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। প্রভা ডাকিল "দাদা এস"—সুকুমার চাহিয়া দেখিল। প্রভা দেখিল তাহার দুই চক্ষু জলে ভরা। প্রভা আবার বলিল "দাদা, আজ এ শুভ রাত্রে তোমার চোখে জল কেন?" সুকুমার বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল "প্রভা, তোর নাম প্রভাতী কেন?"

শ্রীনির্ঝরিণী দাসী।

দেশীয় ধনশাস্ত্র।

দেশীয় ধনশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ জাহ্নবীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে। দেশীয় ধনশাস্ত্রের কথা অনেক এবং তাহার সকল কথাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইউরোপের দেশীয় ধনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ঐ শাস্ত্রের যে সকল

মূল নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের অনেকে পড়িয়া থাকেন। আমার যতদূর ধারণা তাহাতে এইরূপ পাঠে এ দেশের লোক-দিগের উক্ত শাস্ত্র আলোচনায় আমাদের দেশের কোনই উপকার হয় না; বরং তাহাতে অনেক পরিমাণ অপকার হইয়াছে। ইউরোপীয় ধনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ স্বাধীন দেশের লোক; তাঁহারা দেশের স্বাধীন অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ঐ শাস্ত্রের নিয়ম ও প্রণালী বুঝাইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের মুখে Free Trade বা অবাধ বাণিজ্যের প্রশংসা ও গৌরব ধরে না। সেই সব কথা পড়িয়া আমাদের দেশের লোকে অবাধ বাণিজ্যের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। ফলে আমাদের যে অবস্থা তাহাতে অবাধ বাণিজ্যের বিপরীত যে সকল নিয়ম তাহার আশ্রয় লওয়াই প্রকৃত পক্ষে ফলদায়ী। ভারতে ব্রিটিশরাজ্য সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বেও ভারতের ধন সময়ে সময়ে পশ্চিমোত্তরপ্রদেশীয় লোকের দ্বারা লুণ্ঠিত হইত। বর্ত্তমান ব্রিটিশরাজ কর্ত্তৃক ধনশোষণ (Drain) যেরূপ নিয়মিত ও অবচ্ছিন্ন রূপে হইতেছে পূর্ব্বে তদনুরূপ হইত না বটে কিন্তু মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু হইত। এইরূপ শোষণের বিষময় ফল আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশেষ বুঝিয়াছিলেন; তজ্জন্যই তাঁহারা আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্য (International Free Trade) চালান ভারতের পক্ষে অমঙ্গলকর স্থির করিয়াছিলেন। বিদেশী কর্ত্তৃক ধনশোষণের বিষময় ফল নিবারণের একমাত্র উপায় আন্তর্জ্জাতিক অবাধ বাণিজ্য রহিত করা; সুতরাং আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভারতবাসীদিগের পক্ষে কালাপানি পার হওয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আমাদিগের রাজপুরুষগণ অনেক সময় জাঁক করিয়া বলেন ভারত কিসে দরিদ্র। ভারতের এত অধিক পোতবাহী বাণিজ্য (Sea-borne Trade) এবং হয়ত আমরাও অনেক সময় মনে করি যে এত পোতবাহী বাণিজ্যের দ্বারা আমাদের উপকার হইতেছে; কিন্তু তলাইয়া দেখিলে এক মুহূর্ত্তেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এই পোতবাহী বাণিজ্যের আধিক্যই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। এইরূপ পোতবাহী ও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য না থাকিলে আমাদের দেশের কেবল টাকাকড়ি বিদেশীরা লইয়া গিয়া তত ক্ষতি করিতে পারিত না। এইরূপ আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্য না থাকিলে, আমরা হয়ত স্বর্ণ-রৌপ্যহীন হইতাম কিন্তু আমাদের প্রকৃত ধন ধান-চালের অভাব হইত না; এবং নিয়ত যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেশে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহাও থাকিত না। অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য স্বাধীন

জাতির পক্ষে যারপর নাই মঙ্গলকর বস্তু; কিন্তু আমাদের পক্ষে উহা যারপর নাই অনিষ্টকর। কীর্ত্তনের একটী গানে আছে—

ব্রজের সকলি উলট।

ভারতের ধনশাস্ত্র সম্বন্ধে সেইরূপ সকলি উলট। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা দেশীয় ধনশাস্ত্রের তত্ত্ব জানেন বলিয়া দাবী করেন তাঁহাদের মুখে এই কথাটী খুব অল্প শুনিয়াছি। অথচ এই কথাটীর প্রকৃত উপলব্ধিই যে আমাদের অস্তিত্বরক্ষার একমাত্র উপায় তাহা কেহ ভাবেন না। তাই বলিলাম যে—আমাদের দেশের লোকদিগের ইউরোপীয় ধনশাস্ত্র আলোচনায় আমাদের দেশের কোন উপকার হয় না, বরং তাহাতে অপকারই হইয়া থাকে।

তাহার পর আর একটী কথা সংক্ষেপে বলি—ইউরোপীয় ধনশাস্ত্রে মূলধন (Capital) এবং শ্রম বা জন (Labour) এই দুটী বিষয় বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। সম্প্রতি লণ্ডনস্থ টাইমস্ পত্রিকায় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাহার মূল বিষয় এই—ভারতবর্ষে একত্রীকৃত মূলধনের (Accumulated Capital) অস্তিত্ব নাই; ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে একত্রীকৃত মূলধনজাত কলবলের ব্যবহার নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়গণ উপযুক্ত পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে অক্ষম। টাইমস্ বলেন ইহাই ভারতবর্ষীয়গণের দুরবস্থার প্রধান কারণ। ঐ দুরবস্থা ইংরাজ-শাসনজনিত কোন কারণে উদ্ভূত নহে। কথাটী শুনিতে অনেকেরই যুক্তিগত বোধ হইবে কিন্তু প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য ভারতবর্ষীয়গণের একত্রীকৃত মূলধনের অভাব কেন? যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশে জলের মতন যাইতেছে সে দেশে মূলধন একত্রীকৃত (Accumulated) হইবে কি করিয়া। এ কথাও ছাড়িয়া দেওয়া যাক্; কিন্তু আর একটী কথা এই, ভারত যখন ধনে পূর্ণ ছিল এবং যখন ভারতবর্ষীয়গণের সুখসম্ভোগের পরাকাষ্ঠা ছিল তখন কি ভারতে একত্রীকৃত মূলধন কোথাও ছিল? ভারতে একত্রীকৃত মূলধন কখনও ছিল না? ভারতে মূলধন ও শ্রম কখনও ছিল না। ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ধনোৎপাদনকারী ছিলেন। প্রতেক ব্যক্তি স্বাধীন, নিজেই শ্রমজীবি, অপর শ্রমজীবিকে নিযুক্ত করিতে হইত না। প্রত্যেক পরিবারস্থ ভাইভগ্নী পুত্রকন্যা সেই পরিবারের কারবারের (Concern) শ্রমজীবি ছিলেন। ভারতবর্ষে কুলী (Labourer) নামক পদার্থ আদৌ ছিল না; সুতরাং মূলধনের আদৌ প্রয়োজন হয় নাই। কৃষিজীবিগণ প্রত্যেকেই

স্বাধীন ভাবে কৃষিকার্য্য করিত। শিল্পিজীবিগণ প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে শিল্পকার্য্য—করিত; চাষী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, মালাকর সূত্রধর প্রভৃতি প্রত্যেকেই আপনি আপনার কর্ত্তা ছিল। এ দেশে ধনোৎপাদনের সম্বন্ধে—দাসত্ব একেবারেই ছিল না। টাইমস্ বলিবেন এমন কি ইঙ্গিতেও বলিয়াছেন যে এইরূপ অবস্থা জনসমাজের সুখের বিষয় হইতে পারে বটে কিন্তু একত্রীকৃত মূলধন না থাকিলে অধিক পরিমাণে ধনোৎপাদন হইতে পারে না। এটা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সহজেই দেখা যাইবে যে একথা সত্য নহে। মূলধন একত্রীকৃত হইলে কলবলের সাহায্যে ধনোৎপাদন সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হয় তার সন্দেহ নাই; কিন্তু অপরদিকে ধন ও জনের সংযোগে যে অর্থ উৎপন্ন হয় তাহাতে জনশক্তির প্রকারান্তরে অপব্যয়ই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ ব্যবস্থান্তর থাকিলে জনশক্তি যে পরিমাণে নিয়োগ করিতে পারা যাইত তাহা ঘটিয়া উঠে না। মজুর কারখানায় গিয়া কাজ করিলে সে কেবল তার নিজের শক্তি অনুযায়ী ধনোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু গৃহে কার্য্য করিলে সে তাহার পরিবারস্থ প্রত্যেক সমর্থ লোকের সাহায্য পাইতে পারে। এই কারণে দেশের যে পরিমাণে ধনোৎপাদন হইতে পারিত তাহা হয় না। সুতরাং এ অনুপাতে হিসাব করিয়া দেখিলেও জনের তুলনায় ধন অনেক কম উৎপন্ন হয়। তাহার পর কুলীরা কোন কারখানায় গিয়া দাসরূপে চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে কার্য্য করে সে কার্য্যের সহিত তাহাদিগের বিশেষ কোন সাহানুভূতি থাকে না। নিজের গৃহে অনুষ্ঠিত যে কার্য্যের তাহারা নিজে কর্ত্তা, এবং যে কার্য্যের দায়িত্ব তাহাদের সম্পূর্ণ নিজের, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের কি তুলনা হইতে পারে? বাড়ীতে নিজে নিজের কর্ত্তা হইয়া নিজের আবশ্যকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লোকে সুখের সহিত হৃষ্টচিত্তে যে কার্য্য করে তাহার কি তুলনা হইতে পারে? শেষোক্ত প্রকার কার্য্যে অনেক অধিক পরিমাণ ধনোৎপাদন হয়। স্বাধীন ভাবে স্বকীয় কার্য্যে লোকে দিন-রাত্রি বিবেচনা করে না, ইহাতে তাহাদের সময়াসময়ের জ্ঞান থাকে না। সুতরাং কলবলের সাহায্যে যে সাশ্রয় (Economy) হয় তাহাপেক্ষা এইরূপ আপনার বলিয়া যে কার্য্য করা হয় তজ্জনিত ধনোৎপাদনে অধিক সাশ্রয় হয়। এই জন্যই ভারত কলবল (Machinery & Contrivance) মূলধন (Capital) এবং জন বা শ্রম (Labour) বিনাও এত সমৃদ্ধিশালী ও সুখী ছিল। আমাদের

কর্ত্তব্য,—সেই অবস্থা পুনরায় সংস্থাপনের চেষ্টা করা। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে। সুতরাং চেষ্টা করিলেই তাহা আমরা অবশ্যই পারিব। আমাদের এই বর্ত্তমান স্বদেশীকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং স্বদেশীই আমাদের একমাত্র উপায়। এই ব্রিটিশ-শাসন কলিতে স্বদেশী মহামন্ত্রই কেবল উপায়—আর অন্য গতি নাই।

শ্রীকিশোরীলাল সরকার।

ফেউ

আচ্ছা ফেউ পিছু লেগেছে,—মুহূর্ত্তের জন্যও আমার নিস্তার নাই। যে-খানেই কেন যাইনা'ক ফেউ আমার পাছু ছাড়ে না। ফেউয়ের দৌরাত্ম্যে আমার আর শান্তি নাই—আমি হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হ'য়ে উঠেছি।

বাজারে গেলুম,—ইচ্ছা দু'টা মুরগির আণ্ডা লইব। ওমা, চেয়ে দেখি, ফেউ বেটা আমার সঙ্গে। যেমনি আণ্ডায় হাত দিয়েছি অমনি বেটা মহা চীৎকার ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, "মুরগির ডিম কিন্‌ছে গো,—জাত-ধর্ম্ম আর রাখ্‌লে না গো।" বস্—ডিম পড়ে রইল—আমি সরে দাঁড়ালুম।

কন্‌কনে শীত, রাস্তা হাঁট্‌তে আর পারি না; ভাবিলাম এক গ্লাস হুইস্কি টানি। শরীর রক্ষার্থে এই সাধু সঙ্কল্প মনে মনে এঁটে শুঁড়ির দোকানে ঢুকিলাম। সবে ঢুকেছি মাত্র, আর ফিরে দেখি কিনা, ফেউ বেটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছে। তা'কে দেখে আমার হাড় জ্বলে গেল; আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না—হুইস্কি না টেনেই চম্পট দিলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, পথের ধারে সারি দিয়া বারাঙ্গণাদল। তা'দের মধ্যে একটা মেয়ের বেশ নধর শরীর—প্রফুল্ল মুখ—টানা চোখ। ভাবিলাম একটু আমোদ করা যা'ক। আমোদ কি আর আমার কপালে আছে!—পিছন ফিরে দেখি, সেই ফেউ বেটা! বেটা আবার ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে ইঙ্গিতে—আমাকে সতর্ক কর্‌ছে। ভাবিলাম বেটাকে আচ্ছা করে পয়জার পেটা করি; কিন্তু সাহস হ'ল না।

গৃহিণীর আদেশে বাজারে বেরিয়েছি। চুড়ি, এসেন্স, সাবান—নানাবিধ ফরমাজ। দেখিলাম, বিলাতী জিনিষগুলা দেখিতে ভাল, দরেও সস্তা। স্বদেশীর আমি একজন মস্ত পাণ্ডা হইলেও গোপনে বিলাতী জিনিষগুলা

কিনিতে ইচ্ছা করিলাম। চারিদিক চাহিয়া ভয়ে ভয়ে, খাঁটি বিলাত-জাত দ্রব্যসম্ভার পকেট-জাত করিতেছি, এমন সময় ও বাবা গো, আবার সেই বেটা! আমি জিনিষ ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে চাঁদনি হইতে নিক্রান্ত হইলাম।

এই স্বদেশীর দিনে নাম কিনিবার আশায় (পয়সার লোভটাই বেশী) একটা স্বদেশী হাট বসাইলাম। জেলার সাহেব চো'খ রাঙ্গাইয়া 'টাইটেল' কাড়িয়া লইতে চাহিল। আমি ছাঁকা বিদেশী ভূষায় সজ্জিত হইয়া—সাহেবের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া সাহেবকে শান্ত করিতে জুড়ি হাঁকাইয়া চলিলাম। গাড়ীতে উঠে দেখি, ফেউ বেটা আমার আগে গাড়ীতে উঠে বসে আছে। আমাকে দেখিয়াই সে চোখ রাঙ্গাইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "আমি সকলকে বলিয়া দিব, তুমি গোপনে দেশের স্বার্থ বেচিতেছ।" আমার আর যাওয়া হ'ল না,—আমি বাড়ী ফিরিয়া অগত্যা স্বদেশী সাজিলাম।

স্ত্রী চিররুগ্ন দেখিয়া ভাবিলাম একটা বিবাহ করি। স্ত্রী কাঁদিয়া কাটিয়া বলিল, "ওগো, দু'দিন অপেক্ষা কর—আগে আমি মরিয়া যাই।" আমি শুনিলাম না,—একটা ষোল বছরের দুগ্ধালক্তকনিন্দীবরণা পিনোন্নত-পয়োধরা আমার লক্ষ্য। আমি কি তখন পরিবারের কান্না দেখে ভুলি? আমি মহা উৎসবে বর সাজিলাম। টোপর মাথায় দিয়া ছাদ্‌লাতলায় উপস্থিত। কাপড় ঢাকা দিয়া যখন ক'নের মুখ দেখিলাম, তখন ক'নের পাশে আর একজনকে দেখিলাম। সে কে বুঝেছ? সে আমার চিরভীতি ফেউ বেটা। বেটা গম্ভীর বদনে অঙ্গুলি হেলাইয়া আমাকে বলিল, "ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির বাসনায় এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও?" আমি সেখানে দাঁড়াইলাম না,—কাপড় ফেলিয়া দিয়া একছুটে গৃহে আসিলাম। আমার কপালে দুগ্ধালক্তকনিন্দীবরণা আর জুটিল না।

আপিষের ক্যাশ আমার জিম্মা। ভাবিলাম, কিছু টাকা ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যতের সুরাহা করি—সাহেবের বাবাও কিছু জানিতে পারিবে না। একদিন নিরিবিলিতে লোহার সিন্দুকের ডালা খুলিলাম। নোটের তাড়ায় হাত দিতেছি, এমন সময়—বাবা গো—দেখি কিনা সেই বেটা সিন্দুকের মধ্যে বসে চোখ রাঙ্গাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। আমি ভবিষ্যতের সুব্যবস্থার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া রিক্ত-হস্তে চম্পট দিলাম।

তাই বলিতেছি, এই ফেউ বেটার জ্বালায় আমার কোন সুখ-শান্তি নাই। অহরহ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আমার বাড়া ভাতে ছাই ঢালিতেছে। যখনই

পাঁচ ইয়ার সঙ্গে লইয়া কোন বিলাস-মন্দিরে একটু আমোদ করিতে যাইব মনে করিতেছি, অথবা কাহাকেও ফাঁকি দিয়া দু' পয়সা উপায় করিবার চেষ্টা করিতেছি, তখনই এই কেউ বেটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার বাসনার অন্তরায় হয়। হাঁ গা, কেউ বেটাকে তাড়াইবার কোন ওষুধ-টষুধ তোমরা জান গা, আমি যে অস্থির হ'য়ে পড়েছি—শয়নে-ভোজনে, স্বদেশী-আন্দোলনে কোথাও শান্তি পাই না। বেটা আজীবন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছে—জীবন ভোর আমাকে জ্বালাইয়া মার্‌ছে। হাঁ গা, জীবন অবসান না হ'লে কি এর হাত হ'তে আমার পরিত্রাণ নাই? ভগবান, শৈশব হইতে এ কা'কে আমার সঙ্গে জুটাইয়া দিয়াছ? আমি ছাড়িতে চাহিলে, এ যে আমায় ছাড়ে না! যখন বিপথে পা বাড়াই তখনই আমাকে সতর্ক করিয়া সুপথে আনে। এ কে প্রভু? এ কে প্রভু, উপদেষ্টা হ'য়ে সকল সময়ে আমাকে উপদেশ দেয়? দয়াময় বিশ্বনাথ তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যেন শয়নে-বিচরণে, সম্পদে-বিপদে সকল সময় এই উপদেষ্টা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে—আমি ছাড়িতে চাহিলেও যেন আমাকে না ছাড়ে।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ডাকঘর।

তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, ডাকঘর। আমি দুমকার জঙ্গলে বসিয়া সম্পাদক মহাশয়কে একখানা পত্র লিখিলাম, তুমি ঝমর ঝমর করিয়া বহিয়া লইয়া চলিলে। পাহাড়-জঙ্গল কিছুই মানিলে না—ঝড়-বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করিলে না,—নিয়মিত সময়ে পত্রখণ্ড কাঁকালে করিয়া তাঁহার সমীপে হাজির হইলে। তিনি হয়ত সে সময় কাগজের প্রুফ দেখিতেছিলেন; এমন সময় তুমি বায়স-নিন্দী কণ্ঠে হাঁকিলে, "বাবু, চিঠি আছে।" বাবু লেফাফা খুলিয়া দেখিলেন,—প্রণয়-পত্র নয়—একটা প্রবন্ধ। তিনি তৎক্ষণাৎ মহা বিরক্তি সহকারে "Rubbish, nonsense" বলিয়া লেফাফা দূরে নিক্ষেপ করিলেন!

মলয়ানিল-সেবিত, বিহঙ্গমকূজিত, সরিৎপ্রফুল্ল পুষ্পোদ্যান মধ্যে বসিয়া ভাবিলাম স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখি। তিনি তখন অনেক দূরে—তাঁহার পিতার সঙ্গে বৈদ্যনাথে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন। আমি বিরহাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। মাথার উপর অনন্ত-বিস্তৃত কোমল নীলা-

কাশ—পদনিম্নে নীল দর্পণ তুল্য স্বচ্ছ জলরাশি, আমার আশে-পাশে গগন-মধ্যগত নক্ষত্রবৎ গোলাপ, মল্লিকা, বিগ্নোনিয়া। অঙ্গের উপর—প্রণয়িনী হস্তাধিক কোমল স্পর্শে মলয় মারুত বহিয়া যাইতেছে; চারিদিকে ভ্রমর গুঞ্জন। আমি কণ্টকিত দেহে এই বসন্ত-অধিষ্ঠিত পূর্ণবিকসিত রাজ্য মধ্যে বসিয়া পূর্ণযৌবনা প্রণয়িনীকে পত্র লিখিতে বসিলাম।

ডাকঘর, তুমি আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া দুইটী পয়সা মাত্র রাস্তা-খরচ সম্বল করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলে। নন্দন পাহাড়ের উপর যেখানে বসিয়া আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়রাণী সুদূর আকাশ প্রান্তে চাহিয়া বিরহের তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়িতেছিলেন, তুমি সেইখানে পত্রের সহিত আমার বিরহ নিঃশ্বাস বহিয়া লইয়া হাজির করিলে। কমলদল-বিনিন্দিত কোমল হস্তে গৃহিণী (ছিঃ গৃহিণী নয়) প্রণয়িনী পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন; আবার চম্পককলি-নিন্দী ক্ষুদ্র অঙ্গুলীনিচয়ে লেখনী ধরিয়া আমাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। তুমি তাহাও আবার আমার কাছে বহিয়া আনিলে।

এ অসার খলু সংসারে চাকুরির মত কিছু নাই। ভাবিলাম, একটা চাকুরী করি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতে থাকিলাম। যেখানে কর্ম্মখালি দেখি সেইখানেই আমার মন, কুসুমমধু-লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। দেখিয়া শুনিয়া একটা দরখাস্ত লিখিলাম। লেফাফায় আঁটিয়া তোমার হাতে দিলাম, তুমি বিনা ওজরে তাহা গ্রহণ করিয়া কিছু জলপানির আশায় আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলে। আমি দুইটী পয়সা দিলাম; তুমি কাতর মুখে বলিলে, "বাবু, লেফাফাটা বড় ভারি, আর দুইটা পয়সা পাইলে ভাল হয়।" আমি তাহাই দিলাম। তুমি তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল বদনে আমার পত্র লইয়া ছুটিলে।

তাই বলিতেছিলাম ডাকঘর, তোমার গুণ অনেক; তোমার তুলনা সংসারে বিরল। আমার প্রেয়সীর যত গুণ, বুঝি তোমারও তত। অতএব সরিয়া এস, তোমার স্তুতিগান করি। অয়ি রেল-ষ্টীমার-গামিনি, প্রেমপত্র-প্রবন্ধ-আবেদনবাহিনি, তোমাকে নমস্কার। তোমার ঊর্দ্ধে নমস্কার, তোমার অধদেশে নমস্কার, তোমার সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাৎভাগে নমস্কার, চারিদিকে নমস্কার। তুমি স্থল-জল-ব্যোম ব্যাপিয়া আছ। কখন স্তম্ভরূপে নিশ্চল অবস্থায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাক, কখন বা গৃহ-প্রাচীরে দেহ সংগোপন পূর্ব্বক উষ্ট্রবৎ ওষ্ঠদ্বয় ব্যাদন করিয়া স্ফীতোদরে বসিয়া থাক। তুমি

কখন যন্ত্রমুখে বসিয়া তাড়িত ছুটাও, কখন বা জাহাজে উঠিয়া পৃথিবী বেড়াও। তুমি কখন ঝমর ঝমর শব্দে মল বাজাইয়া পথ হাঁটিয়া চল, কখন বা রেলপথ অবলম্বন করিয়া মেঘ গর্জ্জনবৎ হুঙ্কারশব্দে জল-স্থল প্রকম্পিত করিতে করিতে উল্কাগতিতে ছুটিয়া চল। তোমার মহিমা অপার, এ সংসারে তুমি সকলই পার।

সকলই পার কি ডাকঘর? আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস, অন্তিমের আবেদন বহিয়া লইয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণে পৌঁছিয়া দিতে পার কি, ডাকঘর? আমার সম্পদ, ঐশ্বর্য্য যা কিছু আছে সকলই তোমাকে দিব, তুমি আমার নিরুদ্ধ হৃদয়-ব্যথা একবার সেই সর্ব্বদুঃখ বিনাশনের চরণে পৌঁছিয়া দিয়া এস। অনন্তকাল হইল সেই অনন্তধাম ছাড়িয়া আসিয়াছি, যুগ যুগান্তর বহিয়া গেল, তবু সে পিতৃগৃহের কোন সংবাদ পাইলাম না; তুমি একবার বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া গিয়া সেখানকার সংবাদ আনিয়া দেও, আমার প্রাণের ব্যথা পরম পিতার চরণে নিবেদন করিয়া এস, পার যদি, একবার শুধাইয়া এস, কতদিনে আবার পিতৃগৃহে ফিরিতে পাইব। কোডে গাইডে দেখিয়াছি, তুমি সর্ব্বস্থানে যাইতে পার; সমুদ্রের ভিতর, অন্তঃরীক্ষে, সর্ব্বস্থানে তোমার যাতায়াত। তবে হে ডাকঘর, তোমার পায়ে ধরি আমার একখানি প্রেম-পত্র, একখানি সকরুণ আবেদন বহিয়া লইয়া আমার পিতার চরণে পৌঁছাইয়া দিয়া এস। পার না কি, ডাকঘর?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজেশ্বর-মঙ্গল। *

(স্তোত্র)

১

কি আর ফুকারি! কি আর উচ্চারি! ওহে রাজরাজেশ্বর!
আমি মাত্র বাঁশী, হে ব্রজবিলাসী, তুমিই মুরলীধর!
গাহিতে জানিনা, বাজিতে জানিনা, আমি শুধু জড়-বেণু;
অধর-পল্লবে ধর আজি মোরে, বেণুর এ প্রতি রেণু
হোক প্রীতিময়, হোক গীতিময়,—ঝরুক অপূর্ব্ব গান,
ঝঙ্কারি উঠুক শতেক পাপিয়া, শত শ্যামা মুগ্ধ-প্রাণ!
এই বিশ্ব হোক নব বৃন্দাবন! গোপগোপী তালে তালে
নাচুক অঙ্গনে, ধরাধরি হাত,—এ মাতালে ও মাতালে!
অঙ্গে পীতধড়া, শিরে শিখীচূড়া, বিশ্ববিমোহন বেশে,
নর নারীদের মন কর চুরি হাব-ভাবে হেসে হেসে!
প্রেমে গর গর, অঙ্গ থর থর, এস এস নদীয়ায়,
দুটী বাহু তুলি, নাচিতে নাচিতে, এস এস গোরারায়!

২

কি দারুণ শীত! কঠিন তুষার ছাইয়া ফেলেছে বিশ্ব।
তরুলতা সব নীরস, বিবশ, একি নিদারুণ দৃশ্য!
ফুল নাহি ফোটে, অলি নাহি ছোটে, পাখী নাহি করে গান,
প্রেম-সরোবরে সোহাগ-সরোজ হইয়াছে ঘোর ম্লান!
হে চির বসন্ত, এস এস আজি, বসন্তকুমারী বেশে;
রাধা বেশে এস, সাজি আহ্লাদিনী, বনফুল পরি কেশে!
তোমার চরণে রজত-নূপুর নাচুক্ গো রুনু-রুনু;
শিহরি উঠুক পলকে এ ধরা পুলকে বিহ্বল তনু!
বসোরা গোলাপ ফুটিয়া উঠুক যেন লাবণ্যের ধারা;
'বউ-কথা-কও' ঝঙ্কারি উঠুক গানের ফোয়ারা প্যারা!

---

* গীতার দশম অধ্যায়ে, নিজ বিভূতি-বর্ণন কালে, শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন;—"হে আমাকে নরাধিপ বলিয়া জানিও।"

চির বসন্তের প্রেম-রাজ্য মাঝে এস বসন্তের রাণি!
জুড়াক ধরিত্রী, বুকে ধরি আহা, তব রাঙা পা দুখানি!

৩

একি রে দুর্ভিক্ষ! "হা অন্ন"-"হা অন্ন"-রব নাহি ভাল লাগে!
এস নারায়ণ, অন্নপূর্ণা-রূপে, দাস এই ভিক্ষা মাগে!
চারু শাঁখা হাতে, এস মহাদেবি, ঝল্‌মল চেলী অঙ্গে;
ক্ষুধার্ত্তের পাতে সুস্বাদু পায়স ঢাল ঢাল মহারঙ্গে!
ওগো সুধাময়ি, যে অন্ন ভখিলে, চিরতরে মিটে ক্ষুধা;
ওগো স্নেহময়ি, হাসিয়া হাসিয়া দাও সেই ভক্তি-সুধা!
আনন্দ-কিরণে আমা সবাকার হাসুক নয়ন-তারা;
ক্ষীণ অঙ্গে মাগো নাচুক খেলুক উদ্দাম বিদ্যুৎ-ধারা!
প্রেমাশ্রু-সলিলে হইয়ে বিধৌত লাবণ্যে ভাতুক্‌ কান্তি;
আজন্ম বিকল দুরু দুরু হিয়া, লভুক্‌ অতুল শান্তি!
চুষিকাটি দিয়া আর মা আর মা সন্তানে দিস্‌নে ফাঁকি;
স্তন্য সুধা দে মা,—ঘোর দুর্দ্দশার আর কিছু নাহি বাকি!

৪

এস বনমালি, হরিপ্রিয়া-সাজে, কণ্ঠে পরি বনমালা;
সীমন্তে আশোক, শ্রবণে কদম, ভুজে অতসীর বালা!
ফুলে ফুলে ফুল্লা, এস ফুলময়ি, লীলাপদ্ম ধরি করে,
সঞ্চারিণী কোন বন-ভূমি যেন;—ফুল শোভে থরে থরে!
যেখানে পা পড়ে সে খানেই, মরি, ভক্তি-উপবন হয়!
কুঞ্জে কুঞ্জে আহা, হয় হরিধ্বনি, নয়নে প্রেমাশ্রু বয়!
ওগো হরিপ্রিয়া হাসিয়া হাসিয়া, সৃজ রম্য কুঞ্জবন,
চারুচন্দ্রে আহা বসাইতে মরি পাত প্রীতি-সিংহাসন!
যুগল মূরতি নিরখি নিরখি, আমরা জুড়াব আঁখি;
নাচিব গাহিব, আনন্দে মাতিব, অনুরাগ অঙ্গে মাখি!
সুধাংশুরে হেরি জলধির যথা আনন্দ ধরে না বুকে,
চারুচন্দ্রে হেরি, প্রেমবন্যা মরি, উথলি উঠিবে সুখে!

৫

ওগো কমলিনি, সতী-কুলমণি! হৃদয়-মন্দির-মাঝে
সতীশের সঙ্গে, উর আসি রঙ্গে, মত্ত-আহ্লাদিনী সাজে।
রাধালতা যেন তমালে বেড়িয়া ফুলে ফুলে ফুলময়,
রোহিণী যেন গো সুধা-করে পাই আলোকে আলোকময়।
যুগল মূরতি, দীপ জ্বালি আহা, প্রেমানন্দে নেহারিব;
আরতি করিয়া সুন্দরীসুন্দরে পুষ্পমালে সাজাইব!
পূর্ণশশী যেন যমুনার জলে দুলিছে নাচিছে মরি!
ঊষার ললাটে বালার্কের ছটা যেন রে পড়িছে ঝরি!
সোনার অতসী মিশায়ে কৌশলে গেঁথেছে ঝুমুকাহার!
চম্পকের হারে অপরাজিতায় বলিহারি কি বাহার!
যুগলেতে এক, একেতে যুগল, কি আর বলিব আমি?
জনমে জনমে, হৃদয় মন্দিরে, নিশিদিন থেক স্বামি!

৬

শঙ্খ চক্র গদা, পদ্ম হাতে ল'য়ে এস, এস হে কেশব!
চতুর্ভুজ-বেশে ওহে লীলাময় নিনাদি ভৈরব রব!
জ্ঞান-ভক্তি-যোগ, শিক্ষা দাও আসি, মূর্ত্তিমতী গীতা-বেশে;
মায়াবন্ধ নাথ, প্রেম-অসি দিয়া, কাট আসি হেসে হেসে,
কিম্বা এস হরি মুরলী বাজায়ে, ধরিয়া মোহন রূপ;
নরনারী সব হোক জ্ঞানহারা হেরি রূপ অপরূপ!
নিজেই দেবতা, নিজেই পূজারী সাজি ভক্ত হরিদাস,
নাচ গাও রঙ্গে বিগ্রহের আগে পরকাশি মহোল্লাস!
জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, এক হয়ে যাক্; বীজ মাঝে যথা রয়
শাখা ও পল্লব! (একি ভোজবাজি!) ফলফুল সমুদয়!
অরূপে স্বরূপে, জীবব্রহ্ম রূপে, ভেদ জ্ঞান নাই, নাই!
আমার আমিত্ব ঘুচে যাক্ হরি তোমার তুমিত্ব পাই!

৭

এস হে সুন্দর, কচি বনলতা,
বালিকা সীতার সাজে,
নাকেতে বেশর, গলে দোলে হার,
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে!

অবনী অবাক, প্রেমেতে বিভোর,
হেরি দুহিতার রূপ ;
কোকিল-কাকলি জিনিয়া বচন,
শুনি নরনারী চুপ !
কিম্বা এস হরি, নন্দের দুলাল,
বাল-গোপালের বেশে ;
হরি-কমলের লীলা-খেলা হেরি,
সারা ব্রজ উঠে হেসে !
যশোদা মায়ের অঞ্চল ধরিয়া, কভু ঘোর টানাটানি ;
উখলির সাথে চোর বাঁধা পড়ি, কভু যোড়ে দুটী পাণি !
বল কতকাল,—হে শ্যামকিশোর, বহিবে নয়ন-লোর !
আত্মা-বধূ মোর ঘোর উন্মাদিনী তব লাগি মনচোর !
আলুথালু কেশা, বিব্রবা, বিবশা, হইয়াছে ব্রজবালা ;
যামিনী যে যায়, চাঁদ যে লুকায় শুকায় ফুলের মালা !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

জাহ্নবী।

এত দ্রুতপদে কোথায় চলিয়াছ, জাহ্নবি ? কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠাইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া চলিয়াছ, গঙ্গে ? এ দুর্ভিক্ষ-কবলিত বঙ্গভূমে, এ হাহাকারময় শ্মশানক্ষেত্রে পূতসলিল চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে, কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছ, কলনাদিনি ?

অসংখ্য নদ-নদী-পরিবৃতা সসাগরা ভারত-বক্ষে তোমারই নাম শুনি কেন মা ? পাপী-তাপী, সাধু-সন্ন্যাসী সকলেই তোমার কূলে জ্ঞানলাভার্থ ছুটিয়া আসে কেন জননি ? আমি যে আজও শ্বেতবসনা বিষ্ণুপদনিঃসরিণী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকে জ্ঞানদায়িনী বীণাপাণিরূপে দেখিতে শিখি নাই,—আমাকে শিখাইয়া দেও, মা।

বহুদিন পূর্ব্বে যখন ঘরে বসিয়া সমগ্র 'বঙ্গকে দর্শন' করিয়াছিলাম—ম্লেচ্ছ-অস্পর্শিত 'আর্য্যে'র রীতিনীতি 'দর্শন' করিয়াছিলাম তখন ত মা, এ সরিৎ-প্রস্রবণ-তড়াগ-প্লাবিত দিনের কথা মনে হয় নাই। যখন বহুদিন পূর্ব্বে

'নবজীবন' পাইলাম—'প্রচারে'র ডঙ্কা শুনিলাম—'প্রবাহে'র ধারায় স্নাত হইয়া পূত-কলেবর হইলাম—'ভারতী'র বীণার ঝঙ্কার শুনিলাম, তখন ত একবারও ভাবি নাই, জাহ্নবীর তটে বসিয়া একদিন অতীতের প্রতিধ্বনি শুনিব।

কৌমদী-প্রফুল্ল জাহ্নবী-উপকূলে বসিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে যখন বীণার ঝঙ্কার শুনিলাম তখন মনে হইল, বুঝিবা বহুদিন-বিস্মৃত অতীতের সঙ্গীতলহরী ভাগীরথীর তরঙ্গে তরঙ্গে মুখরিত হইতেছে। জাহ্নবি, তোমার তটে বসিয়া কত লাবণ্য-বিজড়িত 'কিশোরী' দেখিলাম—কত 'রত্ন'-শ্রেষ্ঠ 'তারা'র প্রতিবিম্ব দেখিলাম—কত 'শশধরে'র ছায়া দেখিলাম—কত 'গিরিপতি মোহিনী'র 'গুরু গুরু' নূপুরধ্বনি শুনিলাম—কত 'মান'ময়ীর সকরুণ 'প্রার্থনা' শ্রবণ করিলাম—কত 'সরলা'-পঙ্কোজের প্রেমাভিনয় দেখিলাম। কিন্তু 'জলধর'-প্রতিবিম্বিত তরঙ্গশিরে জ্যোতির্ম্ময় 'দীনেশে'র সুখময় কিরণ কই?—'নবীন' প্রেমিকের সে সুধাধারা কই?—ত্রিবেদ শুনাইতে সে 'ত্রিবেদী' কই?—সে গভীর জ্ঞান-'প্রবাহের' 'দামোদর' কই?—আঁধারাবৃত গর্ভ আলোকিত করিতে সে 'অক্ষয়' 'রবি' কই?

থাকুক বা না থাকুক, জাহ্নবি, তোমার যা' আছে তা' এই বঙ্গভূমে কয়টা নদনদীর আছে? এখন ত বঙ্গের আর সেদিন নাই;—নদনদী শুকাইয়া গিয়াছে—অরণ্য শস্যক্ষেত্রে অবস্থান্তরিত হইয়াছে,—শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এখন এ শস্যহীন তৃণক্ষেত্রের মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া, 'বঙ্কিম'-ভাবে ছুটিয়া, বঙ্গের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া কে আর সে ভাবে বঙ্গকে দর্শন করাইতে আছে? এ অভিনয় ক্ষেত্রে মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সে ঋষিতুল্য 'সঞ্জীবন' নাই—কোমল শিঞ্জিনীধ্বনিতে মন মাতাইতে সে 'হেম' আর নাই—হাসাইতে কাঁদাইতে সে 'দীনবন্ধু' নাই—গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে ইন্দ্রের সিংহাসন টলাইতে সে উল্কাতুল্য 'মধুসূদন' নাই। সব গিয়াছে, জাহ্নবি, দীপাবলী নিবিয়া গিয়াছে, মালা শুকাইয়া গিয়াছে, নাট্যশালা ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়াছে। সব গিয়াছে, জাহ্নবি, একে একে সব গিয়াছে! যাহারা আছে, তাহাদের কেহ যমুনা-কূলে কুটীর বাঁধিয়া 'প্রবাসী' হইয়াছে, কেহ বা জটাজূট-বিভূতি-মণ্ডিত হইয়া সুদূরপ্রদেশে 'উপাসনা' নিরত হইয়াছে। তাই আজ সকল দিকে বিফল মনোরথ হইয়া অতীতের প্রতিধ্বনি শুনিতে তোমার তটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

বারেক শুনাও, জাহ্নবি,—যা' আছে তাই কুড়াইয়া লইয়া ভগ্ন-তার বীণার সুর বাঁধিয়া একবার সঙ্গীত শুনাও, দেবি। বহুকাল যে সে সঙ্গীত শুনি নাই, সে সঙ্গীতের স্মৃতি—সে ঝঙ্কারের প্রতিধ্বনি এখন যে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই আজ আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ে 'সাগর'-অনুগামিনী 'আবর্জ্জনা-সংলিপ্ত' পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-তটে অতীতের ঝঙ্কার শুনিতে আসিয়াছি। শুনাইবে না কি, জাহ্নবি ?

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় বার্ত্তানীতি। *

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস যতই অধীত হইবে, ইহার জ্ঞানভাণ্ডারের বিবিধ রত্নরাজি ততই প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনকালের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতের সমাজগঠন ও ইতিহাস পাঠে চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতীতি হইবে যে নানা প্রতিকূল স্রোতে এই সমাজের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। বহিঃ ও অন্তঃশত্রু আক্রমণের চিহ্নাদি রাখিয়া গিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুসমাজের মূল ভিত্তি টলাইতে পারে নাই।

চতুবর্ণ বিভাগবশতঃ এখানে কৃষি, বাণিজ্যের যে সুব্যবস্থা হইয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কি উপায়ে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নদ-নদী-বহুলা, বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের জন্য কখন

* 'Political Economy' বা 'Economics' শব্দ বাঙ্গালায় নানারূপে অনুদিত হইয়াছে। 'অর্থশাস্ত্র', 'অর্থনীতি', 'ধনবিজ্ঞান' প্রভৃতিকে ইহার প্রতি শব্দরূপে অভিহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। অধুনা ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা 'Political Economy'শাস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৭৭৫ খৃঃ আদাম স্মিথের 'Wealth of Nations, প্রচারিত হইবার পর 'Political Economics' শব্দের প্রচলন হয়। তাহার পরে দেখা যায়, রাজা ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধও ক্রমে উক্ত শাস্ত্র বা নীতির বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। ইহাতে Political Economy ক্রমে Economics এ দাঁড়াইয়াছে। কৃষিবাণিজ্য, আয়, ব্যয়াদি হিন্দুদের বার্ত্তা ও নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

পশ্বাদি পালনাদ্দেবি কৃষিকর্ম্মান্তকারণাৎ।
বর্ত্তানাদ্ধারণাদাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে॥

অতএব বার্ত্তানীতি নামকরণ সুসঙ্গতই হইয়াছে ও সাধারণতঃ গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জাঃ সং।

বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। ভারতবর্ষে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সময় ইহার পণ্যাদি দূরদেশে সাগরের পরপারে অর্ণবপোতে নীত হইত। ভারত-সাগর-দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুদিগের উপনিবেশ স্থাপন এখন উপকথা বলিয়া কেহ আর অবিশ্বাস করে না। বড়ই দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় এখন বিদ্যার্থীর পাঠ্য বহির্ভূত। যব, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কৃষি, বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা ছিল। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের কোন শাস্ত্রজ্ঞানই অগোচর ছিল না। গো,পশ্বাদি রক্ষণ, পালন, কৃষি ও বাণিজ্যের বিষয় বার্ত্তা ও নীতিশাস্ত্রে যথাযথ বিবৃত আছে।

ইংরোজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতির প্রিয়ক্ষেত্র ভারত নানা কৃষি ও শ্রমজাত শিল্পের জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। এখন তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভারত এখন কেবল কৃষির জন্য বিখ্যাত। আমাদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে দুই মত থাকিলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বলা যাইতে পারে ভারতের বিভূতি এখনও জগৎকে চমৎকৃত করিয়া রাখিয়াছে, আমরাই ইহার সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম। অভাব সর্ব্বপ্রকার উৎসাহের ব্যাঘাত জন্মায়। উপবাস-ক্লিষ্ট ভারতবাসী তাহার বিপুল বিভবের চিন্তা করিয়াই এখন ক্ষণিক সুখ বোধ করে। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিয়া পরিতৃপ্ত থাকে মাত্র। বিবিধ ধাতুর খনি, সীমাহীন কানন, অনন্ত স্রোতস্বিনী, উর্ব্বরা ভূমি, যে দেশে আছে, সে দেশে অভাব কিসের? অভাবের মধ্যে,—আত্মনির্ভরশীলতা ও মনুষ্যত্ব আমাদের উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত যে প্রবল জাতির সংস্পর্শে দুর্ব্বল জাতি একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ব্যাপার দেখিয়া আতঙ্ক হয় বুঝিবা আমাদের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। দুর্ভিক্ষ কিম্বা মহামারীর প্রকোপে প্রথমে নিম্নতম শ্রেণী কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ঠিক তাহার উপরিস্থিত শ্রেণী নিম্নতম শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে। উচ্চবর্ণের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা হল চালনা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যয় আয় অপেক্ষা দিন দিন বাড়িতেছে। দেশের ধনবানের ব্যয়ও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এরূপ হইলে জাতিমাত্রই শীঘ্র দেউলিয়া হইয়া পড়ে। ভারতবাসীর গড়ে বার্ষিক আয় খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ত্রিশ টাকার অধিক নয়। এতাদৃশ দরিদ্র জাতির ভবিষ্যৎ কখনও উন্নত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনেও আশার ক্ষীণ

আলোকরশ্মি যেন দেখা দিয়াছে। ভারতবাসী এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে দুইটী হাতের মত কৃষি ও বাণিজ্য উভয়েরই আবশ্যক। ইহার একটীকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আমরা কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছি। ব্যবসা-বাণিজ্য পরের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। ইহা পুনরায় হস্তগত করিতে হইবে। এই সময়ে জয়-পরাজয়ের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ সুখ, দুঃখ নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান উন্নীত প্রণালীতে কৃষির উৎকর্ষ সাধনে আমাদের সমধিক মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা যদি কৃষি বিষয়ক বিবরণীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে সহজেই প্রতীতি হইবে, চেষ্টা করিলে উন্নতি অসাধ্য নহে।

সমগ্র ভারতের পরিমাণ ১,৭৬৬,৬৪২ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত পরিমিত ভূমিতে বিবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা ঃ—

	একার
ধান	৭০,২০৫,১১০
গম	২৩,৬১২,৭৩০
অন্য শস্যাদি	৯৩,৬২৩,১৭৬
আক	২,২৮০,২৪২
চা	৫০৬,২৮৭
তুলা	১১,৮৮৩,৬৭০
তৈলাদি	১৪,৫৩৫,৭৯৬
নীল	৭১২,০৪১
তামাক	৯৭৫,৩৭৭
সূত্রাদি	৩,১৭৩,০২৩ ইহার মধ্যে
পাট	২,৫০৩,৯৬৮
কাফি	১০৪,২৩৯

পূর্ব্বোক্ত খাদ্যাদি ব্যতীত ৬,৫৭৯,২১৬ একার জমীতে অন্যবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়।

জঙ্গল	৬৭,১০৪,৯৭৪
চাষের অনুপযুক্ত ভূমি	১৩৮,৩৫২,৪৩৯
পতিত জমী ব্যতীত অনাবাদী জমী	১০৩,৩৯১,০১৮
পতিত জমী	৩৬,৮৭০,২৩২
শস্য উৎপন্নকারী জমী	২০৮,৮১৭,৪০৬

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যখন প্রায় ৩০ কোটী ভারতবাসীর উপযুক্ত আহার উৎপন্ন করিয়াও যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানি করিতেছি, তখন আর অধিক ভূমি আবাদ করা প্রয়োজন কিনা? তদ্ব্যতীত, আবাদ করিবার জন্য, কৃষক পাওয়া যাইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত (১) আমাদের প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় কিনা? (২) আহার্য্য ভিন্ন অপর দ্রব্যাদি (যথা, পাট, শন প্রভৃতি যাহা ধান্যাদি অপেক্ষা মূল্যবান) উৎপন্ন করা উচিত কিনা? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে (১) শুদ্ধ রপ্তানি দেখিয়া লোক সংখ্যার উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় কিনা বলা যায় না। রপ্তানির অনেক কারণ আছে। রপ্তানির পথ সুগম থাকিলে স্থানীয় লোকের ব্যবহারের জন্য শস্য দেশে পড়িয়া থাকে না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-কাতর ভারতে দেখা গিয়াছে যে শস্যের অভাববশতঃ লোক অনাহারে মরে নাই। খাদ্য কিনিবার অর্থের অভাবই অনাহার-মৃত্যুর কারণ। এই দরিদ্রদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে কোমর বাঁধিতে হইবে। রপ্তানি দ্বারা যে অর্থ পাইব তাহা দ্বারা যদি মহার্ঘ চাল কিনিতে পারি সে ত মঙ্গল। কিন্তু কেবল রপ্তানি বাড়াইলে চলিবে না। অবাধ বাণিজ্যের দেশে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশী। ভারতবর্ষে ঠিক তাহার বিপরীত। সতর্ক বার্ত্তানীতিবিৎ (Economist) বলিবেন, তুমি ভূমি-মাল (Raw produce) রপ্তানি করিয়া যে পয়সা পাইবে, এখানে উহা বিক্রয় করিয়া তাহা অপেক্ষা কম পাইবে। অতএব, রপ্তানি কর। তার পর, আমদানি যদি কম হয়, তাহা হইলে বাজারে তাদৃশ খাতির নাই বুঝিতে হইবে। এই খাতিরের (Credit) উপর অনেকটা নির্ভর করে। ইংলণ্ডকে লোকে এত বিশ্বাস করে যে তাহার জাতীয় ঋণ সত্বেও রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অনেক বেশী। বেশী রপ্তানি করিয়া ভারতবাসী লাভবান হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, ভারতের-ভূমিমাল রপ্তানি ও ইংলণ্ডের কলকারখানাজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি সমান নহে। এক হিসাবে সমান না হইলেও মূল্য হিসাবে সমান। কলে প্রস্তুত দ্রব্য ত ইংলণ্ড হইতে আমদানি হয়; আর আমরা যা রপ্তানি করি, তা এখানেই সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন ও প্রস্তুত (যথা, চা, কাফি, নীল)।

দ্বিতীয় কথা, আমদের যে জিনিসের উৎপন্ন মধ্যে বিশেষ তারতম্য আছে। ধানের চেয়ে পাটে লাভ বেশী। পাটের ব্যবসায় লাভ এত বেশী যে কৃষক ধানের চাষ কমাইয়া পাট বুনিতেছে। ইহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। পূর্ব্বে ইহার অবতারণা করিয়াছি। বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন

পাট-চাষের পরে, স্থানসকল অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। জল পচিয়া দুর্গন্ধে সেখানে বাসকরা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া আমাদের কৃষকদের বর্ত্তমান অবস্থায় নগদ টাকা হাতে পাওয়া সুবিধার বিষয় নহে। মহাজনের ঋণ পরিশোধ, দু চারি দিন উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করায় ভবিষ্যতের সংস্থান অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়; এবম্প্রকার অদূরদর্শী কৃষকের সম্মুখে আবার চাকচিক্যময়, অপদার্থ বিদেশী বিলাসসামগ্রী তাহার অসংযত চিত্তের লোভ জন্মাইতে ত্রুটী করে না। অতএব, পাট প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ অপেক্ষা, ধান, গম প্রভৃতির চাষ আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

এই চাষের উন্নতির সঙ্গে আমরা যে প্রকারে ধন-সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা ভাবিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। আলেক্‌জেণ্ডারের পূর্ব্ব হইতে যে হলচালনা করিয়া আসিতেছি, তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কোন দ্রব্যেরই উন্নতির শেষ নাই। উন্নতি অর্থসাপেক্ষ হইলেও বিস্মৃত হইব না যে মানুষের বুদ্ধিই সর্ব্ববিধ-উন্নতির আকর। আমরা বুদ্ধিজীবী। বিশেষ ভারতবাসী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া এত বড় হইয়াছে। আমরা এখন এই খাদ্য উৎপন্নের বৃদ্ধি ও উন্নতি করিতে চেষ্টা পাইব। ধান্যের উন্নতি ভিন্ন উহার অপর অংশের উন্নতি যে সম্ভব তাহার কোন শিক্ষা না পাওয়া আমরা তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে পর্য্যন্ত অক্ষম। বিচালি দ্বারা যে কত সুন্দর দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। পশ্বাদির খাদ্য ভিন্ন, পরিত্যক্ত বিচালি হইতে সুন্দর সুন্দর চিরুনি, বোতাম, ছোট ছোট বাটী প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হইতেছে। সহজ-দাহ্য খড়, পাতা-নির্ম্মিত ঘরের চালার পরিবর্ত্তে উক্ত উপাদানের সহিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া, জল ও অগ্নিতে নষ্ট হইবে না, এরূপ পদার্থ বিনির্ম্মিত জিনিসে ঘরের চালা প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এইরূপ উপায়ে দরিদ্র দেশের উপযোগী জিনিসের অভাব দূর করিতে যত্নশীল হইলে রপ্তানি বন্ধ হইবে ও দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে।

কৃষিবিষয়ক প্রসঙ্গে শ্রমশিল্পাদির উল্লেখ হইয়াছে, ইহার পরে বাণিজ্যের কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরাও তৎসঙ্গে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া তৎস্থলে স্বদেশী পণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী। আমরা প্রথমতঃ নানা

অসুবিধা ভোগ করিব বটে। কিন্তু পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই বিদেশী পণ্য বর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। বর্ত্তমান অসুবিধা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। প্রবল বাণিজ্য-প্রধান জাতির সহিত সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ সহজ নহে। শত বৎসরের চলিত ব্যবসা কোন পরাধীন জাতি সহজে নষ্ট করিতে পারে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যখনই ইংরাজের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে, তখনই আমাদের পরাধীনত্ব প্রতিপদে অনুভূত হইবে। ভাবী অনিষ্ট মনে রাখিয়া আমরা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকি তাহা হইলেই এই বিদেশী পণ্যবর্জ্জন-প্রতিজ্ঞা সার্থক হইবে। ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের জয়-পরাজয়ের বিষয় কিছু বলা যায় না। ভারত-বাসী জীবন সংগ্রামে এবার পরাঙ্মুখ হইবে না—এই শিক্ষা ও দীক্ষা উপস্থিত প্রয়োজন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত আমরা বাণিজ্য-বিষয়ক কোন শিক্ষাই পাই নাই। রাজপুরুষেরা নিজেদের আবশ্যকীয় বিদ্যাদান করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। আমরা যদি ক্রমশঃ অবস্থানুরূপ শিক্ষার আবশ্যক অনুভব করিয়া থাকি, তবে নিজেদের শিক্ষাভার অপরের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না। বাণিজ্যের ভার নিজেদের হাতে লওয়া ইচ্ছা করিলেই হইবে না। আমাদের অবস্থা বিশেষ ভাবিবার বিষয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর হিতার্থে কোন কার্য্য করিলে যদি ইংলণ্ডে বণিকদের স্বার্থের হানি হয়, সেরূপ কার্য্য ভারত সম্রাট বা ভারত সচিব কখন অনুমোদন করিবেন বলিয়া আশা করা সম্ভব মনে হয় না। দুঃখের বিষয় ইংলণ্ড বাণিজ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক হইয়াছে; কিন্তু ভারতে তাদৃশ বাণিজ্যে তাঁহারা স্বাধীনতা দানে কাতর। বাণিজ্যের প্রথম অবস্থায় যেরূপ সতর্কতা ও সংরক্ষণ আবশ্যক, সে প্রকার যত্ন বিদেশী রাজার নিকট পাইবার আশা ঠিক সঙ্গত নহে। ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্য কতদূর উপকারী, তাহা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য্য। ভারতবাসী এখন পৃথিবীর সভ্যজাতির সহিত বাণিজ্য-দ্বন্দ্বে সম্যক্ উপযোগী হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে, আসরে অন্ততঃ নামা দরকার। আমার বোধ হয় আমরা নামিয়াছি ও ভাল করে বুঝিবার জন্য কোমরও বাঁধিয়াছি।

শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র।

আমার ঘর।

বাঁধিয়াছি এ ক্ষুদ্র ঘরখানি
বড়ই নদীর কিনারে,
সদা ভয়ে মরি, তরঙ্গ প্রবল
যদি ভেঙ্গে দেয় ইহারে !

একটু ঝড়ের সহেনাকো ভর,
একটু বাতাসে হেলিয়া পড়ে,
জীর্ণ শীর্ণ তৃণ কয়গাছি লয়ে,
বাঁধিয়াছি ঘর যতন করে।
আশা মৃদু ভাসে বলে আসি কাছে—
জগতের তুমি নিজের জন,
নৈরাশ্যের নদী বলিছে হাসিয়া
ভাসাব তোমার এ আয়োজন !

লোকে দেখে হাসে, ভাবে মনে মনে,
জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্র কুটীর খানি,
বায়ু ভরে হেলে, ঝটিকায় তার—
কি যে গতি হবে নাহিক জানি।

তবু ভালবাসি আমার কুটীর,
কতই যতনে রেখেছি তায়,
যদি কোন দিন, কোন গৃহহীন,
এ কুটীরে আসি আশ্রয় পায় !

শ্রীমহামায়া দাসী।

ধর্ম্ম।

আজিকালিকার এই ঘোর দুর্দ্দিনে দুঃখের করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুখের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখিবার প্রত্যাশায় কাহার মুখপানে আমাদের চাহিয়া থাকা আবশ্যক, কাহাকে প্রসন্ন করিয়া কাহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত ? এই অসহ্য যন্ত্রণার দিনে কাহাকে কাতর স্বরে

ডাকিয়া, কাহার স্নেহময় বাৎসল্যময় প্রেমময় প্রাণময় শক্তিময় করস্পর্শে এ যন্ত্রণা জুড়াইতে পারা যায়? বলিতে পার কে আমাদের এখন তেমন পিতা তেমন মাতা তেমন পত্নী তেমন বন্ধু ও তেমন প্রভু?

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে করিতে যখন মনে মনে আমার এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, আর ইহার উত্তর ভাবিয়া কুলকিনারা না পাই তখন মনে করি আমি বাতুল। এই এমন জ্ঞানবিজ্ঞানের কালে দুঃখে পড়িয়া সুখ পাইবার জন্য যাহার প্রাণে এই এমন একটা আজগুবী প্রশ্ন উত্থিত হয় সে বাস্তবিকই বাতুল না ত কি? যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এ প্রশ্নটী পাড়, তিনি তখনি বলিবেন—বাপু হে দুঃখে পড়িয়াছ বড় কষ্ট পাইতেছ, সুখ চাই তা তাহার জন্য অমন একটা বিদ্‌কুটে রকমের ভাবনা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছ কেন? সুখ কিসে হয় দেখনা। ইউরোপ দেখ, আমেরিকা দেখ, চীন দেখ, জাপান দেখ, দেখিয়া স্থির কর সুখ কিসে হয়। ইহাদের অতীত অবস্থার সহিত এই বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখ—দেখিতে পাইবে সুখ কিসে হয়, দেখিতে পাইবে ইহাদের কত জনে কত দুর্দ্দিন হইতে এই এমন সুদিনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কত যন্ত্রণার হাত হইতে এড়াইয়া এই এমন আনন্দের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। দেখনা, আজিকালিকার এদিনে ত কাহারও কোন কথা লুকান নাই। ইচ্ছা করিলেই ত' দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে যে ইহাদের মত চেষ্টা করিলেই তোমারও দুঃখ দূর হইবে। আর এই দেখনা আমরাও ত ইহাদের দৃষ্টান্তে সুখী হইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছি।

বিজ্ঞের কথা বিজ্ঞেই বুঝে, অবিজ্ঞ বুঝিবে কেমন করিয়া? অবিজ্ঞ আমি, আমার অবিজ্ঞ মন বুঝিল না কেমন করিয়া আমি ঐ বিজ্ঞের কথামত চেষ্টা করিয়া ইউরোপ আমেরিকা চীন জাপানের মত হইতে পারিব। অবিজ্ঞ আমি বুঝিলাম না তারা কারা, আর আমরাই বা কারা। ঐ ইউরোপ আমেরিকা চীন জাপান বলিয়া বিজ্ঞ যাহাদের নাম করিলেন, তাহারা কি কেহ কখন আমাদের মত অবস্থায় পড়িয়াছিল যে তাহাদের দেখাদেখি আমরাও তাহাদের মত হইবার চেষ্টা করিব। যত কষ্ট থাকুক, যত দুঃখ থাকুক, যত জ্বালা থাকুক, যত যন্ত্রণা থাকুক, তাহাদের একটা না একটা দাঁড়াইবার স্থান ছিল, একটা না একটা আশ্রয় ছিল, তাই তাহারা তাহার উপর ভর করিয়া ক্রমে ক্রমে আজ পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছে। আমাদের আজকাল কি এমন একটী আশ্রয় আছে যে তাহার উপর ভর করিয়া আমরা এ দুঃখের হাত এড়াইবার

চেষ্টা করিতে পারি ? শূন্যে প্রাসাদনির্ম্মাণের চেষ্টার মত আমাদের এই যত কিছু চেষ্টাই যে নিষ্ফল। আমাদের অবস্থা যে একেবারে 'বল মা দাঁড়াই কোথা'।

তাই বলিতেছি আমার এ অবিজ্ঞ মন বিজ্ঞের কথা না বুঝিয়া যতই নিজের দুঃখের কথা ভাবে ততই সেই বিদ্‌কুটে পদার্থটার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে; চক্ষু বুঁজিয়া তাহার ঐ কল্পিত রূপের ধ্যান করে আর আত্মহারা হইয়া একাধারে অত গুণের বস্তুটার একটী নামকরণ করিয়া তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া দেখিতে সাধ করে।

সাধ ত করে, কিন্তু কোন্ বস্তু তেমন হইতে পারে যাহার রূপ এক, গুণ অত ? সে কে ? যে একাধারে পিতা মাতা পত্নী বন্ধু ও প্রভু ? কার প্রাণ এত মহান্ যাহাতে স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, প্রাণ, শক্তি এই এতগুলি গুণ একত্রে বিরাজ করে ?

অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া যখন আমার মন এদিনের সুলভ বিদ্যুদ্‌যানে চড়িয়া বিদ্যুতের আলোক হাতে করিয়া পৃথিবীর এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়, আর কোথাও তাহার সন্ধান না পাইয়া অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন কাহার যেন উপদেশে একবার আপনার ঘর খুঁজিতে থাকে, আর দেখে এই যে সেই তেমন বস্তু,—এই আমার আপনার ঘরেই রহিয়াছে তবে বৃথা কেন এ ছুটাছুটি। এই যে এই আমার ঘরেই বিরাজমান—এই ধর্ম্মই যে আমার সেই বস্তু, সেই একাধারে পিতা-মাতা-পত্নী বন্ধু-প্রভুরূপ বস্তু। কি চাই, স্নেহ বাৎসল্য প্রেম প্রাণ শক্তি কি তোমার আবশ্যক ? আইস, লহ এই ধর্ম্মই তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। তোমার এই ঘোর দুর্দ্দিনে দুঃখের করালগ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যদি সুখের স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ দেখিবার প্রত্যাশা থাকে, তবে আইস এই ধর্ম্মের মুখপানে চাহিয়া থাক, দুর্দ্দিন সুদিন হইবে, দুঃখ দূরে যাইবে, নশ্যমান আত্মা রক্ষিত হইবে, তুমি সুখী হইতে পারিবে। কর, প্রসন্ন কর, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এখন কেবল তোমার এই ধর্ম্মকেই প্রসন্ন কর, দেখিবে তাঁহার দয়ায় তোমার অভি-লাষ পূর্ণ হইবে। ডাক এই অসহ্য যন্ত্রণার দিনে কাতর স্বরে কেবল এই ধর্ম্মকেই ডাকিতে থাক, দেখিবে তুমি তাঁহার ঐ স্নেহময় বাৎসল্যময় প্রেমময় প্রাণময় শক্তিময় করস্পর্শে শীতল হইয়া যাইবে। এই ধর্ম্মই আমাদের সব—পিতা বল, মাতা বল, পত্নী বল, বন্ধু বল, প্রভু বল, এই এক ধর্ম্মই ঐ সকলেরই

সমষ্টি। ইহাকে সেবা কর, কায়মনোবাক্যে ইহার পরিচর্য্যা করিয়া ইহাকে প্রসন্ন কর, দেখিতে পাইবে তুমি এই এক ধর্ম্ম হইতেই পিতার স্নেহ, মাতার বাৎসল্য পত্নীর প্রেম, বন্ধুর প্রাণ, প্রভুর শক্তি সমুদয়ই পাইতেছ। আজিকালিকার পৃথিবীর এই সব বাহ্য জাঁকজমকে তুমি দিশেহারা হইয়াছ, তুমি 'সুখ সুখ' করিয়া এদেশ ওদেশ করিতেছ, তোমার যন্ত্রণার নিবৃত্তির জন্য ইউরোপ আমেরিকা চীন জাপান ঘুরিতেছ, কিন্তু উহাতে কিছু হইবে না, তুমি কোথাও সুখ পাইবেনা ; যদি কেহ তোমার এ যন্ত্রণার নিবর্ত্তক থাকে, যদি কেহ তোমার সুখপ্রদাতা থাকে—তবে সে এই এক ধর্ম্ম। এই তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত, এই এতদিন অনাদরে উপেক্ষিত এক ধর্ম্মই এই অনবরত দুঃখমুখে পত্যমান জীবনে, আশাশূন্য যন্ত্রণায় অধীর যে তুমি তোমার একমাত্র অবলম্বন। উঠ, মোহ ত্যাগ কর, বাজে লম্ফঝম্ফ এখন পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ করিয়া দেখ তুমি কোথায় ? তুমি যে নিরাশ্রয়, তুমি যে পড়িতেছ, তুমি যে আকাশে আকাশে থাকিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছ। তোমার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না। তাই বলিতেছি তুমি এখন ওসব বাজে চেষ্টা না করিয়া আগে তোমার পড়া বন্ধ করিবার চেষ্টা কর, তার পর যাহা করিতে হয় করিও।

তোমার এ পড়া বন্ধ করিতে আর কাহার ক্ষমতা নাই, তুমি অনেক উচ্চ হইতে বড় বেগে পড়িতেছ, অপর কাহার সাধ্য যে তোমায় ধরিয়া রাখে। তুমি এখন অপর যাহাকেই ধরিবে তোমার পতন-বেগে সে শুদ্ধ উন্মূলিত হইয়া তোমার সহিত পড়িতে থাকিবে ; সুতরাং আর কাহাকেও অবলম্বন করিও না, এখন এই ধর্ম্মের পা-দু'খানি সাপ্‌টে জড়াইয়া ধর, তোমার পড়া বন্ধ হইবে। ধর্ম্মের জোর বড় জোর, তুমি যত জোরেই পড় না কেন তাঁহার জোরের কাছে তোমার জোর পরাভূত হইবেই হইবে ; তুমি আশ্রয় পাইবে, তোমার আর পড়িতে হইবে না। তাহার পর দেখিবে, তুমি যে চেষ্টাই করিবে সেই চেষ্টাই ফলবতী হইবে।

আমার মনের এই সিদ্ধান্তে যখন আমার ধারণা হইল যে ধর্ম্মই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন—সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে আমরা এখন ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতে পারি সে বিষয়ে যথোচিত উদ্যোগ করা আবশ্যক, তখন ইচ্ছা হইল দেখি সাধারণকে এ কথাটা একবার জানাই ও শুনি তাঁহারা এ বিষয়ে কে কি বলেন ; তাই এই বহুবিজ্ঞ লোকের

আদরের জাহ্নবী পত্রিকাখানিতে আমার এই মনের কথাটী প্রকাশিত করিলাম; অনুরোধ—যেন কোন না কোন মহানুভব আমাদের এখন একমাত্র দুঃখনিবর্ত্তক ও সুখপ্রদাতা বলিয়া আমার সিদ্ধান্তিত এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই জাহ্নবী পত্রিকাতেই কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেন, কারণ তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব আমার এ সিদ্ধান্তে কোন দোষ আছে কি না? সিদ্ধান্ত বাদানুবাদে সমর্থিত হইলে ইচ্ছা রহিল,—ধর্ম্ম কি ও কি জাতীয় ধর্ম্ম কিরূপে আশ্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে এই জাহ্নবী পত্রিকাতেই সাধ্যানুসারে কিছু কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

প্রাণের দেবতা তুমি।

জীবনের তুমি শান্তিকুঞ্জ
পরাণের তুমি পিপাসা।
হৃদয়ের তুমি নিভৃত নিলয়ে
সুন্দর সুখ বরষা।
নন্দনের তুমি ফুল্ল পারিজাত
মলয়ার বায় দেহে।
হৃদি-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা
সুখ সরোবর গেহে।
মঞ্জুল-বঞ্জুল প্রেম-কাননে
বসন্তের পিক তুমি।
তব প্রেম-মুখরিত আহ্বানে নাথ
চির সুশীতল আমি।
চির-বাঞ্ছিত তুমি যে আমার
চির-সঞ্চিত ধন।
তব প্রেম-করুণা এ হৃদয়ে মোর
অমৃত-মদিরা সম।
হৃদয়ের তুমি প্রীতির প্রবাহ
নন্দন ফুলহার।

পতঙ্গজাতি ইহাদিগকে গ্রাহ্যও করিত না। কে উহাদের পরাগ-রেণু এক ফুল হইতে অন্য ফুলে লইয়া গিয়া তাহার গর্ভ-কেশরে মিলিত করিত? ইহাদের এই দুষ্টামি সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু পতঙ্গগুলি অতিশয় বোকা। তাহারা চিরদিন এই ঝুম্‌কো জবা-গুলির বেগার দেয় কেন? অন্য ফুলের নির্দ্দিষ্ট পতঙ্গগুলি যা'হউক পেট ভরিয়া দুইটা খাইতে পায়। এই ফুলগুলি এত কৃপণ যে একদানাও পতঙ্গকে দেয় না। কেবল উজ্জ্বল লালবর্ণ-পোষাক পরেই উহাদের মন ভুলাইতে চেষ্টা করে। পতঙ্গেরাও এমন গণ্ড মূর্খ যে শুধুই রং আর পোষাক দেখেই পাগল হয়। সমস্তদিন না খেয়ে খাটিয়া খাটিয়া সারা হয়। রেণু ব'য়ে ব'য়ে মারা যায়। খাটে খুব! রেণুর বোঝা বহেও খুব; কিন্তু পেট-ভাতাও জোটে না। এ পতঙ্গগুলির সহিত কি বাঙ্গালীজাতির কোন নিকট-সম্বন্ধ আছে না কি? দেখি, কথাটা ভাবি, তা'রপর আর এক দিন উত্তর দিব।

শ্রীশশধর রায়।

একবার দেখা।

১

শিবপূজা সাঙ্গ করিয়া অলকাসুন্দরী একটী ছোট বাটীতে একটু জল লইয়া শাশুড়ী ভগবতী দেবীর পদপ্রান্তে বসিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন, "আ অভাগী, কতই পূজা কর্‌ছিস—কতই পাদোদক খাচ্ছিস্‌, কই তোর কপাল ত ফিরে না।"

নতবদনা অলকার চক্ষু বহিয়া জল গড়াইল। শাশুড়ী বউয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এবার তোমায় লইয়া সেই হতভাগা ছেলের কাছে যাব—দেখিব, তোমার কপাল ফিরে কিনা?"

শাশুড়ীর পদতল সযতনে ধৌত করিয়া ভক্তি সহকারে জলটুকু অলকা খাইল; এবং মাথায় বুকে একটু দিল। তারপর উদ্দেশে স্বামীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল, "কোথায় আমার দেবতা? কোথায় আমার সর্ব্বস্বধন? জীবন থাকিতে দাসী কি তোমার দেখা পাবে না? জীবনও ত আর বেশী দিন থাকে না।"

২

অনিলকুমারের অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে দশমবর্ষীয়া অলকার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর যখন বরকনে বাড়ী আসিয়া নামিল তখন "বউ কালো—ছেলের যোগ্য নয়" ইত্যাদি নানারকমের কথা মেয়েমহলে প্রচারিত হইল। কথাটা অনিলের কাণেও গেল। বিস্তৃত উঠানের মধ্যস্থলে দুধে আলতায় পা দিয়া কনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে বর নিম্নদৃষ্টে ধানের কাটা ধরিয়া দণ্ডায়মান। ভগবতী দেবী আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া ছেলে-বউ বরণে ব্যাপৃতা। অনিলকুমার দেখিলেন, বউয়ের পা কালো। ছি, কালো পা কি দুধে আলতায় মানায়! অনিলকুমার সে কালো মুখ পানে আর চাহিয়া দেখিলেন না।

তারপর সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অনিলকুমার সে কালো মুখপানে আর ফিরিয়া দেখিলেন না। কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন—কলিকাতা হইতে আর গৃহে ফিরিলেন না। অভাগিনী অলকা কত কাঁদে—মা মত কাঁদিয়া চিঠি লিখেন; কিন্তু অনিলকুমার কিছুতেই আর বাড়ী আসিলেন না, স্বামী-পরিত্যক্তা অলকা আর কি করিবে? সে শুধু কান্না সম্বল করিয়া, শিবপূজা করিয়া, ভগবতীর পাদোদক পান করিয়া দিন কাটায়; কিন্তু দিন যে আর কাটে না।

৩

ভগবতী, বউকে লইয়া কলিকাতায় অনিলকুমারের বাসায় আসিয়াছেন। একদা সন্ধার পর ভগবতী বলিলেন, "ছি, বাবা, আজ রাতে আর বাহিরে যাইও না। বউ যে আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। এমন লক্ষ্মীমন্ত বউয়ের পানে তুমিত একটীবার চাহিয়া দেখিলে না—একবার দেখ— বাবা একবার চেয়ে দেখ।"

অনিল। ওই কথাটী আমায় বলিও না, মা। তুমি আর যাহা বলিবে সব পারিব, কিন্তু তার মুখ দেখিতে পারিব না।

ভগবতী। কোন্ অপরাধে তুমি ঘরের লক্ষ্মী বৌয়ের মুখ দেখ না?

অনিল। অপরাধ কি তাহা আমি জানি না। কিন্তু যার মুখ দেখিতে আমার প্রাণ চায় না তা'র মুখ আমি দেখিতে পারিব না।

অনিল চলিয়া গেল। কপাটের পাশ হইতে একখানি অশ্রুসিক্ত ছোট মুখ ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তারপর লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়া অলকা

মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অলকা কহিল, "মা আমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন; কিন্তু আমি কেমন করিয়া এ স্থান ছাড়িয়া যাইব? এ যে আমার স্বর্গ। এখানে থাকিয়া দিনান্তে একটীবারও লুকাইয়া দেখিতে পাই—একটীবারও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। হায়, আমার সে সুখ বুঝি ঘুচিয়া যায়। আমি যে লজ্জায় মাকে কিছু বলিতে পারি না। ওগো তোমরা কেহ বলিয়া কহিয়া আমাকে এ তীর্থে রাখাইয়া দেও না গা!"

৪

ক্ষীণকণ্ঠে অলকা ডাকিল, "মা কই?"

"এই যে মা, আমি তোমারই কাছে আছি।"

অলকা। মা, আর আমি বাঁচিব না।

ভগবতী। ছি, অমন কথা বলিতে নাই।

অলকা। মা, আমার মরিবার সময় তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দিও। আর—আর—

ভগবতী। আর কি মা?

কিন্তু অলকার আর কথা সরিল না; ক্ষীণ, শুষ্ক গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে আঁখিজল গড়াইতে লাগিল। অলকা ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি মরিয়া গেলেও তিনি কি বাড়ীতে আসিবেন না?"

ভগবতী বস্ত্রাঞ্চল চো'খে দিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। অলকা বলিল, "যদি আসেন তাহা হইলে যেখানে আমাকে দাহ করা হইবে সেই স্থানে তাঁহাকে একবার যাইতে বলিও।"

কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবতী বলিলেন, "কেন মা, অমন কথা বলিতেছ?"

সে কথা কাণে না তুলিয়া অলকা বলিল, "যদি সেই শ্মশানক্ষেত্রে আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখের জল এক ফোঁটাও পড়ে, তাহা হইলে——"

"ছি, আবার ওই কথা বলিতেছ।"

অলকা বলিতে লাগিল,—"তাহা হইলে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে—আমার রমণী-জনমের সকল সাধ মিটিবে।"

৫

কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর অলকার ব্যায়রাম উত্তরো ত্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে চলিবার শক্তিও গেল; অবশেষে অলকা শয্যাগত হইল। ভগবতী মহা চিন্তিত হইয়া ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার

বাবু পরীক্ষান্তে বলিলেন, রোগ কঠিন—জীবন সংশয়। জেলা হইতে বিচক্ষণ চিকিৎসক আসিলেন; তিনি দেখিয়া বলিলেন, ক্ষয়রোগ (থাইসিস্) জন্মিয়াছে। ভগবতী তখন ভীত হইয়া কন্যা ও জামাতাকে আনিলেন।

কন্যা কুলদা আসিয়া দাদার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু তবু তিনি আসিলেন না। চিঠির উপর চিঠি লোকের উপর লোক গিয়াছে, তবু তাঁহার দেখা নাই। অলকা হতাশ হইয়া কুলদাকে বলিল, "ঠাকুর ঝি, আমার শেষ দিনেও কি তিনি একবার দেখা দিবেন না?"

কুলদা উত্তর করিল, "তুমি নিশ্চয় জেনো বউ, দাদা আসিবেন। দাদাকে না দেখিয়া তোমার মরা হ'বে না।"

অলকা। বুঝি জীবন থাকিতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। জীবন যে শেষ হয়ে এল দিদি।

কুলদা। তোমার মত সতী সাবিত্রীর কামনা কখন বিফল হয় না। তুমি নিশ্চয় জেনো দাদাকে না দেখিয়া তুমি মরিবে না।

৬

কলিকাতাস্থ একতম অট্টালিকা মধ্যে কোন সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া সুরাপানোন্মত্ত বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত অনিলকুমার আনন্দ উপভোগে (!) নিবিষ্ট-চিত্ত। তিনি এক্ষণে কালো ছাড়িয়া জনৈক দুগ্ধালক্তকনিন্দিবরণা যুবতী পাইয়াছেন। যুবতী গাহিতে জানে, নাচিতে জানে, তার উপর আবার রূপ।

ভোরপুর মজলিস।—পাখোয়াজের বোল—তবলার চাটি—নুপুরের ধ্বনি—সঙ্গীতের ঝঙ্কার কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। অনিলকুমার পূর্ণসুখে উন্মত্ত! এই পূর্ণসুখে বাধা দিয়া তাঁহার ভগিনীপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সজলনয়নে কহিলেন, "একবার চল, অনিল,—একবার চল;—তোমার সেই মৃতকল্প স্ত্রীকে একবার দেখিবে চল।"

গীতবাদ্য থামিয়া গেল। অনিলকুমার উত্তর করিলেন, "আমি যাব না—সে কালো স্ত্রীর মুখও দেখ্‌ব না।"

জনৈক বন্ধু বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাহবা! বাহবা! একেই ত বলি পুরুষ বাচ্ছা।"

ভগিনীপতি বলিলেন; "একবার দেখ্‌বে না?"

অনিল। না, দেখ্‌ব না।

ভ-প। আচ্ছা, আজ আমি রহিলাম—কাল্ তোমায় নিয়ে যাব।

৭

আজ বড় ভয়ানক দিন। ডাক্তার বলিয়াছে, আজ রোগিনীর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।

তাপদগ্ধা নীলবরণা অপরাজিতার ন্যায় অলকা শয্যোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে, কুন্দদা-বারিভারাকুল নয়নে উপবিষ্টা। মাথার শিয়রে, বধূ-বৎসলা ভগবতী দেবী, বধূ-মুখ পানে চাহিয়া নীরবে অজস্রধারায় আঁখিজল ফেলিতেছেন। বারান্দায় ডাক্তার ও প্রতিবেশীরা উদ্বিগ্নচিত্তে দণ্ডায়মান।

"কই মা—আমার দেবতা কই? একবার দেখা, মা।"

শ্বাশুড়ী কি উত্তর দিবেন? তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অলকা একবার ঘাড় ঘুরাইয়া চারিদিক দেখিল। চক্ষু যেন কি খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া নয়ন আবার মুদ্রিত হইল।

এমন সময় সেই ঘরে ধীরে ধীরে গম্ভীর জলদখণ্ডের ন্যায় অনিলকুমার আসিয়া মুমূর্ষু পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইল, অনিল স্থির-দৃষ্টিতে পত্নীর কালো মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখ দেখি, অনিল - একবার দেখ, এই কালো মুখ কত সুন্দর! এমনটা আর কোথাও দেখিয়াছ কি? স্বর্গের জ্যোতিঃ, স্বর্গের পবিত্রতা এই কালো মুখে প্রতিবিম্বিত।

মুদ্রিতনয়নে অলকা বলিল, "একবার দেখা।"

"চেয়ে দেখ না, মা।"

অলকা নয়ন উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, এই আট বৎসর ধরিয়া নিয়ত যাঁহার ধ্যান করিয়া আসিয়াছে—দেবতা-জ্ঞানে যাঁহাকে পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই দেবতা সম্মুখে। ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে অলকা বলিল, "এসেছ, প্রভু? এতদিনে দয়া হ'ল? তবে তোমার পদধূলি আমার মাথায় দেও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে এমনি শাশুড়ী, এমনি স্বামী পাই।"

আর কথা সরিল না। অনিলের চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিয়া অলকা অনন্তধামে চলিয়া গেল।

৮

ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল, - ধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইল। আজন্ম স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা পতিব্রতার দেহ, অগ্নির তেজে পুড়িয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিল।

এমন সময় "একবার দেখা" চীৎকার করিতে করিতে অনিলকুমার উন্মত্ত ভাবে শ্মশানে ছুটিয়া আসিল।

"একবার দেখা—ওগো, একবার দেখা।"

অনলহুঙ্কার গর্জ্জিয়া বলিল, "কি দেখাব?"

"আমার সেই কালো মুখ।"

বলিতে বলিতে অনিলকুমার আছাড় খাইয়া সেই প্রজ্জ্বলিত চিতার উপর পড়িল,—কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পাড়িল না। তখন লোকে শুনিল, স্থলজল-ব্যোম চমকিত করিয়া চিতার মধ্য হইতে কাতরকণ্ঠে চীৎকার উঠিল, "একবার দেখা—ওগো,একবার দেখা।" কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। যতক্ষণ না চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল ততক্ষণ লোকে শুনিয়াছিল, অনল কাঁদিয়া বলিতেছে—"একবার দেখা—ওগো, একবার দেখা।"

চিতা নিবিয়া গেল। দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। ক্রমে অলকার স্মৃতিও সকলের হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু আজও লোকে শুনিতে পায় গভীর নিশীথে শ্মশান হইতে চীৎকার উঠিতেছে, "একবার দেখা—ওগো একবার দেখা।"

শ্রীসুরেশ্বরী দেবী।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

বঙ্গদেশের অধিবাসীগণ নানা প্রকারে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ম্যালেরিয়ার যে কারণ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই ব্যাধি প্রতিষেধযোগ্য। পূর্ব্বে যে সকল দেশ ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছিল, অধুনা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক উপায়াবলম্বনে সেই সকল স্থান এই রোগের কবল হইতে প্রায় মুক্তিলাভ করিয়াছে।

যে প্রকারে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হয় নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল;—

আধুনিক গবেষণায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে এনোফেলিস নামক এক প্রকার মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া যদি কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে তবে ঐ মশক-দংশনে সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সাধারণ মশা ও এই জাতীয় মশা উভয়ে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

সাধারণ মশা ও এই জাতীয় মশকের প্রভেদ এই প্রবন্ধ-সংলগ্ন চিত্র হইতে প্রতীত হইবে। এই সকল মশক অন্ধকার বায়ুচলাচলরহিত

সাধারণ মশা।
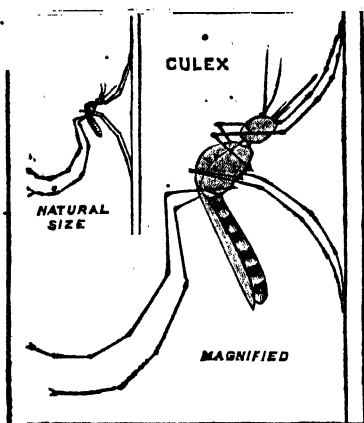
ম্যালেরিয়ার মশা।
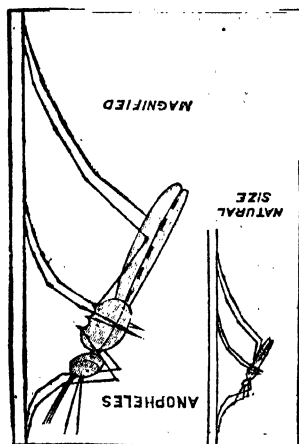
সাধারণ মশার ছানা।
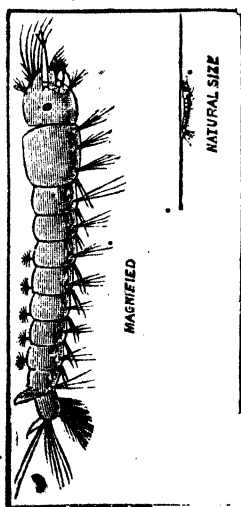
ম্যালেরিয়ার মশার ছানা।
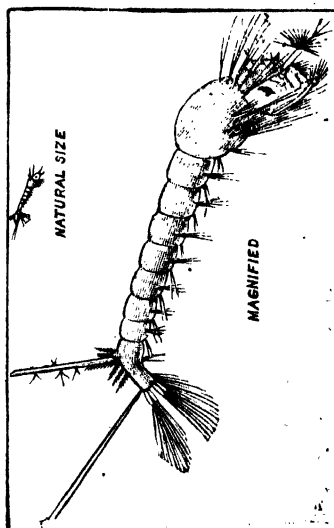
গৃহকোণে, বসতবাটীর আশেপাশে ঝোপঝাপ ও গুল্মাদির মধ্যে বা নিকটস্থ গোয়াল বা আস্তাবলে বাস করিয়া থাকে। খানাখোঁদলের মধ্যে অথবা যে সকল খাল বা নদীতে বেশী স্রোত না থাকে এমন স্থানে ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে; এবং এই সকল ডিম্ব হইতে সময়ে পূর্ণাবয়ব মশক উৎপন্ন হয়। এই ডিম্ব বা লার্ভির চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

এই সকল ডিম্ব স্থির-জলে, এবং প্রধানতঃ মৎস্যাদিবিহীন ও আগাছাপূর্ণ পুষ্করিণীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জলময় ধান্যক্ষেত্রে, জলাভূমিতে, পথিপার্শ্বস্থ গভীর পয়ঃপ্রণালীর মধ্যেও উক্ত ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই সকল মশক তাহাদের আবাসস্থল হইতে অধিক দূরে যায় না।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের উপায়।

১। মশকগুলিকে মারিয়া ফেলা।

২। এই জাতীয় মশক যাহাতে কোন স্থানে উৎপন্ন হইতে না পারে তাহার প্রতিবিধান করা।

৩। ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালীসমূহের মধ্য দিয়া যাহাতে পূর্ণবেগে জলস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে তদুপযোগী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিতে হইবে; এবং এই সকল পয়ঃপ্রণালীর পাড়-সংলগ্ন ভূমিতে কোন প্রকার আগাছা না জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৪। খানাখোঁদল প্রভৃতি কোন স্থানে যেন জল সঞ্চয় না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃহৎ পুষ্করিণীগুলির আগাছা মুক্ত ও ঐ সকল পুকুরে যাহাতে মৎস্য থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

যে স্থলে উপরোক্ত উপায়ে এই সকল খানাখোঁদল পুষ্করিণী বা জলপ্রণালী পরিষ্কৃত করিবার উপায় নাই সেই সকল স্থলে প্রতি সপ্তাহে অপরিষ্কৃত কেরোশিন তৈল এরূপভাবে ঢালিয়া দিতে হইবে যেন জলের উপরে সেই কেরোশিন তৈল সরের মতন ভাসে। পচা ও গলিত উদ্ভিদাদি পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিতে হইবে।

ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে নিম্নলিখিত প্রণালীতে গৃহ-নির্ম্মাণ করা উচিত। জলাভূমির দূরবর্ত্তী উচ্চতর স্থলে বাসগৃহ নির্ম্মিত হওয়া উচিত। সম্ভবপর হইলে দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত; এবং সম্মুখে প্রশস্ত উঠান রাখা কর্ত্তব্য। এই উঠান যাহাতে সর্ব্বদা খটখটে থাকে তাহা করা

প্রয়োজনীয়। জেলের মত বহির্দ্বার স্বোপুরু হওয়া আবশ্যক এবং বাহিরের দিকের জানালা সকল মশারির মত জালের দ্বারা ঘিরিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

মশক বিনাশ। ঘরের আসবাবাদি সরাইয়া এবং দরজা জানালা বন্ধ করিয়া পোট্যাশিয়ম ক্লোরেটের উপর হাইড্রোক্লোরিক্ অ্যাসিড দিলে ক্লোরিণ নামক যে ধূম উৎপন্ন হয় সেই ধূমে মশকগুলি ঘরে তিষ্ঠিতে পারে না এমন কি তাহা উহাদের পক্ষে বিষবৎ হইবে।

ব্যক্তিগত সতর্কতা।

সূর্য্যাস্তের পর বাহির হওয়া উচিত নহে। যদি একান্তই আবশ্যক হয় তবে এরূপভাবে বাহিরে যাওয়া উচিত যাহাতে মশকে দংশন করিতে না পারে। মশারি ব্যবহার করা উচিত। বিনা মশারিতে অনাবৃত দেহে শয়ন করা উচিত নহে। ম্যালেরিয়া যখন সংক্রামকরূপে প্রকাশ পায় তখন **কুইনাইন** দ্বারা রোগীদের আশু প্রতীকার করা আবশ্যক এবং সেই সময়ে সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে **কুইনাইন** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যাবর্ত্তন নিবারণের জন্য নিয়মিতরূপে **কুইনাইন** সেবন করিতে হইবে। শীতল জলে স্নান, শৈত্যভোগ এবং দুষ্পাচ্য আহার্য্য পরিত্যাগ বিধেয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দেশের কথা।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের পরম শ্রদ্ধাষ্পদ লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে একটী বিরাট সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল। দেশের যাবতীয় গণ্যমান্য সাহিত্য-সেবীর একত্র সম্মিলন বড় সুন্দর হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর "ছত্রপতি শিবাজী চরিতের" দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপান হইতেছে, সত্বর প্রকাশিত হইবে।

আগামী শিল্প-প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অনেক প্রাচীন পুঁথি, হস্তলিপি, আলোক ও মানচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন।

অক্ষয়-তৃতীয়া।

ভারতের—ছায়াচ্ছন্ন শব্দলেশ-শূন্য—বনপথ
উজলিয়া চলে আজি হের দীপ্ত ওই মাতৃ-রথ।
ভস্মাবৃত-বহ্নি-রূপা মাতৃমূর্ত্তি তাহে সকরুণ
ম্লানহাস্যে অধরোষ্ঠ মর্ম্মব্যথা প্রকাশে দ্বিগুণ।
তবু সর্ব্ব দুঃখ-স্মৃতি মাতা আজি কথঞ্চিৎ ভুলি
আশীষেন পুত্রগণে আরক্তিম করপদ্ম তুলি'।
বহুদিন পরে আজি জীর্ণ তাঁরি স্বর্ণ-রথখানি
যতনে সংস্কারি' তাহে পুষ্পমাল্য কে সাজাল আনি!

চলিতেছে মাতৃরথ!—সেবা নামে দীর্ঘ কাছি তার
ধরিয়াছে কোটি পুত্রে। হে ভ্রাতঃ! এ বিশ্বজনতার
যে কাজেই রহ ব্রতী—এস, (আজি অক্ষয়-তৃতীয়া)
সঞ্চয় করহ পুণ্য ও রথের কাছি পরশিয়া।
সার্থক হউক জন্ম—নবতর ঐক্যের বন্ধনে
ত্রিশ কোটি প্রাণ আজি এক হোক্ জীবনে-মরণে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

চণ্ডীবাবু প্রবন্ধের আর একস্থানে লিখিয়াছেন ঃ—

"এই হরিনদীতে ব্রাহ্মণকুল-তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন অনেক কুলাচার্য্য ঘটক বাস করিতেন। এই মহাত্মাগণের মধ্যে গোপাল শর্ম্মা ঘটক মহোদয় কৃত 'ধ্রুবানন্দ মত ব্যাখ্যা' নামক কুলগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। এই ঘটক মহোদয়গণের কাহারও কাহারও বংশধরগণ এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হরিপুর নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। হরিনদীর ঘটকবংশ বলিয়া সমাজে ইঁহারা বিশেষ সন্মানিত।" আমাদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য যে, লেখক মহাশয় বোধ হয় অন্য কোন বংশের বিষয় জ্ঞাত না থাকায় কেবল ঘটকবংশেরই উল্লেখ করিয়াছেন। হরিনদী যখন সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল—পূতসলিলা ভাগীরথী যখন হরিনদীকে আপনার পবিত্র গর্ভে স্থানদান করেন নাই, তখন তথায় আরও দুইটী বিশেষ সম্মানিত ও সম্পন্ন বংশ বিরাজিত ছিল। সে দুই বংশ—'অধিকারী' ও 'ঘোষ চৌধুরী' বংশ। হরিনদীকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত দেখিয়া, ঘটক, অধিকারী ও ঘোষ চৌধুরী বংশীয়েরা তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান হরিপুর গ্রাম স্থাপন করেন। উল্লিখিত বংশত্রয় হরিপুরে আসিবার পূর্ব্বে "হরিপুর" গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। ঐ তিন ঘরকে আসিতে দেখিয়া হরিনদীর অন্যান্য অধিবাসীও কতক কতক হরিপুর আসেন, কতক কতক নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে বাস করেন ও কতক অধিবাসী কলিকাতার দক্ষিণ 'নোনা হিজুলী' অঞ্চলে গিয়া বাস করেন।

হরিপুর গ্রামে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের বাসস্থানের প্রায় ২ রশি পূর্ব্বদিকে গোপাল ঘটক মহাশয়ের বাসস্থান ছিল; প্রবন্ধ-লেখক শৈশবে গোপাল ঘটক মহাশয়ের বাড়ীও দেখিয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই; এখন সেই ভিটায় লোকে সরিষা বুনিতেছে; এবং ঘু ঘু চরিয়া অতীতের শেষ স্মৃতি বিলুপ্ত করিতেছে। তবে অন্য সরিকের ২।১ ঘর ঘটক এখনও বর্ত্তমান আছেন। অধিকারীবংশও মানে নিতান্ত হীন ছিলেন না, কিন্তু পরিবর্ত্তনপ্রবণ কাল এখন কেবলমাত্র তাঁহাদের ২।৩টীকে জীবিত রাখিয়া স্বকীয় অমিত তেজের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে। হরিনদী-বাসকালে ও হরিপুর আগমনের প্রথম সময়ে ঘোষ চৌধুরী বংশও খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে হীন ছিলেন না এবং তাঁহাদের জনবলও তৎকালে যথেষ্ট ছিল। আর এখন তাঁহাদেরই কীর্ত্তিমান বংশধর আমরা মাত্র ২ ঘরে ৪।৫টী বুভুক্ষু পুরুষ জীবন্মৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রবন্ধের এক স্থানে চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন—"কোন সময় হইতে হরিনদী শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।" আমরা উহার সঠিক সন-তারিখ দিতে না পারিলেও, এমন প্রমাণ পাইয়াছি যদ্দ্বারা বলিতে পারি নূন্যাধিক ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে হরিনদীর বিলোপ এবং হরিপুর গ্রামের সংস্থাপন সংসাধিত হইয়াছে। লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন—"দক্ষিণাংশ এইরূপে গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ার পর, উত্তরাংশের অধিবাসীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল।" আমাদের মতে ইহার বিপরীত হইয়াছিল; অর্থাৎ উত্তরাংশ এইরূপে গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ার পর দক্ষিণাংশের অধিবাসীরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

বালিয়াডাঙ্গা গ্রাম সংস্থাপন সম্বন্ধে আমাদের মতানৈক্য নাই; তবে ঐ বালিয়াডাঙ্গা গ্রামও যে, ভাগীরথীর স্বেচ্ছা-পরিত্যক্ত বালুকা-স্তপের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ স্থানও যে এক সময় পতিতপাবনী ভাগীরথীর পবিত্র সলিল সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আবাসস্থান লুপ্তনাম হরিনদীকে তিনি যে প্রীতির সহিত আলোচ্যের বিষয়ীভূত করিয়াছেন এজন্যও তিনি আমাদের বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

আমার ছোকরা চাকর।

আমি বেশ একটী চাকর পাইয়াছি। ছেলেটার বয়স কম—দেখিতে ভাল—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার বেশ মনে ধরিয়াছে। কাজেও খুব তৎপর—চরকির মত দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আলস্য নাই, ওজর নাই—হাস্যমুখে হুকুম তামিল করিতে সকল সময়ে প্রস্তুত। কিন্তু তার একটা বড় দোষ আছে, সে কথা পরে বলিতেছি।

শীতকাল—নিশি প্রভাত-প্রায়। লেপমুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। ঘুম আর হয় না—লেপ ছাড়িতেও ইচ্ছা করিতেছে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম,—"হরিদাস!"

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমার ছোকরা চাকরের নাম হরিদাস। হরিদাসকে ডাকিলাম; হরিদাস রান্নাঘর হইতে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে?"

আমি। চা হ'য়েছে ?

হরি। আজ্ঞে হ'য়েছে।

আমি। নিয়ে আয়।

হরি। আজ্ঞে যাই।

মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিদাস গরম চা লইয়া আসিল। আমি লেপমুড়ি দিয়া চা পান করিতে বসিলাম। খাইতে গিয়া দেখিলাম, চা অতিরিক্ত লাল হইয়া গিয়াছে। এক চামচে মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেখিলাম, চা তিক্ত—খাইবার অনুপযুক্ত। কোন মতে দুইচার চামুচ গলাধঃ করিয়া বলিলাম,—"তুই বেটা বড় আহাম্মক—এতক্ষণ ধরে চা টি-পটে রাখে। কড়া হ'য়ে গেছে—যা' আর খা'ব না।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হরিদাস উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, এই রকম করে চা কর্‌তে বামুনঠাকুর আমাকে শিখাইয়া দিল।"

আমি। তোমার মাথা শিখাইয়া দিল,—যা' এখন তামাক আন্‌গে যা।

হরিদাস ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া গেল এবং কলিকা-হস্তে চকিতমধ্যে ফিরিয়া আসিল। এত শীঘ্র তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এর মধ্যে কি করে তামাক সাজলি হরিদাস ?"

হরিদাস উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, আগে হ'তে আমি তামাক সেজে রেখেছিলাম।"

আমি পরম আপ্যায়িত হইয়া গড়গড়ার নল দশনে চাপিয়া ধরিলাম। টানিয়া দেখি—টান সরিতেছে না। আমি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলাম, "ওরে বাঁদর করেছিস্ কি ? যা, ছিঁচ্‌কে নিয়ে আয়।"

হরিদাস ক্ষিপ্রহস্তে কলিকা নামাইয়া জাঠে ছিঁচ্‌কা দিল। কিন্তু হতভাগা এত জোরে ছিঁচ্‌কা চালাইল যে, গড়গড়ার ক্ষণভঙ্গুর তলা মুহূর্ত্তে ছেঁদা হইয়া গেল। আমি মহা কুপিত হইয়া বলিলাম;—"হতভাগা বাঁদর, আর তোকে ছিঁচ্‌কে কর্‌তে হবে না—দূর হ। গাড়ুতে জল দিগে যা—গরম জল যেন দিস্।"

ছোঁড়া লাফাইয়া ছুটিয়া গেল। আমিও তামাকের আশা ছাড়িয়া চুরুট মুখে শয্যাত্যাগ করিলাম। পায়খানায় গিয়া শৌচকালে দেখি, বেটা গাড়ুর ভিতর Boiling hot জল পুরিয়াছে। এ স্বদেশীর দিনে, 'স্বদেশী' কাগজে ইংরাজী কথা! ছি, ছি! তা' আমি কি করিব ? Boiling hotএর বাঙ্গালা

যে আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। ফুটন্ত গরম বলিব? সে যাই হউক, জল এত গরম যে, কা'র বাবার সাধ্য গাড়ুতে হাত দেয়—শৌচ করা ত দূরের কথা। তখন আমি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে মুক্তকচ্ছ অবস্থায়, হাতে কাপড় ধরিয়া পায়খানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

স্নান করিতে বসিয়া হরিদাসকে তেল মাখাইতে বলিলাম। হরিদাস, চৌদ্দপুরুষের ভিতর তৈলমর্দ্দন করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।—সে অতি ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আমি সানুনয়ে বলিলাম,—"বাপু, একটু জোরে দেও।"

বেটা তখন এত জোরে তেল মাখাইতে আরম্ভ করিল যে, আমার পায়ের লোম পট্‌পট্‌ শব্দে ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি তখন সকাতরে বলিলাম,—"আর তোমায় তেল মাখাতে হ'বে না, বাবা—এখন দয়া করে জল আন।"

হরিদাস লাফাইয়া গেল; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই কলসী জল আনিয়া হাজির করিল। আমি গাড়ুর ঘটনা স্মরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জল গরম নয়ত রে?"

"আজ্ঞে না—ঠাণ্ডা।"

তখন মাথায় জল ঢালিতে অনুমতি দিলাম। হরিদাস হড় হড় করিয়া মাথায় জল ঢালিল। বাপ্‌ রে—কি ঠাণ্ডা! যেন হিমালয়শিখর-নিঃসৃত দ্রবীভূত হিমানী-ধারা! আমি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ইঙ্গিতে হরিদাসকে জল ঢালিতে নিষেধ করিলাম। বেটা তাহা বুঝিতে পারিল না—সমানে জল ঢালিতে লাগিল। আমি তখন শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লাফাইয়া উঠিলাম। মাথার উপর কলসী ছিল,—আঘাত লাগিয়া কলসী ভাঙ্গিল—আমার মাথাও ফাটিল।

আমার শরীর বড়ই খারাপ—ডাক্তারদের পরামর্শ মত আমি সন্ধ্যার পর একটু Vinum galici সেবন করিয়া থাকি। তোমরা হয়ত তাহাকে ব্রাণ্ডি বলিবে; কিন্তু ব্রাণ্ডি বলিলে বস্তুতঃই আমি প্রাণে ব্যথা পাইব। এক বোতল সোডা ওয়াটারে ছয় আউন্স মাত্র গ্যালিসাই মিশাইয়া পান করিয়া থাকি। অতএব আমি ব্রাণ্ডি বা মদ খাই না। সে কথা যাক্‌। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি আসিল,—আমারও মন বোতল পানে ধাবিত হইল। হরিদাসকে বলিলাম,—"বোতলটা নিয়ে আয় ত।"

হরিদাস ছুটিয়া গিয়া বোতলের ঘাড় ধরিল। আনিতে আনিতে মধ্যপথে [illegible]র মাথা আর মুণ্ডু—বোতল পড়িয়া গিয়া চুর্‌মার্‌ হইল।

একটু বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করা আমার অভ্যাস। আমি শয্যায় শুইয়া ওয়েল সাহেবের একখানা বই পড়িতেছি—মাথার কাছে টুলের উপর একটা সেজ জ্বলিতেছে—হরিদাস মেজেতে বসিয়া ঢুলিতেছে। রাত্রি যখন আড়াই প্রহর তখন আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমি চক্ষু বুজিয়া নিদ্রাঘোরে হরিদাসকে ডাকিলাম। তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞে।"

"আলোটা নিবাইয়া রাখ।"

হরিদাস ক্ষিপ্রহস্তে আলোটা উঠাইতে গিয়া সমস্ত তেলটুকু আমার মাথা ও বালিসের উপর ফেলিয়া দিল। আমার ঘুম তখন ছুটিয়া গেল। আমি তখন লাফাইয়া উঠিয়া সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই হরিদাসের গণ্ডদেশে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চপেটাঘাত করিলাম। লাভে হ'তে সেজটীও ভাঙ্গিল।

ভাবিলাম হরিদাসকে আর রাখিব না। হতভাগা যে কাজটা করিতে যায়, সেই কাজেই একটা না একটা গোল বাধাইয়া বসে। কিন্তু তা'রই বা অপরাধ কি? সেত নিয়ত আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। তবে সে অজ্ঞ—ঠিক উপায় জানে না। যে যেমন শিখাইয়া দিয়াছে, তাহার বুদ্ধিও সামর্থ্যে যাহা কুলাইতেছে সে তেমনই করিতেছে। আমার সন্তোষ-বিনোদন তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কখন সফলকাম হয় না।

আমিও যে সফলকাম হই নাই, প্রভু! আমিও হরিদাসের ন্যায় তোমার সন্তোষ-বিনোদনার্থ অহরহঃ চেষ্টা করিতেছি, বিশ্বপিতা! কিন্তু অজ্ঞ, জ্ঞানহীন আমি যে কোন উপায়ই জানি না। আমাকে পথ দেখাইয়া দেও, বিভো! আমাকে যে যা' পথ দেখাইয়া দিয়াছে—যে যা' শিক্ষা দিয়াছে, আমি সেই সেই পথ ধরিয়া—সেই সেই শিক্ষা মাথায় করিয়া তোমার প্রসন্নতা-লাভের আশায় ছুটিয়া চলিয়াছি; কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ পদে পদে তোমার বিরাগ-ভাজন হইয়াছি।

কোথায় অকূলের কাণ্ডারী, দয়াময় বিশ্বনাথ, আমার এ অজ্ঞানতা—এ মোহাচ্ছন্ন তামসান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া দেও। আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না,—আমি শুধু তোমাকে চাই—তোমার প্রসন্নতা চাই। কি করিলে আমি তোমাকে পাইব, আমাকে তাই বলিয়া দেও, বিভো!

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বড়ী-ভিক্ষা।

সুখহীন শান্তিহীন
একা বসে উদাসীন
সুদীর্ঘ অলস দিন
কাটাই কেমনে;
পরিজন-মাঝে বসে
দিনান্তের কাজ শেষে
একবার কভু কি সে
ভেবে দেখ মনে?
গৃহের উজল বাতি
খোকা-খুকি, দিন রাতি,
লয়ে সখী লয়ে সাথী
আছ তুমি সুখে;
আমরা দুটীতে শুধু
পুরাতন বর-বধূ—
মাঠের মাঝারে ধূ-ধূ
মরি মনোদুখে।
মানি বটে প্রকৃতির
শোভা হেথা বড় ধীর—
স্বচ্ছ কুয়ার নীর
বড় সুশীতল;
প্রত্যুষে দিগন্তে রবি
বড় সে জাঁকাল ছবি;
বিচিত্র বরণ পাখা
বিহঙ্গের দল।
বিজন মধ্যাহ্নে মানি
বড় মিষ্ট বংশীধ্বনি
ওপারের গ্রামখানি
হতে ভেসে আসে;

থেমে থেমে বার-বার
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার
কুহুধ্বনি সঙ্গে তার—
ভাসিয়া বাতাসে;
বিষন্ন প্রদোষে মানি
চঞ্চলা প্রকৃতি রাণী
বাতায়নে বিরহিনী
বধূটীর মত—
নক্ষত্র গবাক্ষে পশি'
একাকিনী থাকে বসি;—
মুখে পাণ্ডু-জ্যোৎস্না হাসি,
বুকে ব্যথা কত।
গৃহে মানি নাতি তব
সুবিচিত্র অভিনব
খেলাধূলা কলরব
করিছে নিয়ত;
হেমাঙ্গী-জননী তার
হাসাইছে অনিবার
প্রশ্ন করি দুনিয়ার
পণ্ডিতার মত।
মানি বটে বিদেশিনী
বালাদুটী— শ্যামাঙ্গিনী
আসে হেথা প্রতিদিনি—
গেয়ে যায় গান;
চুল বাঁধে, ফুল তোলে
সংসারের কাজ প'লে
ছেলে তুলে নেয় কোলে
সেজে দেয় পান;

মানি বটে সকলি এ
বিদেশ বিভূঁয়ে এলে
সকলেই সুখ বলে
মেনে নিতে চায় ;
আমি কিন্তু পারি কই
বিনা তোমাদের,—অই,—
কিবা দেশ কি বিভূঁই
বনবাস প্রায়।
স্বেচ্ছাকৃত বন্দী হয়ে
দারা আর সুত ল'য়ে
থাকিলে যার না বয়ে
যাক্,—মোর যায়।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এই
শুধু কি সম্পর্ক সেই
তাহা ছাড়া কিছু নেই
মন-প্রাণ-কায় ?
তারপর ভেবে দেখ
"পত্র লিখ-লিখ-লিখ
বিদেশে কেমন থাক
লিখিও সদাই—"
ভাল সেই কথা মত
পত্র লিখি ক্রমাগত
কিন্তু জবাবের মত
কিছু নাহি পাই।
এই মত কাটে দিন
সাথীহীন সঙ্গীহীন
শুধি পোষ্টাফিস-ঋণ
চিঠি লিখি খালি—
তবুও সুনাম নাই
রাগ গোঁসা সর্ব্বদাই
"নাই লেখ, নাই-নাই"
বলিছ কেবলি।

তারপর আরো শোন
খেতে শ্বশুরের অন্ন
করলা ভাতেতে ভিন্ন
আর কিছু নাই।
—"বার্ত্তাকুরে উষ্ণ জলে
বড়ীর সাথেতে ফেলে
আহা এই শীতকালে
খেতে কি মজাই।—"
বলিলে,—রন্ধনশালে
প্রবেশি গৃহিণী বলে,—
—কাঁদিয়া ধোঁয়ার ছলে,
"কোথা পাবে বাঁদী ;—
এযে আক্কুটে দেশ
সভ্যতার নাহি লেশ
নাহি ভূষা নাহি বেশ
সাধে আর কাঁদি।"
আমি বলি "হাঁ-হাঁ সেকি
তার লাগি ভাবনা কি
আছে মম এক—
ভালবাসে মোরে
ভালবাসা এইবার
করিব পরীক্ষা তার
চাহিব বড়ীর ভার
থরে-থরে-থরে।"
সে কারণ—
হইওনা নির্ভরসা।
বেশী করিনাকো আশা ;
শুধু দুটী বড়ী।
বড়-বড় ; কুমড়ার ;
তিল দেওয়া ; পরিষ্কার ;
কিন্তু যেন সঙ্গে তার
চেওনাক কড়ি।

আর কিবা লিখি বল ?—
বেলাটুকু পড়ে এল,
অতএব বাহিরিল
বামাপদ কবি।
দেখি যদি পর পত্রে
এমনি ছুচার ছত্রে
পারি দিতে লিপি গাত্রে
একখানি ছবি।
গুড়গুড়ি গড়-গড়
ডাকিতেছে নিরন্তর
আহা ও মধুর স্বর
বড় ভালবাসি।
উঠি তবে নিতান্তই ;
কলম মুছিয়া থুই ;
শট্‌কে ভাষায় কই
৮এ০ আসি।

(২)

চিঠি কই ডাক এল
যে যাহার নিয়ে গেল
আমি চেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্
"আপন্‌কো নাহি"—
ভাল কাজ নাই আর
কুহকিনী ছুরাশার
এ ছলনা বার-বার
দূর হোক্ ছাই।
নাই চিঠি নাই পত্র
ছুনিয়ার মাঝে কুত্র
হেন বন্ধু জ্ঞাতি গোত্র
লিখিতে যে চায়।

জগতের বিধি এই ;
রুক্ষ কেশে তৈল নেই ;
সে সব যা কিছু সেই
সতৈল মাথায়।
দিগন্তে পর্ব্বত আড়ে
রবি ওঠে বেলা বাড়ে ;
বিজন দিঘীর পাড়ে
চরিছে মরাল ;
ছাগশিশু মার সনে
চরিছে অদূর বনে ;—
তাই দেখে আনমনে
কাটে প্রাতঃকাল।
মধ্যাহ্নে ভোজন শেষে
রুদ্ধগৃহে পড়ি বসে
আঁখি ছুটী মুদে আসে
খালি ওঠে হাই ;
লেপখানি টানি গায়
শুয়ে পড়ি খাটিয়ায়
ঘণ্টা তিন চারি প্রায়
এরূপে কাটাই।
তারপর উঠে দেখি
কে যেন পাড়িছে উঁকি ;
এরি মধ্যে,—সম্ভবে কি—
পাতিবারে আড়ি
আসিয়াছে সন্ধ্যারাণী ?—
আমিও একটী বাণী
না করিয়া কানাকানি
ছেড়ে যাই বাড়ী।
ফিরে এসে দেখি হায়
অভিমানে চলে যায়,—
মলিন হাসিটী ভায়
বিষন্ন অধরে।

চন্দ্রসহ নিশীথিনী
বাড়ায়ে দুইটী পাণি
ঐ তারে নিল টানি
　　বক্ষের মাঝারে।
তারপর কক্ষে পশি.
কি করিব ভাবি বসি ;
সহধর্ম্মিণী আসি
　　বলে "পড় বই।"
আমি বলি "বউ, বই,
ছাড়া একদণ্ড কই
তোমাদেরি নিতান্তই
　　আর কারো নই।"
বলে "বেশ ঠাট্টা রাখ
'বিষবৃক্ষ' এই দেখ
ইংরাজী পড়োনাকো
　　এই পড় এবে।"
আমি বলি "তবে তাই,
তব কাড়া আজ্ঞা নাই ;
তুমি যা বলিবে তাই
　　করিতেই হবে।"
অতএব সেজ জ্বালি,
কামিজ খুলিয়া ফেলি,
মুখে দিয়ে পর্ণখিলি,
　　লেপ দিয়ে গায়
আরম্ভিনু বিষবৃক্ষ।—
ভিতরে মানস কক্ষ
বাহিরেতে অন্তরীক্ষ
　　প্লাবিত জ্যোৎস্নায়।
পড়িতে পড়িতে হায়
চন্দ্রালোক ডুবে যায়,
নগেন্দ্র নৌকায় পায়
　　ঝটিকা প্রবল ;

মৃদু-মন্দ সমীরণ
এখন সে প্রভঞ্জন
প্রতিদণ্ডে ধরা যেন
　　দেয় রসাতল।
তারপর কুন্দ দেখে
স্বপ্নের বিচিত্রালোকে
জননী তাহার—তাকে
　　ছায়া রেখাপাতে
দেখাইলা দুটী মূর্ত্তি।
যেন রে মদন রতি ;
কিন্তু করে এ মিনতি
　　"উহাদের সাথে
যাস্‌নে যাস্‌নে বালা
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা ;
প্রাণ হ'বে ঝালাপালা
　　উহাদেরি হাতে।"
কমল অমল-প্রভা
নারী-রত্ন সুদুর্ল্লভা ;
কেবা আত্ম পর কেবা
　　করেনা বিচার।
সূর্য্যমুখী পত্র লেখে—
"কমল এ পাপ থেকে
রাখগো আমারে ঢেকে—
　　করগো উদ্ধার।"
কমল-আসন টলে
মুৎসুদ্দি মশায়ে ফেলে
সতীশে লইয়ে কোলে
　　পিতৃগৃহে ধায় ;
আলোকময়ীর পাশে
সূর্য্যমুখী পুন হাসে ;—
কুন্দ-আঁখি নীরে ভাসে
　　ঈর্ষায় তায়।

তারপর সন্ধ্যাকালে
দীর্ঘিকার কালো জলে
দাঁড়াইয়া কুন্দ বলে
"বাঁচি কোন সুখে।"—
বড় দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়
অভাগিনী মৃত্যু চায়;
বুকফাটা বেদনায়
"না" "না" বলে মুখে।
অনাথিনী তারপর
ত্যজি লজ্জা ত্যজি ঘর;
অবহেলা অনাদর
কলঙ্কের ডালি
বহে ল'য়ে ওই যায়।
স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায়
মুগ্ধ আঁখি ফিরে চায়
দেখিতে কেবলি—
যে বিচিত্র মায়ালোকে
শুধু গো ব্যথার সুখে
বাড়বাগ্নি ধরে' বুকে
বেঁচেছে কেবল!—

আজিকে কি পাপে হায়
সে স্বপ্ন টুটিয়া যায়;—
—সে ব্যথা মরিতে চায়
জীবন-সম্বল!
সূর্য্যমুখী পতিপ্রাণা!—
তাই বলে আছে মানা
ভাল কেহ বাসিবেনা
যারে লাগে ভাল?—
যে বিশাল মহাসিন্ধু
হৃদয়ে ধরিছে ইন্দু—
সেই বক্ষে ধরে বিন্দু
বরিষার জল!
অনাথিনী অবলার
এ কাহিনী বার-বার
ভাল নাহি লাগে আর
—বন্ধ করি বই।
তারপর,—কি বারতা?—
একটা ঘরের কথা
কই তবে,—এই, যথা—
কই বড়ী কই?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

স্বপ্ন।

৫

বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া ক্ষয়কাশি পীড়াতে অত্যন্ত কাতরা ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসর। এই বালিকা এক-দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি যে ঘরে শুইয়াছিলেন ঐ ঘর সহসা আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে সেই বিস্তৃত আলো যেন এক স্থানে একত্রিত হইল এবং কেন্দ্রস্থানে তাঁহার একজন আত্মীয়ার মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। ঐ আত্মীয়া অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়াছিলেন। আত্মীয়া

স্ত্রীলোকটী বালিকাকে একটী জবাফুল ও বেলের পাতা ও একটী অপরিচিত ফল দেন, এবং তাহা খাইলে ঐ ক্ষয়কাশি আরাম হইবে এই কথা বলেন। পরে পীড়িতা তাহা সেবন করায় রোগ আরাম হইয়াছিল।

রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার মাতুলানী বিধবা হইয়াছেন। মাতুলের স্বাস্থ্য সে সময় ভাল ছিল, তাঁহার মৃত্যুর কোন আশঙ্কা ছিল না। পরে দেবেন্দ্র বাবু জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যে রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন সেই সময়েই তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইয়াছে।

বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রের নাম যামিনীকান্ত ও স্ত্রীর নাম ছিল কুমুদিনী। ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যামিনী তাঁহার স্ত্রীকে নিজবাটী ঢাকা জেলাস্থ কোরহাটী গ্রামে আনিলেন। তখন ঐ গ্রামে ওলাউঠা হইতেছিল। কুমুদিনী স্বীয় পতিকে বলিলেন যে, তাঁহাকে "এ সময় আনা হইল, পাছে কি হয়।" এই কথায় বোধ হয় যে কুমুদিনী ওলাউঠার ভয়ে ভীতা হইয়াছিলেন। ইহার দুইতিন দিন পর যামিনী কলিকাতা আসিলেন; তথায় অল্পদিন থাকিবার পর ১৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি প্রভাত হইবার সময় (তখন ৫টা বাজিয়াছিল) যামিনী স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার স্ত্রীর তলপেটে ব্যথা, হাতে খিঁচুনি (cramp) হইতেছে, এবং তিনি বারম্বার জল খাইতে চাহিতেছেন। যামিনীর তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বীয় পত্নীর ওলাউঠা হওয়া বিবেচনা করিলেন। স্বপ্নে তিনি কয়েকটী আত্মীয়স্বজনকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; এবং কুমুদিনীকেও শয়ানা দেখিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে (১৬ই অগ্রহায়ণ) তিনি সেই স্বপ্নের কথা আত্মীয়গণকে বলিয়া সেই দিনই বাড়ী রওনা হইলেন; এবং সেই দিনই রাত্রি ৮৷৯ টার সময় বাড়ী পৌঁছিলেন। তখন দেখেন যে, সত্যই তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্বরাত্রি দুই তিন ঘটিকার সময়, অর্থাৎ তাঁহার স্বপ্ন দেখিবার দুইতিন ঘণ্টা পূর্ব্বে, ওলাউঠা হইয়াছিল। যামিনী স্বপ্নে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, এবং যে ব্যক্তিদিগকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; তাহাই প্রকৃত পক্ষে দেখিতে পাইলেন। শেষ রাত্রি (১৬ই অগ্রহায়ণ) প্রায় প্রভাতের সময় কুমুদিনীর মৃত্যু হয়।

রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র মাহিস্তা একরাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে,

তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিতেছেন, মহিম বাবুর খুল্লপিতামহ আর দীর্ঘকাল বাঁচিবেন না। ঐ খুল্লপিতামহ মহিম বাবুর পিতার লোকান্তর হইতে তাঁহাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া লালনপালন করিতেন। যখন মহিম বাবু স্বপ্ন দেখেন তাহার অনেক দিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষেও এই স্বপ্নদর্শনের ১৫।১৬ দিন পরেই, মহিম বাবুর খুল্লপিতামহের মৃত্যু হয়।

একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা * যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী সত্য-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহার প্রথম স্বপ্নটী একটী গেলাসের বিষয়। ঐ গেলাসটী হারাইয়া গিয়াছিল ; অনেক অনুসন্ধানেও তাহা পাওয়া গেল না। যেদিন ঐ গেলাসটী হারায় সেইদিন রাত্রেই মহিলা স্বপ্ন দেখেন যেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহাকে বলিতেছে ;—"মা, তুমি গেলাস খুঁজিতেছ, গেলাস ময়লা-ফেলা নর্দ্দমায় পড়ে আছে।" পরদিন প্রাতে ঠিক্ সেই স্থানেই গেলাসটী পাওয়া গিয়াছিল।

মহিলার আর একটী স্বপ্ন এইরূপ। তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী কোন আত্মীয়া ৺পুরীধাম দর্শন জন্য গিয়াছিলেন। তৎপর দীর্ঘকাল ঐ আত্মীয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। একদিন রাত্রে মহিলা স্বপ্ন দেখিতেছেন যে ঐ আত্মীয়া এক-মাথা রুক্ষকেশ লইয়া মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছেন।" সত্য সত্যই পরদিবস ঐ আত্মীয় ঠিক্ সেই বেশে তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন।

মহিলার তৃতীয় স্বপ্ন তাঁহার গৃহপালিত হাঁসের বিষয়। হাঁসগুলির ডিম হইত না। তিনি সে জন্য অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার হাঁস ডিম পাড়িয়াছে। যথার্থই পরদিবস হইতে হাঁসগুলি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

---

* ইনি নিজের নামধাম লিখেন নাই।

কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী।

শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনে সর্ব্বদেশেই অনেক মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সমাজের শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত প্রণালী প্রচলিত থাকে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন প্রকাশ্য স্থানে নানা দেশের দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইলে, পরস্পরের তুলনায় শিল্পাদির উন্নতি হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ প্রদর্শনীর প্রচলন বিশেষ আবশ্যক। ভারতবর্ষে হিন্দু বা মুসলমান রাজত্বে বর্ত্তমান প্রদর্শনীর চলন না থাকিলেও কৃষিশিল্পাদির উৎকর্ষ কোন না কোন উপায়ে সাধিত হইত। মোগল সম্রাটদের 'নৌরোজা' যে বর্ত্তমান সময়ের প্রদর্শনীর স্থানীয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রভেদ এই—ইহা সাধারণ না হইয়া রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াতের সুগম হওয়ায় দূরত্ব ও অন্য অনেক অসুবিধা ঘুচিয়াছে; আর মুদ্রা যন্ত্রের দ্বারা সভ্যজগতের যে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজের সংস্পর্শে আমরা এই দ্বিবিধ সুবিধা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা—এই তিন উপায়ে ভারতবর্ষে একতার সূত্রপাত হইয়াছে।

য়ুরোপের প্রদর্শনী সমূহের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে জানা যায়, ইংলণ্ড এ বিষয়ে অগ্রণী। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃঃ-অব্দ ১৭৫৬-৫৭, কলা-সমিতি পারিতোষিক প্রভৃতির দ্বারা বিবিধ কলা-শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করায় বিবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী হইয়াছিল। ইহার পরে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে হস্ত ও যন্ত্রাদি নির্ম্মিত দ্রব্যের এক প্রদর্শনী হয়। ১৮০২ সালে বোনাপার্টের যত্নে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহার উপকারিতা দেখিয়া প্রতি তৃতীয় বৎসর প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এইরূপে প্রদর্শনীতে কতপ্রকার শিক্ষা লাভ হইতে পারে, য়ুরোপের সকল দেশেই ক্রমশঃ বুঝিয়াছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রিন্স অ্যালবার্ট ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। লোকে ইহা এতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, ১৮৫০ সালের ৩রা জানুয়ারী, এই বিষয় অনুসন্ধান করিতে, একটি রয়্যাল কমিশন বসিবার আদেশ হয়। সাধারণের টাকায় কাচনির্ম্মিত ক্রষ্টাল প্যালেস প্রদর্শনীর উদ্দেশে নির্ম্মিত হয়। ১লা মে ১৮৫১ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ অট্টালিকা পরিমাণে

১৮৫১ ফিট দীর্ঘ, ৪০৮ ফিট প্রস্থ, ৬৪ ফিট উচ্চ, ১৯ একার বা ৫৭ বিঘার উপর বাড়ীটি অবস্থিত। ইংলণ্ডে এই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী; ইহাতে যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল। ৫০৫১০৭ পাউণ্ড বা প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। সমস্ত ব্যয় বাদে ১৫০,০০০ পাউণ্ড বা সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক সহরে প্রদর্শনীর সূত্রপাত হয়। কোন কোন স্থলে প্রদর্শনী লাভজনক হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারণের যে শিক্ষা হইয়া থাকে সে হিসাবে ইহার মূল্য উঠিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৮৫৫ সালে ফরাসীরা প্রদর্শনী উপলক্ষে ২৪ একার বা ৭২ বিঘা জমীর উপর একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৮৫১ সালের লণ্ডন সহরের প্রদর্শনী অপেক্ষা ইহাতে বিবিধ ও নানা দেশীয় দ্রব্য ছিল। ইংরাজদের নিকট হইতে এই বিষয় শিক্ষা করিয়া অন্য দেশীয়েরা ইহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। ১৮৬১সালে ওলন্দাজেরা হারলেম ও বেলজিয়েনেরা ব্রাসেলে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী করে তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। ১৮৬২ সালে লণ্ডনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রিন্স অ্যালবার্টের চেষ্টায় সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৮৯সালে প্রেসিডেণ্ট কার্ণো প্যারিসের চতুর্থ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলেন। আড়াই কোটির উপর লোক প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল। এই প্রদর্শনীর "এফেল টাওয়ার" বিশেষ উল্লেখযোগ্য লৌহ নির্ম্মিত টাওয়ার উচ্চে ৯৮৪ ফিট। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শিকাগো সহরের সুবৃহৎ মেলার তুলনা হয় না। এই বিরাট প্রদর্শনীর ধর্ম্ম বিভাগ ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রদর্শনীর ধর্ম্মবিভাগে ভারতের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ১৯০০ সালের প্যারিসের প্রকাণ্ড প্রদর্শনী দেখিতে যদিও প্রায় ৫ কোটী লোক গিয়াছিল তথাপি ইহার খরচ উঠে নাই।

ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজত্বে যে কয়েকবার মেলা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসী প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ ভারতের হীন অবস্থা। ভারতবাসী প্রদর্শনীর উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেও সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারে নাই। প্রদর্শিত দ্রব্যাদি দেখিয়া উদ্যমশীল ধনী ব্যবসায়িরা ভারতীয় হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্যের অনুকরণে সস্তায় কলে তাহা উৎপন্ন করায়, এখানকার দ্রব্যাদি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। মান্দ্রাজে

১৮৫৭ সালের মেলাতে ভারতীয় দ্রব্যের অনুকরণে বিলাত হইতে কলে প্রস্তুত দ্রব্য আসিতে আরম্ভ হওয়ায় আমাদের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কলিকাতার ১৮৮৪ সালে জুবেয়ারের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর পর হইতেই বোধ হয় জার্ম্মাণি-প্রস্তুত পিতলের বাসনের আমদানি হইয়াছে। আমাদের যে যে বিষয়ে বিশেষত্ব আছে তাহা সাধারণ্যের নিকট প্রকাশ হইলে, সুচতুর ভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও আমাদের আবশ্যক মত দ্রব্যাদি কলে প্রস্তুত করিয়া তাহা আমাদের মধ্যে সস্তায় চালাইবার চেষ্টা করে। প্রমাণ স্বরূপ আমাদের তাঁত নির্ম্মিত বস্ত্রের পাড় নকল করিয়া ম্যানচেষ্টার কলে কেমন সুন্দর সুন্দর পাড় প্রস্তুত করিতেছে। এ পর্য্যন্ত এই কারণ বশতঃ প্রদর্শনীতে ভারতবাসীর আপত্তি থাকা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির এই আপত্তি খণ্ডন করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। অপরে যদি কোন জিনিষ সস্তায় দিতে পারে আমরা কেন পারিব না। বিদেশীয়েরা যৌথ কারবার করিয়া উন্নত হইতেছে, আমাদের মসীজীবিত্ব ত্যাগ করিয়া সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এবারকার কলিকাতার প্রদর্শনী দেখিলে প্রথমেই মনে হয়, য়ুরোপীয় উন্নত জাতির তুলনায় আমরা এখনও কত ছোট! দ্বিতীয় কথা এই মনে হয়, যে সুন্দর মনোহারী দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও কোন সামান্য জাতির নয়। জিনিষ ভাল হইলে তাহার বিক্রেতার অভাব হয় না। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যেমন তেমন করিয়া জিনিষ প্রস্তুত করিলে দেশী বলিয়া তাহা বাজারে কাটিবেই এই বিশ্বাস অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। বাজারে উৎকৃষ্ট বিদেশী জিনিষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের জয়লাভ করিতে হইবে, নচেৎ আশা নাই। কলিকাতা প্রদর্শনীতে যে সকল সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি আসিয়াছে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল। গত বৎসর বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে যে সকল মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কৃষিপ্রধান দেশে লাঙ্গল ও ভারবাহী জন্তু, কৃষি উৎপন্ন ও শ্রমজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী যে কত প্রয়োজনীয় তাহা আমরা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছি। ১৯০৫—০৬ বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের বিবরণী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির প্রণিধান-যোগ্য। আমাদের দেশে ধর্ম্মকর্ম্মের আনুষঙ্গিক যে সকল মেলা, বারোয়ারী হইয়া থাকে তাহাতে প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তুর প্রদর্শন হইয়া

থাকে। গর্ভমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ১৯০৫—০৬ সালে মেলা প্রভৃতির সাহায্যে ৩১৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রতি জেলায় প্রতি বৎসর একটী করিয়া মেলা করিয়া সাধারণের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি প্রতি জেলায় অসুবিধা হয়, বৎসরের মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে প্রত্যেক ডিভিসনের সদরে একটী করিয়া প্রদর্শনী হওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। গভর্ণমেণ্টের বিবরণীতে একুশটী স্থানের মেলার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। সকল মেলাতে গৃহপালিত পশু, কৃষি ও শ্রমজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী হইয়াছিল।

সিউড়ী পশু ও কৃষি শ্রম-শিল্প প্রদর্শনী—গাছ তুলা, গালা, রেশম, তসর ও সুতার কাপড় উল্লেখযোগ্য। কৃষকদিগকে মেসটন, (meston) লাঙ্গল ও অপর যন্ত্রাদির ব্যবহার শিখান হইয়াছিল। মন্থন-যন্ত্রাদির ব্যবহার দেখান হইয়াছিল। ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ দিন মাত্র খোলা ছিল।

ভিটা পশু প্রদর্শনী—২১শে ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রিতে মেলা হয়। প্রদর্শিত পশুর মধ্যে কোনটীই বড় ভাল নহে।

খাগরা পশু প্রদর্শনী—১৮ই জানুয়ারী খোলা হয়। অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল ও পশুও অনেক ছিল।

শ্রীপুর প্রদর্শনী—শ্রীপুর হইতে ২ ক্রোশ দূরে হুসেপুর গ্রামে ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী মেলা হইয়াছিল। হাতোয়ার রাজার ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এই মেলার কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইয়াছিল। সাধারণে ক্রমশঃ ইহাকে আদর করিতেছে।

সোনপুর মেলা।—ইহা বহুদিন হইতে হরিহরছত্রের মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দেশের মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ মেলা। নভেম্বরের পূর্ণিমাতে মেলা আরম্ভ হয় এবং এক পক্ষ থাকে। এবার ১০০০ হস্তী, ৫৭৫ গাভী, ২০৬০০ বলদ, ২১৮৫ ঘোড়া, ২০২৫ টাট্টু ঘোড়া, ৫৬৬ মহিষ ও ৩৫ উট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত ছিল। ইহার মধ্যে ৩০০০ ঘোড়া ও টাট্টু, ৫০০ হাতী, ৪১৭ গাভী, ৪৩২ মহিষ, ১৫৩০০ বলদ বিক্রীত হইয়াছিল।

বিহার শ্রম-জাত প্রদর্শনী।—সোনপুর মেলার সঙ্গে বসিয়াছিল।

পুরুলিয়া কৃষি ও পশু প্রদর্শনী।—১৯০৪—০৫সালে কৃষি ও শ্রম-শিল্পের উন্নতিকল্পে এই প্রদর্শনী প্রথমে খোলা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম

তিনদিন মেলা ছিল। বিবিধ দ্রব্যের উন্নতির জন্য পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ১০।১২ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বারাশত পুষ্প ও কৃষি প্রদর্শনী—পাট ও তুলার প্রচলনের পর এই মেলায় উহার প্রদর্শিত কৃষকদিগকে পারিতোষিক দ্বারা উৎসাহিত করা হয়।

বারঃপুর কৃষি ও পশু প্রদর্শনী—এই মেলা পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছিল। পশু চিকিৎসক পশুদিগকে ভাল বলেন নাই। স্থানীয় জমীদারগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে মেলা আরও ভাল হইতে পারে। আরা জেলার মহাকুমা বক্‌সারের অন্তর্গত এই বরাঃপুর গ্রাম।

মেদিনীপুর কৃষি প্রদর্শনী—কৃষি সংক্রান্ত পশ্বাদি ও কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। বড়ই সুখের বিষয় ইহাতে যে ৩৫৩৬৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, স্থানীয় লোকের চাঁদাতে সে টাকা উসুল হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। উক্ত টাকার মধ্যে ১০৭৪৲ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল।

সম্বলপুর প্রদর্শনী—হুমাগ্রামে এই কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী প্রথম খোলা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে ইহা কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

ঝিনাইদহ কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী—সাধারণ লোকেরা হস্তচালিত তাঁত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

ডুমকা প্রদর্শনী—সাঁওতালদের মধ্যে এই মেলা অনেক দিন হইতে প্রচলিত। বিবিধ পশু ও কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বাঁকুড়া কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী—গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক এই মেলা ১৫ই ফেব্রুয়ারী খোলা হয়। কৃষিবিষয়ক লাঙ্গলাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

তিনতানশা মেলা—মাঘী পূর্ণিমাতে এই মেলা বসিয়া থাকে। ভাগলপুর জেলায় প্রায় ত্রিশ হাজার লোকে এই পশুর মেলা দেখিতে আসিয়াছিল।

সীতামারি পশু মেলা—মজাফঃরপুর জেলায় রামনবনীতে এই মেলা হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্টের পশু-চিকিৎসক প্রদর্শিত পশুদিগকে ভাল বলেন নাই।

রাজনগর পশু মেলা—দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তর্গত রাজনগরে শ্রীপঞ্চমীতে এই মেলা হয়। দ্বারবঙ্গের মহারাজা ইহাতে সাহায্য করিয়া থাকেন।

থারসেয়ং অশ্ব, পুষ্প ও শাকসবজী প্রদর্শনী—এই প্রদর্শনীর দ্বিতীয় বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলিয়া মনে হয়। স্থানীয় লোক ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ইহা সফল হইয়াছিল।

খুলনা মেলা—গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে এই শিল্প ও কৃষি মেলা খোলা হইয়াছিল।

কালিম্ মেলা—পশু, শিল্প ও কৃষির মেলা—পশুচিকিৎসক বলিয়াছেন, পশ্বাদির খুব অবনতি হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

আঙ্গুল কৃষি ও শিল্প মেলা—উড়িষ্যা প্রদেশে। এই মেলাতে সামন্ত নৃপগণের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দ হয়। তাঁহাদের চেষ্টায় বিবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, আশা হয়, ইহা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই জানা যায় প্রদর্শনী দ্বারা আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে কৃষিশিল্পবিষয়ক জ্ঞান কি প্রকার সহজে বিস্তার লাভ করিতে পারে। এইরূপ সহজ লোক শিক্ষাপ্রদ আর কোন উপায় আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমাদের দেশের চিন্তাশীল ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যদি এইসকল মেলাতে প্রদর্শিত পশু ও কৃষিবিষয়ক দ্রব্য ভিন্ন সাধারণ শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে আধুনিক বায়োস্কোপে ও ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে স্বাস্থ্য ভূগোল ও নানা দেশের অনেক চিত্তাকর্ষক বিষয় দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সহজেই সফল হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া দেশের কল্যাণসাধনে সাহায্য করিবেন।

শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র।

দেশের কথা।

"বীরপূজা" প্রণেতা শচীশ বাবুর "বাঙ্গালীর বল" বাহির হইয়াছে। "বঙ্গগৃহ" নামে তাঁহার আর একখানি উপন্যাস ছাপা হইতেছে।

ওয়ালটেয়ারে দীর্ঘ-প্রবাসের পর শ্রদ্ধেয়া কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। সিন্ধু-তীরবর্ত্তী প্রবাসী কবিকে বহুদিনের পর আবার তাহার তীরে ফিরিতে দেখিয়া "জাহ্নবী" তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে।

অনেকের জানা নাই, চিত্রবিদ্যা না শিখিয়াও কবি গিরীন্দ্রমোহিনী চিত্র-শিল্পে—বিশেষ দৃশ্য-চিত্রে (Landscape Painting) প্রসিদ্ধ সিদ্ধহস্ত চিত্রকর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে তাঁহার অনেকগুলি চিত্র ও অন্য শিল্পাদি প্রদর্শিত হইতেছে। কবি-প্রতিভার এরূপ নানামুখী বিকাশ বাঙ্গালায় বিরল।

এবারকার ভারতীয় জাতীয় সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্ব্ব প্রথামত এবারকার মন্তব্যগুলি রাজ-প্রতিনিধিবর্গের নিকটে ভিক্ষা-প্রার্থনা নহে; জাতীয় সম্মিলন এবার রাজবিধির স্বাধীন সমালোচনা করিয়া নিজ মন্তব্য স্থির করিয়াছেন। প্রতি বৎসর যে সকল মন্তব্য আলোচিত হয় এবারও তাহাই হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তিনটী মন্তব্যে নূতন চিন্তার ফল দেখা দিয়াছে।

১ম—জাতীয় শিক্ষা। বিদেশীর হস্তে শিক্ষাভার থাকায় মানুষের পরিবর্ত্তে কেরাণীর সৃষ্টি হইতেছে। মানুষ গড়িতে হইলে শিক্ষা জাতীয় আদর্শে গঠিত হওয়া চাই। এতদুপলক্ষে বাঙ্গালার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ সমগ্র ভারতের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে।

২য়—স্বদেশী আন্দোলন। ইহা আজকাল এত প্রধান হইয়াছে যে ভারতীয় জাতীয় সম্মিলন ইহা ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

৩য়—বাঙ্গালার বিদেশীবর্জ্জন প্রতিজ্ঞা। বাঙ্গালীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, এই বিদেশীবর্জ্জন (Boycott) ভারতের সর্ব্বত্র গৃহীত হয়; কিন্তু তাহা হয় নাই। যাঁহাদের আঁতে ঘা পড়ে নাই, তাঁহাদের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? বঙ্গবিভাগ বশতঃ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি; আমাদের শত আবেদন ও বাদ প্রতিবাদ রাজপুরুষের কর্ণে স্থান পায় নাই, তাই আমরা বিদেশী দ্রব্যবর্জ্জন-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি। ভারতের অন্যপ্রদেশে এরূপ ঘটনা ঘটিলে বোধ হয় তদ্দেশ-বাসীরাও এই অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেন। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বন-ব্রত গ্রহণই যে শ্রেয়স্কর এবারের জাতীয় সম্মিলন তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রবীণ ও বিজ্ঞতম দাদাভাই নৌরজী "স্বরাজ" স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া সময়োচিত কার্য্য করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

কাগজ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর প্রণীত, মূল্য ।০আনা মাত্র—

রসায়নের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া ডাক্তার চুনীলাল বাবু, কাগজ ও তাহার নির্ম্মাণপ্রণালীর বিভিন্ন স্তরের সুচারু বিশ্লেষণ করিয়া 'কাগজ' নামে যে সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বাহাদুরী। যথার্থ সমালোচনা করিতে গেলে পুস্তিকাখানির আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইতে পারিলে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হয় না; পরন্তু অবিচার করাই হয়। সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথা লিখিবার বিষয়ে চুনীলাল বাবু সিদ্ধ-হস্ত। বইখানিতে যেরূপ সব বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পাঠকের বিস্তর সুবিধা হইবে। কাগজের ব্যবসায়ে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই **Monograph**খানি পাঠ করা অনিবার্য্য।

শান্তিশতক—শ্রীশ্রীশিহ্লণ মিশ্র প্রণীত, শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত ও শ্রীমতী মনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—

শিহ্লণ মিশ্রের শান্তিশতক সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, শশধর বাবু ইহাকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালা পাঠকের এ গ্রন্থ পাঠের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমতী মনমোহিনী দেবী এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শশধর বাবুর প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছেন। দেবী-প্রকাশিত রায়-অনূদিত শিহ্লণ মিশ্রের শান্তিশতক কর্ম্মফল-দুষ্ট নরনারীকে যে অন্ততঃ ক্ষণিক শান্তিও প্রদান করিবে তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ সৎসঙ্গের ন্যায়, কর্ম্মফলেরই পরিণাম। যাঁহাদের কর্ম্মফল ভাল, আশা করা যায় তাঁহাদের পক্ষে শশধর বাবুর শান্তিশতক পাঠ ঘটিয়া উঠিবে। যাঁহাদের কর্ম্মফল অন্যরূপ তাঁহারা একবার পুরুষ-কারের সাহায্যে এই গ্রন্থ পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখেন এই আমাদের অনুরোধ।

আদর্শ-গৃহিণী—শ্রীমতী নীতি কবিতা রচয়িত্রী প্রণীত—

যে উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থখানি লিখিত, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি লেখিকার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুর সংসার রক্ষা করিতে হিন্দু নারীই পারেন। পত্নীরূপে, মাতৃরূপে, কন্যারূপে ভগ্নীরূপে হিন্দুনারী নিজের অপূর্ব্ব গুণগরিমায় হিন্দুর সংসারকে মহিমান্বিত করিয়া তুলেন। যে সমস্ত সদ্‌গুণের সমষ্টিতে হিন্দুনারী আদর্শ গৃহিণীরূপে পরিকীর্ত্তিত হয়েন, সেই সমস্ত সদ্‌গুণের বিষয় বিশেষ দক্ষতার সহিত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের রচনা সুন্দর, ততোধিক সুন্দর যে আমাদের হিন্দুসংসারের একজন প্রকৃত আদর্শ গৃহিণী, এই 'আদর্শ গৃহিণী' রচনা করিয়া হিন্দুসমাজের তথা মহিলাকুলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পুস্তকে মূল্যের বিষয় উল্লেখ নাই; কিন্তু মূল্য যাহাই হউক প্রত্যেক হিন্দুনারী একখানি আদর্শ গৃহিণী কাছে রাখেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অচেনা।

চিনি না তোমারে, চিনাইব কারে,
—না জানি কোথায় ফুটিয়া;
মাঝে মাঝে শুধু করি অনুভব
মধুর অতুল ও অঙ্গ সৌরভ;—
হরষে তুলিয়া গুঞ্জন-রব,
উন্মাদ,—যাই ছুটিয়া!

মুদিত কমলে অন্ধ ভ্রমরী
হেথা-হোথা-সেথা কোথায় না ঘুরি,
ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে আসি ফিরি'
সংশয়-কাঁটা বিঁধিয়া!

কোথায় খুলেছ আনন-কমল,
বিমল মানসে, কর ঢল-ঢল,
দ্যুলোকে ভুলোকে ছোটে পরিমল,
আকুল ভ্রমরী কাঁদিয়া!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

উদ্ভিদের দুষ্টামি।

(৩)

ইহাদের দুষ্টামির অন্ত নাই; এরা জো পাইলে মানুষকেও ছাড়ে না। তাঁকেও ঠকাইয়া আপন কাজ উদ্ধার করিয়া লয়। কাজটা আর কিছুই নয়; সেই এক কাজ। সকলেরও যা, এদেরও তাই; অর্থাৎ বংশ-বিস্তার। এই যাদের আমরা বড় প্রশংসা করি, ভালবাসি, তাদের ব্যবহারটাই একবার দেখুন না কেন? কুল, আম, নেবু ইত্যাদি, এঁরা ত ফল। পেটুক এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই এঁদের ফল বলেন। তবে পেটুকের মন ভোজনে, তাই তিনি আঁটি ও খোসার মধ্যে যে রসাল ভাগ থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল ফলের আদর করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহা বড় একটা করেন না। তিনি ঐ আঁটিটারই বেশি আদর করেন। ঔদরিক ও বৈজ্ঞানিকে এই প্রভেদ। কিন্তু দুষ্টামিতে আঁটি,খোসা ও রসাল ভাগের মধ্যে বেশি প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।

কথাটা তবে খুলেই বলি। আর ওদের খাতির করিবার কোন আবশ্যক নাই। দেখুন, এই আম। জঙ্গলা আম নিতান্ত ছোট। কুলও তাই। অতি ক্ষুদ্র, অতি গরিব। তখন এদের ছোট আঁটি, ছোট খোসা; আর এ উভয়ের মধ্যের ভাগ ত নাই বলিলেও হয়। কোন পাখী, কি মানুষ, যার বুদ্ধি আছে, সে ঐ সুধু আঁটি-সার ক্ষুদ্র ফলটী কেয়ারও করে না। তবে কোন কোন বোকা পাখী, কিম্বা বোকা ছেলের একটু দৃষ্টি পড়ে। তাই তারা খায়। হয় ত এক জায়গায় খায়, আর এক জায়গায় আঁঠি ফেলে। পাখী একটি ফল আস্ত খেয়ে যদি উড়ে গেল, তবে দূর দেশেও আঁটিটি পাখীর মলত্যাগের সঙ্গে পড়ে যেতে পারে। এইরূপে কোন প্রকারে অতি কষ্টে এদের কিঞ্চিৎ বংশ বিস্তার হইতে পারে। কিন্তু এ অবস্থায় এই ক্ষুদ্র ফলগুলির যেরূপ দুর্দ্দশা,—না আছে রূপ, না আছে স্বাদ,—তাতে পাখী কিম্বা ছেলেপিলে কেহই এদের কাছে বড় বেশি ঘেঁষে না। এদের বংশ-বিস্তারও ভাল রকম হয় না। এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। তখন ইহারা কেমন দুষ্টামি করে দেখুন। আঁটিকে রক্ষা করার জন্যই বিশেষ চেষ্টা, আঁটিকে নানাস্থানে মাটিতে ফেলিবার জন্যই বিশেষ উদ্যোগ। এদের গাছগুলি ত আর চলে গিয়া নিজের আঁটি নিজে নানাস্থানে ফেলিয়া আসিতে পারে না; পারিলে বংশ-বিস্তার নিজেই করিত। কিন্তু সে সাধ্য নাই। * তাই ঔদরিকের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায় কি? তাই তাকেই ভুলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ত আঁটিও খাবেন না, খোসাও খাবেন না। কাজেই পরম নৈয়ায়িকের মত, ও দুটাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেয়। তখন অবশিষ্ট থাকে, কেবল মাঝের রসাল ভাগটা। সেইটাকে ক্রমে ক্রমে এমন মধুর এবং উপাদেয় করে তুলে, যে পাখী কেন, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও লোভসম্বরণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তা হলেই ত বড় আয়তন হ'তে হয়; মাঝের রসাল ভাগটা সুধু মধুর নয়, পেট ভরার মত হ'তে হয়। এক দিনে ত বেশি বড় হওয়া যায় না; তাই ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে। প্রথমে জঙ্গলা কুল, কিম্বা আম অতি ছোট ছিল; তারপর একটু বড় হল; কিন্তু আস্বাদটা বড় ভাল হ'ল না। কারণ, তখনও উহারা সুবিজ্ঞ মানবজাতির পাতে পড়িবে, এমন উচ্চাশা হৃদয়ে স্থান দেয়

* এস্থলে লতা-আমের গতিশক্তির কথা ভাবিবেন না। লতারা চিরদিনই কিছু বেশি বুদ্ধিমতী।

নাই। পাখীরাই ঠুক্‌রে অথবা গিলে খাইত, এবং বংশ-বিস্তারের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিত; ইহাই উহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে পাখীরা কষায় এবং অম্ল স্বাদ ভালবাসে; তাই উহারাও ঐ স্বাদ-বিশিষ্ট হইত। কিন্তু কালে পাখীরাও চালাক হইল। একটু ফলের জন্য কেন তাহারা একটা আঁটির বোঝা পেটে করে ব'য়ে বেড়াবে? তাতে তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গও হ'তে পারে। এই সব কারণে তাহারা আর আস্ত ফলটী বড় একটা গিলিত না; ঠুক্‌রে খেয়ে নিজের কার্য্য সিদ্ধ করে চলে যেতো। কিন্তু পাখীদের এই কু-ব্যবহারে ফলগুলির বিশেষ বিপদ উপস্থিত হইল। পাখীরা তাদের খাবার ভাগটা খেয়ে চলে যায়, আঁটিটি বোঁটার সঙ্গে ডালে ঝুলিতে থাকে। ইহাতে বংশ-বিস্তার হওয়ার বিশেষ বিঘ্ন হইতে লাগিল। তখন পাখীদের চতুরতার সঙ্গে না পারিয়া, বোকা মানবজাতির মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল।* খোসাটি নানাবিধ সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিল, পাখী তাহাতেও ভুলিল না; মানবের কিন্তু চক্ষু পড়িল। তখন আঁটি ও খোসার মধ্যভাগের পদার্থকে অতি সুস্বাদ ও সুমধুর করিয়া মানবের মন ভুলাইতে বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। উদর-পরায়ণ মানব তখন হইতেই অচ্ছেদ্য জালে বাঁধা পড়িয়া গেল। উহাদিগকে নানাপ্রকারে, নানাস্থানে বুনিয়া, বিবিধ উপায়ে উন্নতি-বিধান করিতে লাগিল। তখন দেখিল যে, সেই ক্ষুদ্র, কষায়, অথবা অম্ল ফলকে, নানা প্রযত্নে বৃহৎ, কোমল এবং মধুর করিয়া না লইলে, আর মানবের রসনা তৃপ্ত হয় না। উহারাও সেই দিকেই ফাঁদ পাতিতে লাগিল। এখন কাশীর কুল, মালদহের আম আস্তে আস্তে কত বড় আকার ও কি রূপ ধারণ করিয়াছে, কেমন সুস্বাদু হইয়াছে! আর মানবকে বোকা বানাইয়া নিজেদের বংশ-বিস্তৃতির কেমন সুবিধা করিয়া তুলিয়াছে। এরা কি কম দুষ্ট! এই কুল, আম ও লেবু,—ইহারা সবাই সমান; ইহাদের দুশ্চরিত্রের ইতিহাস একই প্রকার। কিন্তু তথাপি, ইহারা খাইতে দেয়। নিজেদের মত্‌লব সিদ্ধ করে করুক, মানবজাতিকে খাইতে দেয়; আর সুখাদ্যই দেয়। পেটে মারে না। কিন্তু যাহারা মানুষ হইয়াও অন্যের দ্বারা কেবল নিজের কাজই সিদ্ধ করাইয়া লয়, পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, তা'দের কথা আর কি বলিব। এই সকল উদ্ভিদও তাহাদের অপেক্ষা ভাল।

শ্রীশশধর রায়।

---

* 'Sagacity and Morality of Plants.'—Taylor; p 94—95.

প্রণাম।

ঋষিদের যজ্ঞস্থান, কি বিরাট ! কি মহান্ !
জগতপিতার ঐ মহোচ্চ মন্দির ;
শির চির-ধবলিত, তুষারেতে বিভূষিত,
হৃদয়ে অমৃত-ধারা—মন্দাকিনী নীর।
ঐ পুণ্যধাম হ'তে, বহন করিয়া স্রোতে,
জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র আর,—
পূত ভস্ম, যজ্ঞশেষ, নির্ম্মাণ করিলা দেশ,
সুদূর অতীতে এই জ্ঞানের আগার।
বিধাতা আপন করে, সাজাইলা স্নেহভরে,
রাখিলা "ভারত" নাম, জননী তোমার ;
তুমি বিধাতার মেয়ে, কে শ্রেষ্ঠ তোমার চেয়ে,—
তুমি চির-বরণীয়া জননী আমার।
ধাতার আশীষ-বাণী, বহন করিয়া আনি,
শুনায় কল্লোল-তানে সিন্ধু তব পাশে ;
ষড় ঋতু সুনিয়মে, তোমারি সেবায় ভ্রমে,
তুমি রাজরাজেশ্বরী, ধাতার আদেশে।
ধন, রত্ন, শস্য, ফল, নির্ম্মল পাণীয় জল,
তোমার ভাণ্ডারে মাগো পূর্ণ চিরকাল ;
সন্তানগণের তরে, কি নাই তোমার ঘরে,
তবু বুদ্ধিদোষে মাগো, আমরা কাঙ্গাল !
যা' হই তা' হইনা'ক, তুমি স্নেহদৃষ্টি রাখ,
অধম সন্তান বলি ঠেলিওনা পায় ;
ভুলি' মাতৃ-সেবা-ব্রত, করিলাম পাপ যত,
আজি প্রায়শ্চিত্ত তা'র, তোমারি সেবায় !
মাতৃ-সেবা ব্রত ধ'রে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে,
মোদের নয়নে চির-পুণ্যক্ষেত্র তুমি ;
কর পুত্রে আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ হ'ক মনোসাধ,
প্রণাম তোমার পদে অয়ি জন্মভূমি !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একা বিষ্ণুপ্রিয়া।

ত্রিজগতে একা বিষ্ণুপ্রিয়া!
সকলেই জুড়াইল চরণ পাইয়া,
সকলে কৃতার্থ হ'ল সে রূপ দেখিয়া;
পাইল না শুধু রাঙ্গা চরণের ছায়া,—
ত্রিজগতে একা বিষ্ণুপ্রিয়া!

প্রভু মোর কৃপাময়,—সন্ন্যাস করিলে;—
ত্রিজগৎ জুড়াইয়া দিলে।
কত রত্ন বিলালে কাঙ্গালে,
দুখীরে তাপীরে কোলে নিলে;
তবু নাথ জুড়ালে না ভুলি'—
শীতল চরণ-ছায়া দিয়া,
এ চির দুখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া!

প্রভু মোর, প্রাণনাথ মোর!—
আমারি সে গৌরাঙ্গসুন্দর,
তাঁর সেই সুন্দর বদন,
তাঁর সেই কমল নয়ন,
সবে দেখে নয়ন ভরিয়া—
বঞ্চিত একাকী বিষ্ণুপ্রিয়া!

মেঘ যবে বর্ষে বারিধারা,
সিক্ত হয় সমগ্র এ ধরা;
রবি যবে বিতরে কিরণ
আলোকিত হয় ত্রিভুবন;—
ওহে নাথ কোন অপরাধে,
সবে অধিকারী যেই পদে,
শুধু আছে বঞ্চিত হইয়া
তোমার দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া!

প্রভু মোর সন্ন্যাস করিলে,
মোরে শুধু দেখা নাহি দিলে ;
যে তোমার প্রিয় হ'তে প্রিয়া,—
বাঁচিবে না সন্ন্যাসী দেখিয়া !

সূক্ষ্ম পট্টাম্বর পরি অঙ্গে,
বেড়াইতে সহচর-সঙ্গে ;—
কেমনে দেখিবে তব প্রিয়া,
সেই তুমি কৌপিন পরিয়া !

গাঁথি মালা মালতীর ফুলে
বেড়ি' দিত যে চাঁচর-চুলে,
কেমনে সহিবে সে নয়ন
সেই শ্রীকেশের অন্তর্দ্ধান !

শান্তিপুরে সবে দিলে দেখা,—
বঞ্চিত সে বিষ্ণুপ্রিয়া একা।
সবা হ'তে আপন তোমার,
তাই তারে এত অত্যাচার !
তাই হ'ক ; দাসী তাই মাগে,—
বিশ্ব হ'ক আপনার আগে !

ঠাকুরের অদৃষ্ট।

(১)

মহেশ ঠাকুরের অদৃষ্টটা যে বড় ভাল ছিল না, ইহা গ্রামের সকলেই জানিত ; ঠাকুর নিজেও তাহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই তিনি এই স্বভাব-কুটিল নিয়তিচক্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করা অসম্ভব বোধে সেরূপ চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। সুতরাং বাধা বিহীন নদী-স্রোতের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী-বিরহিত অদৃষ্ট চক্রটা অপ্রতিহত বেগে এই নিরীহ ব্রাহ্মণটীর অগ্রে অগ্রে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতেছিল ; আর

ঠাকুর অন্ধ পথিকের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার অনুসরণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে সংসারের দুই একটা ধাক্কা আসিয়া তাঁহাকে পথচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল বটে, কিন্তু ঠাকুর স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যগুণে তাহাদিগকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে নিয়তি-চক্র-রেখাঙ্কিত পথে সমান ভাবে চলিতেছিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তিনি জীবনের ত্রিশটী বৎসর অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া দিলেন।

ঠাকুরের এরূপ চলিবার পক্ষে যে বিশেষ কোন বাধাবিঘ্ন ছিল তাহা নহে। সেই ক্ষুদ্র কুলবেড়ে গ্রামখানির উপর একটা আন্তরিক টান, আর সেই গ্রামে ছয় বিঘা পাঁচ কাঠা সাড়ে তিন ছটাক পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর জমি, বাস্তভিটার উপর দুইখানি ছোট ছোট খড়ো ঘর, ঘরের পশ্চাতে একটা পুরাতন বড় তেঁতুল গাছ ব্যতীত তাঁহার আর কোন সাংসারিক বন্ধন ছিল না। তবে তিনি ইচ্ছাতেই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক সংসারের আরও কতকগুলা বন্ধনে জড়িত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই বন্ধন গুলার প্রভাবেই ঠাকুর জীবনের অলস দিন গুলাকে এক প্রকার সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইয়া আসিতেছিলেন।

পতি-পুত্র-বিহীনা বৃদ্ধা কামারখুড়ীকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও না দেখিয়া আসিলে ঠাকুরের চলে না। সদয় পাল বড় গরীব, সব দিন আহার জোটে না, তাহার খোঁজ ত লইতেই হইবে। শবদাহ স্থলে তাঁহার উপস্থিতি ত চাই-ই। রাম চক্রবর্ত্তীর ছেলের কঠিন পীড়া; রাত্রিকালে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কে একক্রোশ দূরে ডাক্তার ডাকিতে যাইবে? ছেলেটী বেখোরে মারা যায়; কাজেই ঠাকুরকে ভিজিতে ভিজিতে অন্ধকার রাত্রিতে মেঠোপথ ভাঙ্গিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিতে হইল। ঘোষালদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব, অনেক লোক খাইবে, কিন্তু ভাত রাঁধিবার লোকাভাব; অগত্যা ঠাকুর মাথায় গামছা জড়াইয়া রৌদ্র ও অগ্নির সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সমস্ত গ্রামখানার মধ্যে যে অংশে যে কাজে লোকাভাব, অনাহুত হইয়াও ঠাকুর সেই খানে গিয়া সে অভাব পূরণ করিতেন। শেষে এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঠাকুর না থাকিলে সেই কুলবেড়ে গ্রামখানার একদিনও চলিত না, আর সেই গ্রামখানা না থাকিলে ঠাকুরেরও একটা দিনও কাটে না।

ঠাকুরের এখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি শ্রোত্রিয়; পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। চেষ্টা করিলে যে এতদিনে পণের টাকার যোগাড় না হইত এমন নহে, কিন্তু ঠাকুর কোন দিনই সে চেষ্টা করেন নাই। কেন

করেন নাই তাহা তিনিই জানেন। বোধ হয় নিজের উপর বা সংসারের উপর ঔদাসীন্যই ইহার কারণ।

(২)

সুখেই বল, আর দুঃখেই বল, দিনগুলা যদি চিরকাল একই ভাবে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সংসার-যন্ত্রটা এতদিন অচল হইয়া পড়িত। চির-কাল যেমন একটা সুর ভাল লাগে না, সংসারটাও তেমনই চিরদিন একই ভাবে একই রকমে ভাল লাগিতে পারে না, মাঝে মাঝে গতির পরিবর্ত্তন চাই। এই পরিবর্ত্তনের জন্যই তাহাতে এত বৈচিত্র্য এত মমতা, এত আশা এত ভরসা। ঠাকুরের অদৃষ্ট-চক্রটাও এই নিয়মের বশে এত দিনের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আর একটা নূতন পথে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মধ্যে তাঁহার এক শত্রুর আবির্ভাব হইল।

মনে করিও না, যে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই, সংসারে তাহার শত্রু থাকিতে পারে না। ইহা একটা মস্ত ভুল। ঘটনাচক্র এমনই কুটিল যে, কখন তাহার কোন্ একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রাবলম্বনে আর একটি প্রতিকূল ঘটনার উদ্ভব হয়, তুমি তাহার কিছুই টের পাইবে না। অথচ এক সময় হয় ত সেই অজ্ঞাত অচিন্তিত ঘটনা-সূত্র ধরিয়া একটা বিপদের করাল মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, মহেশ ঠাকুর জীবনে কাহারও কোনও অপকার করেন নাই, বরং প্রাণপণে উপকারই করিয়া-ছেন, তবে সহসা বৃদ্ধ মদন ঘোষাল তাঁহার প্রবল শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইলেন কেন? তোমরা হয় ত বলিবে, ঘোষাল মহাশয় এই পঞ্চান্ন বর্ষ বয়সে তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী লইয়া নূতন সংসার পাতিয়াছেন, মহেশ ঠাকুরেরও তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত আছে; বোধ হয় এই খানেই কোনও একটা গলদ আছে। কিন্তু আমরা জানি, এরূপ পাপবাসনা কোন দিনই ঠাকুরের হৃদয়ে ছায়া পাতও করিতে পারে নাই। তবে কেন এমন হইল? উত্তর—ঐ কুটিল ঘটনাচক্র। অতএব আইস, আমরা এই ঘটনাচক্রকে নমস্কার করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টের গতিটা পর্য্যবেক্ষণ করি।

ঘোষাল মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের পত্নী অন্নদাসুন্দরীর যৌবনও যেমন, রূপও তেমনই। তবে আক্ষেপের বিষয়, তাহার এই যৌবন—এমন রূপ এক পক্বকেশ স্খলিতদন্ত বৃদ্ধের হস্তে পড়িয়া মাটী হইতে বসিয়াছে। সংসারে রত্নের আদর নাই। থাকিলে এমনটা হইবে কেন? আর ঐ একজন

অবিবাহিত যুবা—ঐ যে হতভাগা মহেশ ঠাকুর, ফুলশরের আয়াস-সহকারে নিক্ষিপ্ত এত অস্ত্র, নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিয়া একটুও টলিবে না কেন? যদি সে এ রণে পৃষ্ঠভঙ্গও দিত, তাহা হইলেও কথা ছিল। কিন্তু সে যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অক্ষত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া তাহার এত কৌশল এত আয়াসকে ব্যর্থ করিবে, ইহা অসহ্য। সুতরাং অন্নদার সমস্ত রাগটা নিরীহ মহেশ ঠাকুরের উপর পড়িল। অন্নদা যখন তাঁহার উপর রাগিল, তখন ঘোষাল মহাশয় আর না রাগিয়া থাকিতে পারিলেন না, আর তাঁহার সঙ্গে সমস্ত সমাজটাই ঠাকুরের উপর খড়্গহস্ত হইল। কারণ তিনিই সমাজের মাথা। তখন এক অন্নদার পাপবাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া ঠাকুর একে একে উপেক্ষিতা অন্নদার, ঘোষাল মহাশয়ের এবং সমাজের বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িলেন। ঘটনা-চক্রের গতিই এইরূপ।

ঠাকুর কিন্তু প্রথম প্রথম এত কথা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম কেন, শেষেও পারেন নাই। না পারিলেও ইহার সম্পূর্ণ ফলটা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

(৩)

সে বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই চারিদিকে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইয়াছিল। সে কালব্যাধি একবার যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে-ছিল, সে বাড়ী শূন্য হইয়া পড়িতেছিল; গ্রাম উজোড় হইয়া যাইতেছিল। ক্রমে এই ভীষণ ব্যাধি কুলবেড়ে গ্রামে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশের সঙ্গেই গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। শবদেহে মাঠ ঘাট ভরিল। এই রোগের প্রবল আক্রমণে রামনাথ চক্রবর্ত্তী দুই পুত্র, পত্নী ও জামাতা সহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। বাড়ীতে রহিল কেবল তাঁহার শোকজীর্ণা বৃদ্ধা মাতা এবং সদ্যোবিধবা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা শ্যামা। তাঁহাদিগকে দেখিবার মধ্যে থাকিলেন, উপরে ভগবান্, আর দুনিয়ায় মহেশ ঠাকুর।

বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ঠাকুর সংসারের নিকট যতগুলা আঘাত পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই আঘাতটাই গুরুতর বলিয়া বোধ হইল। পরদুঃখ-কাতর হৃদয় পরের কষ্ট দেখিলেই ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্যামার বৈধব্য-যন্ত্রণাটা তাঁহাকে তদপেক্ষা একটু অধিক ব্যথিত করিল। ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে, তাঁহাদের উভয়ের বাল্য-ক্রীড়ার সহিত বুঝি একটা প্রণয়াত্মক ভালবাসার উদ্ভব হইয়াছিল—শ্যামার না হইলেও

অন্ততঃ ঠাকুরের হইয়াছিল। কারণ, ঠাকুর যখন প্রায় যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন শ্যামার জন্ম হইয়াছে; সুতরাং প্রণয়সঞ্চারের একটা প্রধান হেতু বাল্যক্রীড়াটা এখানে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তবে ঠাকুর যে শ্যামাকে ভালবাসিতেন, ইহা নিশ্চয়। সংসারে আসিয়া কবে যে তিনি পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া পিতার পিতৃব্য-পত্নীর হাতে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনেই নাই। তারপর সেই স্নেহশালিনী অথচ অপ্রিয়ভাষিণী প্রতিপালিকাও যে কালস্রোতে কবে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল, তাহাও বেশ স্মরণ হয় না। সুতরাং ঠাকুরের জীবনটা বড় নীরবে নির্জ্জনেই কাটিতেছিল। কিন্তু প্রতিবাসী রাম খুড়ার মেয়ে শ্যামা যখন হইতে বলিতে শিখিল, তখন হইতেই সে নিয়ত আসিয়া তাঁহার সেই চির নীরবতা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার স্তব্ধ-অবসন্ন জীবনটাকে সজীব করিয়া তুলিতে লাগিল। সেই ক্ষুদ্র বালিকার আদর, অভিমানে, আবদার ও তিরস্কারে ঠাকুর যেন জীবনে সেই প্রথম সুখের আস্বাদ—সংসারের মাধুর্য্য অনুভব করিলেন। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বালিকা বড় হইল; এক দুই করিয়া একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কিন্তু তখনও সে তাহার মহেশদা'র সঙ্গ ছাড়িল না। তাই তাহার ঠাকুরমা পরিহাস করিয়া বলিতেন, "তোর দাদাই বুঝি শেষে তোর বর হবে।" এই পরিহাসটায় ঠাকুরের মনে একটা নূতন আশা জাগিয়া উঠিত। কিন্তু যে দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্যামার পিতা কুলীন, তিনি শ্রোত্রিয়, সুতরাং শ্যামার সহিত তাঁহার বিবাহ অসম্ভব; সেই দিনই তিনি এ আশার মূলোচ্ছেদ করিলেন, ইহার দাগটুকু পর্য্যন্ত আর তাঁহার হৃদয়ে রহিল না।

তারপর শ্যামার বিবাহ হইয়া গেল। রাম খুড়া কুলীন জামাতাকে আপনার গৃহে আনিয়া রাখিলেন। শ্যামা তাঁহার সহিত সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। ঠাকুরও আপনার অদৃষ্টের পথে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিন শ্যামা পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়া কেবল বৃদ্ধা ঠাকুরমার হাত ধরিয়া অসহায় অবস্থায় সংসার-পথে দাঁড়াইল, সেই দিন হইতে ঠাকুর আবার তাহার ভার গ্রহণ করিলেন, সম্ভাবিত সহস্র বিপদের—সহস্র কষ্টের মুখ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

কিন্তু আমি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া একটী ভাল কাজ করিতে গেলে সকলেই যে তাহাকে ভাল কাজ বলিবে, কেহই যে তাহার ভিতর এতটুকু

ছিদ্র—এতটুকু তুরভিসন্ধি দেখিতে পাইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং ঠাকুরেরও এই সহানুভূতিপূর্ণ কাজটার মধ্যে কেহ কেহ একটী ছিদ্র—একটী অসদুদ্দেশ্য দেখিতে পাইল। যাহারা দেখিল তাহাদের মধ্যে ঘোষাল মহাশয়ই প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টা, এবং তাঁহার পত্নী অন্নদাসুন্দরীই ইহার নিরপেক্ষ সমালোচিকা। এই দর্শন ও সমালোচনার ফলে গ্রামের মধ্যে শীঘ্রই শ্যামার নামের সহিত বিজড়িত ঠাকুরের একটী কল্পিত অসদভিসন্ধি ও অপবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যদু দাঁর মুদীখানার দোকান, বড় পুকুরের ঘাট এবং চৌধুরীদের বৈঠকখানার পাশার আড্ডা হইতে ইহার একটী তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। পাঁচ-সাত দিন আন্দোলন চলিল। তারপর একদিন প্রকাশ্য সভায় ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহেশ ঠাকুর সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, ধোবা-নাপিত বন্ধ হইল, এবং যদিও তিনি তাম্রকূটভক্ত ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে হুঁকা প্রদানের নিষেধাজ্ঞাও প্রচারিত হইল। তারপর গ্রামখানা আবার শান্ত হইয়া পড়িল। কেবল মেয়ে-মহলে একটু আধটু আন্দোলন চলিতে লাগিল। দুই একটা রমণীসভায় অন্নদাসুন্দরী 'পোড়ারমুখী' শ্যামাকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-সূচক দুই চারিটী বক্তৃতা দিলেন।

(৪)

লোকে বলে 'স্বভাব না যায় মলে'। তাই এত নির্য্যাতনের পরও ঠাকুর আপনার দুষ্ট স্বভাবটীকে ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি সকল নির্য্যাতন—সকল অপবাদকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তবে একটা বিষয়ে ঠাকুর একটু আঘাত পাইলেন। এখন আর কেহ তাঁহাকে বিপদে-সম্পদে ডাকে না। তিনি অযাচিত হইয়া সাহায্য করিতে গেলেও কেহ তাহা গ্রহণ করে না। এ আঘাতটী তাঁহার পক্ষে বড় কম নহে। কিন্তু ইহাও তিনি সহ্য করিলেন।

ঠাকুর সহ্য করিলেও শ্যামার কিন্তু এতটা সহিল না। তাহাকে সাহায্য করিয়া একজন নিরীহ নির্দ্দোষী যে সমাজের এমন গুরুতর শাসনটা ভোগ করিবে ইহা বড়ই কষ্টকর। ইহার ত একটা উপায় করা চাই। তাই একদিন শ্যামা, ঠাকুরকে বলিল,—"এ দেশ ছাড়িয়া গেলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন,—"না।"

শ্যা। কেন?

ঠা। তাহাতে দুর্ণাম আরও বাড়িবে। এখনও ইহাতে যাহাদের সন্দেহ আছে, তাহারাও ইহা বিশ্বাস করিবে।

শ্যা। করে করুক, আমরা অনেক দূরদেশে চলিয়া যাইব।

ঠা। যেখানেই যাও এই মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা সঙ্গে যাইবে।

শ্যা। তবে উপায়?

ঠা। উপায় ভগবান।

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল,—"এক কাজ করিলে হয় না?"—

ঠা। কি?

শ্যা। তুমি আর এখানে আসিও না।

ঠা। তোমাদিগকে কে দেখিবে?

শ্যা। ভগবান।

ঠা। না শ্যামা, এ বিষয়টী আমি কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিব না। যদি পারিতাম, তাহা হইলে কখনই তোমাকে এই মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিনী হইতে দিতাম না। তুমি জান না, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার কি বিপদ হইতে পারে।

শ্যামা সে বিপদের কথা বুঝিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার কি মরণ হয় না?"—

ঠাকুর বলিলেন,—"মরণ একদিন হইবেই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মরণাধিক বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ!"

শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। ঠাকুর বলিলেন,—"চিন্তা কি শ্যামা,—মানুষের বিচারে কি হয়? ভগবানের নিকট বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকিলেই নিশ্চিন্ত।"

কিন্তু শ্যামা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একে শোকের তীব্র তাড়না, তাহার উপর লোকের তীব্র গঞ্জনা, শ্লেষোক্তি, সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের একমাত্র বন্ধু মহেশদা'র নির্য্যাতন; এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার উপর নব ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে আহারাদি বিষয়েও অনেক অত্যাচার চলিতে লাগিল। প্রথমে দেহ দুর্ব্বল, তারপর একটু একটু জ্বর, শেষে অত্যাচারে সেই জ্বর ভীষণভাব ধারণ করিল; শ্যামা শয্যাশায়িনী হইয়া কেবল মনে মনে বলিতে লাগিল,—"এ অভাগীর কি মরণ নাই ঠাকুর!"

ঠাকুর দেশে কবিরাজের নিকট ঔষধ পাইলেন না, বিদেশ হইতে ঔষধ আনিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়নের জন্য যাহার প্রাণ ব্যাকুল, সে কি ঔষধ খায়? সুতরাং কবিরাজের বটিকাগুলি শয্যার নীচেই পড়িয়া রহিল। শেষে একদিন নিদাঘের স্তব্ধ সন্ধ্যায় শ্যামা মৃত্যুর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সংসারের সকল যন্ত্রণা—সকল অপবাদ হইতে চির-মুক্তি লাভ করিল।

(৫)

ধিকি-ধিকি চিতা জ্বলিতেছে। ঊষার প্রথম রশ্মি আসিয়া তাহা স্পর্শ করিতেছে। ঠাকুরের অবশিষ্ট সংসার-বন্ধন—অদৃষ্টের শেষ সূত্রটাও বুঝি তাহার সঙ্গে পুড়িতেছে। শেষ থাকিতেছে, একটী নীল ধূম্ররেখা—তাহাও শেষে অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া যাইতেছে। তাহার পর শেষ আর নাই।

কুলবেড়ে গ্রামে বনের পাখীরা যখন প্রথম প্রভাতী সঙ্গীত গাহিল, গৃহস্থেরা যখন "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া শয্যাত্যাগ করিল, তখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে; শ্যামার শেষ চিহ্ন পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আর মহেশ ঠাকুর—গ্রামের লোকেরা খুঁজিল—ঠাকুর কোথায়? ঠাকুর কোথায়? ঠাকুর নাই। গ্রামখানা যেন একবার রুদ্ধ করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"ঠাকুর! ঠাকুর!" কিন্তু ঠাকুর কোথায়?—

ঠাকুর তখন অদৃষ্টের শেষ সূত্রটুকু ছিন্ন করিয়া, অনন্ত শান্তি, অনন্ত তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছে। পশ্চাতে পড়িয়া সংসার ডাকিতেছে,—"ঠাকুর! ঠাকুর!"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিরাশা।

এ হৃদে আমার জাগিছে সতত, দারুণ আকুল পিয়াসা;—
মিটিবে কি কভু পরাণের তৃষা, অথবা শুধুই নিরাশা!
আসি এ সংসারে, দারাপুত্র ল'য়ে, ভুলে আছি বিভু তোমারে;
ভ্রমেও ভাবিনা যেতে হ'বে ছেড়ে, আছে কাল বসে' শিয়রে।
পাতি' খেলাঘর খেলি নিশিদিন, মোহিনি মায়াতে ভুলিয়া,
কভু স্মৃতি-পটে জাগেনা সে দিন—সবে যাব যবে ছাড়িয়া।

শূন্য পড়ে' র'বে সাধের এ গৃহ, মোহ-অন্ধকার ঘুচিবে।
ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ও ব্যোমে, নশ্বর এ দেহ মিশিবে।
ভবনদী-তীরে দাঁড়াইয়া, যবে অকূল পাথার হেরিব,
নাহিক সম্বল কিসে হ'ব পার, এ কথা যবে গো ভাবিব ;—
ভীম উর্ম্মিমালা দিগন্ত ব্যাপিয়া আসিবে যবে গো গ্রাসিতে,
ল'য়ে শ্রীচরণ-তরী কৃপাসিন্ধু হরি লইও তরীতে ত্বরিতে।
শেষের সে দিনে তুমি নিরঞ্জন অকূল পাথারে ভরসা,
দিয়ে পদাশ্রয় ওহে দয়াময় ঘুচায়ো এ হৃদি নিরাশা!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রত্নপুরের প্রাচীন ইতিহাস।

ইংরাজী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে একদিন প্রভাতে আমরা সকলে রতনপুর (রত্নপুর) যাত্রা করি। মধ্যপ্রদেশের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রতনপুর, অমরকণ্টক প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ; যাঁহারা প্রাচীন হিন্দু-দিগের কীর্ত্তিকলাপাদি দেখিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা এ সকল স্থানে দেখিবার অনেক জিনিষ পাইবেন। এখানে বিধ্বস্তপ্রায় রাজপ্রাসাদ, ভগ্নাবস্থ দেবমন্দির, অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা প্রভৃতি দর্শকের মনে পুরাতন সমৃদ্ধি ও অতীত গৌরবের কথা জাগাইয়া দেয়।

রত্নপুরের স্থান-নির্দ্দেশ। মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বতম বিভাগের নাম ছত্রিশগড় ডিবিজন। রত্নপুর এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিলাসপুর জিলার অন্তর্গত ও উক্ত জিলার সদর (Head Qarters) বিলাসপুর সহরের প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। রত্নপুরে যাইতে হইলে প্রথমে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে বিলাসপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে হয় এবং তথা হইতে অশ্ব কিম্বা বলদের টোঙ্গা করিয়া রত্নপুরে যাইতে হয়। বিলাসপুর হইতে রত্নপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে।

রত্নপুরের প্রাচীনত্ব। রত্নপুর অতি প্রাচীন সহর। ইতিপূর্ব্বে যে ছত্রিশগড় ডিবিজনের নাম করিয়াছি, উহা ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ছত্রিশ-গড় রাজ্য নামে অভিহিত হইত। এই রাজ্য ছত্রিশটি দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই ইহার নাম ছত্রিশগড়। রত্নপুর এই ছত্রিশগড় রাজ্যের পূর্ব্বতন

রাজধানী। কথিত আছে যে, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে এখানেও আসিয়াছিলেন। এখানকার ইতিহাস যতদূর পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মহাভারতোক্ত রাজা মুরতধ্বজই * এখানকার সর্ব্বপ্রথম নরপতি। এই মুরতধ্বজ নৃপতির পুত্র তাম্রধ্বজ অর্জ্জুনের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধৃত করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপায়ে স্বীয় পরম ভক্ত মুরতধ্বজের কবল হইতে অশ্বের উদ্ধারসাধন করেন, তাহা জৈমিন পুরাণ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত অর্জ্জুনের আগমনের অন্য প্রমাণ, "ঘোড়বন্ধ্ তালাও" নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী এখনও এখানে বিদ্যমান আছে; প্রবাদ এইরূপ যে,অর্জ্জুনের অশ্ব এই পুষ্করিণীর তীরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল।

বর্ত্তমান রত্নপুর। এক্ষণে রত্নপুর একখানি মধ্যবিত্ত আকারের গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখনও এখানে পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ, বহু-সংখ্যক দেবমন্দির প্রভৃতি আছে। তাহা ছাড়া, রত্নপুর স্থানটি পুষ্করিণী-বহুল; এখানে প্রায় দুই শত পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে "দুল্‌হারা তালাও" ('তালাও' অর্থে পুষ্করিণী), "বিকোয়া (বিক্রম ?) তালাও" প্রভৃতি কয়েকটি পুষ্করিণী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। "বিকোয়া তালাও"এর দৃশ্যের সহিত রাজপুতানার পুষ্কর হ্রদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

রত্নপুরের প্রাচীন রাজবংশ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মুরতধ্বজই ছত্রিশগড়ের সর্ব্বপ্রথম রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইনি চন্দ্রবংশ সম্ভূত ও চন্দ্রবংশীয় হৈহয় নরপতির বংশধর ছিলেন; এ নিমিত্ত তৎবংশীয় রাজগণ হৈহয়বংশী নামে বিখ্যাত। অতি প্রাচীনকাল হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমন কাল (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) পর্য্যন্ত হৈহয়বংশীয়গণ ছত্রিশগড়ে রাজত্ব করেন। ইহাঁদের রাজধানী রত্নপুরে ছিল; এখানে অদ্যাপি কারুকার্য্যখচিত কিন্তু অধুনা-ভগ্নদশাপ্রাপ্ত দেবমন্দিরগুলি ও বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বাঁধান বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সমূহ তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া দুঃসাধ্য; তবে প্রচলিত প্রথা, প্রাচীন জীর্ণ পুঁথি, প্রবাদবাক্য, খোদিত প্রস্তরলিপি প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই সকল সংগৃহীত বিষয়গুলি রীতিমত ইতিহাসে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

* ইনিই বোধ হয় মহাভারতের ময়ুরধ্বজ। জাং সং।

হৈহয়বংশীয় রাজগণের তালিকা। আমরা এইস্থলে হৈহয়বংশীয় রাজগণের একটি তালিকা দিলাম। আমাদের প্রদত্ত তালিকা একটি প্রাচীন তালিকার অনুলিপি; এবং এই তালিকায় যে সকল রাজগণের নাম ও আনুমানিক সময় ক্রমান্বয়ে দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথাসাধ্য সঠিক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। অমরকণ্টক, রত্নপুর, কোশগাই, মলহর, শিউরিনারায়ণ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে যে সকল শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও এই সকল রাজগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—

	নাম	সময়		নাম	সময়।
১।	মুরতধ্বজ	অজ্ঞাত	২৯।	করমসেনদেও	১১২৬—১১৫৬ খৃঃ
২।	তাম্রধ্বজ	”	৩০।	ভানুসেনদেও	১১৫৬—১১৯৫ ”
৩।	চিত্রধ্বজ	”	৩১।	নরসিংহদেও	১১৯৫—১২২৫ ”
৪।	বিশ্বৎধ্বজ (বিশ্বধ্বজ ?)	”	৩২।	ভূসিংহদেও	১২২৫—১২৫০ ”
৫।	চন্দ্রৎধ্বজ (চন্দ্রধ্বজ)	”	৩৩।	প্রতাপসিংহদেও	১২৫০—১২৯৩ ”
৬।	মহীপালধ্বজ	”	৩৪।	জয়সিংহদেব	১২৯৩—১৩১১ ”
৭।	বিক্রমসেন	”	৩৫।	ধর্ম্মসিংহদেব	১৩১১—১৩৩৩ ”
৮।	ভীমসেন	”	৩৬।	জগন্নাথসিংহদেব	১৩৩৩—১৩৭১ ”
৯।	কুমারসেন	”	৩৭।	বীরসিংদেও	১৩৭১—১৪০৭ ”
১০।	কর্ণপাল	”	৩৮।	কমলসিংদেও	১৪০৭—১৪২৬ ”
১১।	কুমারপাল (কুঁয়ারপাল)	”	৩৯।	শঙ্করসায়দেও	১৪২৬—১৪৫৪ ”
১২।	মেরপাল	”	৪০।	মোহনসায়দেও	১৪৫৪—১৪৬২ ”
১৩।	মোহনপাল	”	৪১।	দাদুসায়দেও	১৪৬২—১৪৮৭ ”
১৪।	জাজুলদেও (জাজুলদেব)	”	৪২।	পুরুষোত্তম সায়দেও	১৪৮৭—১৫০৯ ”
১৫।	দেবপাল	”	৪৩।	বহীরসায়দেও	১৫০৯—১৫৩৬ ”
১৬।	ভুবপাল	”	৪৪।	কল্যাণসায়দেও	১৫৩৬—১৫৭৩ ”
১৭।	ভীমদেব	”	৪৫।	লক্ষ্মণসায়দেও	১৫৭৩—১৫৮১ ”
১৮।	কামদেব	”	৪৬।	শঙ্করসায়দেও	১৫৮১—১৫৯৬ ”
১৯।	মহুদেও (মহীদেব)	”	৪৭।	মুকুন্দসায়দেও	১৫৯৬—১৬০৭ ”
২০।	শূরদেও (শূরদেব)	৭৪৯—৭৯৮ খৃঃ	৪৮।	ত্রিভুবনসায়দেও	১৬০৭—১৬২২ ”
২১।	পৃথীদেও (পৃথীদেব)	৭৯৮—৮৫২ ”	৪৯।	জগমোহনসায়দেও	১৬২২—১৬৩৫ ”
২২।	বরমদেও (ব্রহ্মদেব)	৮৫২—৮৯৫	৫০।	উদলিসায়দেও	১৬৩৫—১৬৪৯ ”
২৩।	রুদ্রদেও	৮৯৫—৯৩৭ ”	৫১।	রণজিৎসায়দেও	১৬৪৯—১৬৭৫ ”
২৪।	জাজুলদেও	৯৩৭—৯৭১ ”	৫২।	তখৎসিংদেও	১৬৭৫—১৬৮৯ ”
২৫।	রতনদেও	৯৭১—১০১৫ ”	৫৩।	রাজসিংদেও	১৬৮৯—১৭১২ ”
২৬।	বীরসিংদেও	১০১৫—১০৪৮ ”	৫৪।	সর্দ্দারসিংদেও	১৭১২—১৭৩২ ”
২৭।	রতনসিংদেও	১০৪৮—১০৮৮ ”	৫৫।	রঘুনাথসিং	১৭৩২—১৭৪৫ ”
২৮।	ভূপালসিংদেও	১০৮৮—১১২৬ ”			

সর্ব্বপ্রথম রাজগণের বিষয়ে কোনও রূপ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও কোনও প্রবাদ প্রচলিত আছে; কিন্তু তাহাও অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন। মুরতধ্বজ ও তাম্রধ্বজের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মুরতধ্বজ লাভা নামক একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, তবে ক্রমে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, অমরকণ্টক নামক সহরটি (অবশ্য ইহা এখন আর সহর নাই, ইহার অনেকস্থল জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছে) রাজা চন্দ্রধ্বজের দ্বারা স্থাপিত হয় এবং ইহার নিকটস্থ আজমীরদুর্গ মোহনপাল-নির্ম্মাণ করেন। আবার, দশম নৃপতি কর্ণপাল ও সপ্তদশ নৃপতি ভীমদেব প্রত্যেকে স্ব-স্ব নামে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করান; এখনও সেগুলি বিদ্যমান আছে।

রাজা শূরদেব। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বিংশ নরপতি শূরদেবের সিংহাসনারোহনের পর হইতে ছত্রিশগড় রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। রাজা শূরদেব রত্নপুরে থাকিয়া উত্তরাংশ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মদেব দক্ষিণাংশ শাসন করিতে লাগিলেন ও স্বীয় রাজধানী রায়পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই সময় হইতে ছত্রিশগড় দুই রাজ্যে বিভক্ত হইয়া দুই পৃথক রাজবংশ দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইহা হইলেও রত্নপুর রাজবংশের শ্রেষ্ঠত্বের কোনও রূপ লাঘব হয় নাই। এই রাজবংশ সকল বিষয়েই সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন। প্রায় নয় পুরুষ রায়পুরে রাজত্ব করিবার পর, রায়পুর রাজবংশ নির্ব্বংশ হইয়া যায়, সেজন্য ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে রত্নপুর রাজবংশীয় জগন্নাথসিংদেবের পুত্র দেবনাথসিং রায়পুরের রাজা হন।

পৃথ্বিদেব। পূর্ব্বোক্ত শূরদেবের পুত্র পৃথ্বিদেব খৃঃ অঃ ৭৯৮ হইতে ৮৫২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি অতি উপযুক্ত ও সাহসী নরপতি ছিলেন এবং সর্ব্বদা বিদ্বজ্জনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন; মল্লার ও অমরকণ্টকে যে সকল খোদিত শিলালিপি পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহার গুণাবলী সুললিত সংস্কৃতছন্দে বর্ণিত আছে। তাঁহার নির্ম্মিত দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও মহামায়ীর মন্দির এখনও রত্নপুরে ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী রাজগণ। পৃথ্বীদেবের পর ব্রহ্মদেব প্রভৃতি রাজত্ব করেন; কিন্তু তাঁহাদের বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় না, সমস্তই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; তবে শিলালিপি প্রভৃতি হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, তাঁহারা সকলেই সুন্দররূপে রাজ্যপরিচালনা করিয়া প্রভূত যশলাভ করেন। এখন হইতে

প্রায় পঞ্চ শতাব্দীর ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। অবশেষে আমরা ত্রিচত্বারিংশৎ নৃপতি বহীরসায়ের রাজত্বকালে উপস্থিত হই। তিনি ১৫২০ খৃষ্টাব্দে কোশগাইদুর্গ নির্ম্মাণ করান; এই দুর্গে যে প্রস্তরলিপি পাওয়া যায় তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালে উত্তরদিক হইতে একটা মুসলমান অভিযান হয়, কিন্তু তিনি ইহা প্রতিহত করিতে সমর্থ হন।

কল্যানসায় দেও। বহীরসায়ের পুত্র কল্যানসায় খৃঃ অঃ ১৫৩৬ হইতে ১৫৭৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সম্রাট আকবরের গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া, দিল্লী যাইতে ও সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কল্প করেন; সেজন্য নিজপুত্র লক্ষ্মণসায়ের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি বহু অনুচর লইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। আট বৎসর পরে সম্রাট প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি লইয়া ও অন্য বহু সম্মানে ভূষিত হইয়া তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কল্যানসায়ের সমসাময়িক যে রাজস্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক পাওয়া যায় তাহাতে লিখিত আছে যে, তাঁহার রাজ্য আটচল্লিশটি তালুকে বিভক্ত ছিল এবং বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ ও ছোটনাগপুর বিভাগের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল। তিনি স্বীয় রাজ্য হইতে প্রায় ৬॥ লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব আদায় করিতেন। তাঁহার সৈন্যবল নিম্নলিখিত রূপ ছিল:—

খড়্গধারী	...	...	২০০০
ক্ষুদ্র অস্ত্রধারী	...	...	৫০০০
আগ্নেয়াস্ত্রধারী	...	...	৩৬০০
ধনুর্দ্ধারী	...	...	২৬০০
অশ্বারোহী	...	...	১০০০
		মোট	১৪২০০
হস্তী	...	...	১১৬

লক্ষ্মণসায় ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ।—ইঁহাদের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই অথবা ঘটিলেও তাহা জানিবার উপায় নাই।

তখৎসিংদেও:—ইনি স্বনামীয় তখৎপুর নামক স্থানে একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান ও তথায় একটি মেলার প্রবর্ত্তন করেন। উক্ত প্রাসাদের কয়েকটি দেয়ালমাত্র এক্ষণে অবশিষ্ট আছে; তবে মেলাটি এখনও আছে এবং এখনও তথায় বহুলোক সমবেত হয়।

রাজসিংদেও ঃ—তখৎসিংহের পুত্র রাজসিংহদেও রত্নপুরের পূর্ব্বদিকে আর একটি নূতন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান এবং একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান; রত্নপুরের যে অংশে প্রাসাদটি অবস্থিত, তাহাকে রাজপুর বলে ও পুষ্করিণীটির নাম "রাণী কে তালাও" (আমাদের কথায় "রাণীর পুকুর")। পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার ঘাটগুলি অতি বৃহৎ বৃহৎ সুদৃশ্য প্রস্তর-খণ্ডে বাঁধান। রাজসিংহের কোনও সন্তান না হওয়াতে তাঁহার পিতার খুল্লতাত সরদার সিংহ উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েন; কিন্তু রাজসিংহের ইহা ইচ্ছামত না হওয়াতে তিনি ব্রাহ্মণ দেওয়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া ও শাস্ত্রাদির মতগ্রহণ করিয়া কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিয়া লইলেন। এই পুত্রের নাম বিশ্বনাথ সিংহ। বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রেওয়ার রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুকাল পরে, এই দম্পতী একদিবস অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন; ক্রীড়কালে রাজপুত্র অসদুপায়ে কয়েকবার জয়লাভ করেন; ইহা জানিতে পারিয়া রাজকন্যা ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিলেন, "এরূপ অসদুপায় অবলম্বন করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়,কারণ তুমি ব্রাহ্মণও নও, রাজপুতও নও।" জন্মবিষয়ে এরূপ উপহাসাস্পদ হইয়া বিশ্বনাথ সিংহ ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন। রাজসিংহ এ সংবাদ শুনিবামাত্র, দেওয়ানের দোষে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল ও তাঁহার নির্ম্মলকুলে কালী পড়িল স্থির করিয়া, দেওয়ানের উপর প্রতিশোধ লইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সে সময়ে রত্নপুরের একটা অংশ দেয়ানপাড়া নামে অভিহিত হইত; এখানে দেওয়ান আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। রাজসিংহ ক্রোধে অন্ধ হইয়া 'দেওয়ান পাড়া' আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ভূমিসাৎ করেন। এই ধ্বংশ কার্য্যে অনেক প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি নষ্ট হয়। কথিত আছে, স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪০০ লোক ইহাতে নিহত হয়। অতঃপর রাজসিংহ রায়পুর রাজবংশীয় মোহন সিংহকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মোহনসিংহ বীর্য্যশালী ও সুপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে রাজসিংহ অশ্ব হইতে পতিত হওয়ায় তাঁহার জীবনসংশয় হয়; তিনি মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া মোহন সিংহ ও সর্দ্দার সিংহ উভয়কে ডাকিয়া পাঠান; দুর্ভাগ্যক্রমে মোহন সিংহ শিকার ব্যপদেশে থাকায় তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না; সেজন্য মৃত্যুকালে রাজসিংহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় রাজমুকুট সর্দ্দারসিংহের মস্তকে স্থাপিত করেন। এদিকে, কয়েকদিন পরে মোহন সিংহ

শিকার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্দ্দার সিংহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিলেন। ইহাতে মোহন সিংহের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং "ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য অধিকার করিব" এইরূপ ভয় দেখাইয়া রত্নপুর হইতে তিনি প্রস্থান করিলেন। যাহা হউক, সর্দ্দার সিংহ ২০ বৎসর নিরাপদে রাজ্যশাসন করেন। তিনি নিঃসন্তান হওয়াতে তাঁহার ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ভ্রাতা রঘুনাথসিংহ খৃঃ অঃ ১৭৩২ সালে সিংহাসনারোহণ করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র সেনাপতি ভাস্কর পন্থ ছত্রিশগড় আক্রমণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে রঘুনাথসিংহের একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন; সুতরাং তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে কোনও রূপ যুদ্ধায়োজন না করিয়া ভগ্নহৃদয়ে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহারা রাজধানী রত্নপুর আক্রমণ করিয়া কিয়দংশ ধ্বংশ করিলে পর রঘুনাথসিংহের এক রাণী দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া সন্ধিপতাকা প্রদর্শন করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে যে হৈহয়বংশ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন, এইরূপে তাহার অধঃপতন হইল।

মহারাষ্ট্র সেনাপতি রত্নপুরের কোষাগার লুণ্ঠন করেন, এবং দণ্ডস্বরূপ এক লক্ষ মুদ্রা দক্ষিণা লইয়া রঘুনাথ সিংহকে ভোঁস্‌লাদিগের নামে রাজ্য পরিচালনা করিবার অধিকার দিলেন।

পূর্ব্বে যে মোহনসিংহের উল্লেখ করা হইয়াছে,তিনি রঘুনাথ সিংহের বিপক্ষে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া রঘুজী ভোঁস্‌লার দলে যোগদান করেন। রঘুজী রঘুনাথসিংহের মৃত্যুর পর ছত্রিশগড়ের সিংহাসন মোহন সিংহকে দান করেন। রঘুজীর মৃত্যুর পর ভিম্বাজী উক্ত রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। মোহনসিংহ এই সংবাদ পাইয়া ভিম্বাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন; কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভিম্বাজী রাজ্যগ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই মহারাষ্ট্রশাসনের সূত্রপাত হয়।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র।

ভারতীয় শিল্পসমিতিতে গায়কোয়াড়ের বক্তৃতা।

বিগত ১৪ই পৌষ ভারতীয় শিল্পসমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বরদার সুশিক্ষিত ও স্বদেশ-হিতৈষী মহারাজা শ্রীযুক্ত সয়াজী রাও গায়কোয়াড় ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা পাঠ করেন তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীর

বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা—বিষয়টীকে এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় কেবল 'অতীত ইতিহাস'এর মর্ম্মানুবাদ দিলাম।

অতীত ইতিহাস।—ভারতের শিল্প-বাণিজ্য বহু প্রাচীন। অতি পুরাকাল হইতে সিরীয়া ও ব্যাবিলনের সহিত ভারতের বস্ত্র-ব্যবসায় চলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ভারতের তুলা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবর্ষের এক জাতীয় বৃক্ষের মাথায় এক প্রকার পশম জন্মে, ইহা ভেড়ার লোম অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান ও সুন্দর।"

খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সিন্ধুনদ হইতে রেশমের সূতা, জাফ্রান, নীল, তুলা প্রভৃতি য়ুরোপে রপ্তানি হইত! জগতের শীর্ষস্থানীয় রোম ও বিখ্যাত বন্দর আলেক্‌জ্যান্দ্রিয়া এবং অন্যান্য স্থান হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাচ, মরীচ প্রভৃতি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বন্দর বরোচে আমদানী হইত। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর রোমের ও আলেকজ্যান্দ্রিয়ার পতন হইলে ভারতীয় বিবিধ পণ্য-শিল্পজাত দ্রব্য কনষ্টাণ্টিনোপল ছাইয়া ফেলিয়াছিল; কনষ্টাণ্টিনোপলের তখন উঠ্‌তি অবস্থা। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও দশম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা হিয়ান ও হিউয়েন সাং ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছেন। যব ও অন্যান্য দ্বীপে হিন্দু-ব্যবসায়ীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ফা হিয়ান স্বয়ং হিন্দুদিগের জাহাজে চড়িয়া তাম্রলিপ্তি বা তমলুক হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। য়ুরোপপ্রবাসীরা লীডেনের যাদুঘরে হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। যবদ্বীপ হইতে ওলন্দাজেরা এই সকল মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া উক্ত যাদুঘরে রাখিয়াছেন। য়ুরোপে যখন মধ্যযুগ, সেই সময়ে ভিনিসের পথে ভারতের বাণিজ্যাদি চলিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ভাসকো দি গামা ভারতের পথ আবিষ্কার করিলে পোর্টুগীজেরা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, এবং ভিনিস হৃতগৌরব হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ এসিয়ার সাগর-প্রক্ষালিত চীন পর্য্যন্ত পোর্টুগালের শাসনাধীন হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্টুগীজের কীর্ত্তিকেতু ওলন্দাজের করতলগত হইয়াছিল। উভয় জাতিই ভারতের সহিত ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছিল। ইহার কিছু পরেই, ইংরাজেরা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এই ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায়, ওলন্দাজেরা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। বড়ই বিস্ময়ের বিষয়

গত সহস্র বৎসরে ভারতের সহিত ব্যবসা করিয়া য়ুরোপীয় জাতিসমূহের ক্রমান্বয়ে একটির পর একটির অভ্যুত্থান হইয়াছে। পুরাকালের ফিনীসীয় ও আরবের মত কনষ্টাণ্টিনোপল, ভিনিস, পোর্টুগাল, হলাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতির অধিবাসীরা ভারতের শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্য য়ুরোপে লইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের বাণিজ্য-নীতি।—ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের শাসনাধীন হইতে লাগিল এবং এই সময় হইতে ভারতের বাণিজ্যও ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। আয়ার্ল্যাণ্ড ও আমেরিকায় ইংলণ্ড যে বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইংরাজের শাসনাধীন হইবার পরে ভারতবর্ষেও সেই নীতি চলিতে লাগিল। অধীন দেশসমূহ হইতে উপকরণ (Raw materials) সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে নিজের দেশে বিবিধ শিল্পজাত ব্যবসায়ের সৃষ্টি এবং অধীন দেশসমূহের শিল্পবাণিজ্যের উপর অন্যায় শুল্ক বসাইয়া নিজের শিল্পের উন্নতি করাই—ইংরাজের বাণিজ্য-নীতি। সকল অধিকৃত দেশেই ইংলণ্ড এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্য স্বাধীন হইয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্য-দাসত্ব হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের দুর্গতি ঘুচিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই উভয় দেশের শিল্পের যথেষ্ট অবনতি ঘটিল, কিন্তু ইংলণ্ডের আশাতীত উন্নতি হইতে লাগিল। * যখন ইংলণ্ড দেখিলেন অধীন দেশের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার বাণিজ্য-নীতির পরিবর্ত্তন করিলেন এবং নৌ সম্বন্ধীয় আইন (Navigation Act) ও অন্যায় শুল্ক গ্রহণ ইত্যাদি উঠাইয়া দিলেন। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-নীতি কতকটা ন্যায়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল এবং ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল দেশ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ইংলণ্ড তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম।

(ক্রমশঃ)

---

* পরে বাষ্পচালিত যন্ত্রের উদ্ভাবন হওয়ায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সম্পদ স্বল্পকালে জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

সান্ত্বনা।

(কোনও পুত্রশোকসন্তপ্তা নারীর প্রতি।)

১

একাকিনী, বসি এই কাননে বিজন,
কেবলি, কেবলি কেন করিছ ক্রন্দন ?
দিন নাই, রাতি নাই—কেবলি ভাবিছ তাই !
সরোজে নীহারবিন্দু কেন অনুক্ষণ
ছি-ছি,—এস, মুছে ফেলি' সজল নয়ন।

২

পাগলিনী প্রায় কেন কাঁদ অকারণ ?
সে গেছে, যেথায় নাই যাতনা, বেদন ;
বিষম বরিষা ঘন, ভীম মেঘ-গরজন,
নিদাঘ সন্তাপ নাই, তুষার ভীষণ।
মধু চিরদিন সেথা, সুখেরি সদন !

৩

না পশিতে পাপ-কীট, কুসুমের কলি
বিকশিত পুণ্যধামে, গিয়াছে সে চলি'।
বাড়িবে স্বরগ-শোভা,—অনন্ত সৌরভ-প্রভা
বিতরিবে চারিধারে, মোহিয়ে সকলি।—
ভাসায়ো না বক্ষঃ, বৃথা অশ্রুধার ফেলি।

৪

যায়—পুনঃ আসে—এই দেখিছ জীবনে ;
তবে কেন ভুলে আছ মোহের স্বপনে !
চেয়ে দেখ, আঁখি মেলি, সেই শশী অংশুমালী,
আলোক আঁধার সেই, নাচায় ভুবনে ,-
মুছে দি' নয়ন,—তোল আনত বদনে।

৫

পরিহরি সরোবক্ষঃ সরসী-জীবন
যায় চলি, লুকাইয়ে অযুত যোজন ;
হাসে ধরি' রবিকরে, আবরিয়ে সুধাকরে ;—
অপরূপ রূপে সাজি, সাজায় গগন,
রঞ্জিয়ে বিবিধ বিম্বে মায়েরি বদন।

৬

আবার অমিয়ধারা হয় বরিষণ,
সরসী ফিরিয়া পায় আপন জীবন !
শতপুষ্প লয়ে কোলে আনন্দ হিল্লোলে দোলে !
যায়,—পুনঃ আসে,—এই বিধির লিখন ;—
উঠ,—মাথা তোল—শুন সান্ত্বনা-বচন !

৭

উঠ, মাথা তোল,—শোন সান্ত্বনা-বচনে,
পাইবে আবার তুমি হৃদয়-রতনে !
বুঝাও, অবোধ মন, ফিরে পাবে হারাধন ;
নবীন সরোজ পুন ফুটিবে জীবনে ;—
উঠ, মাথা খাও—শূন্য গেহ তোমা বিনে !

——তিমির।

দাসীর নিবেদন।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণমহিলাগণের নামের শেষে 'দেবী' এবং অন্য জাতীয়া স্ত্রীলোকগণের নামের শেষে 'দাসী' আখ্যা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ প্রথা অতি প্রাচীন। প্রাচীন কালে যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন ; লোকহিতকর উপদেশ ও বিধিব্যবস্থা প্রদান করিতেন এবং

নির্জ্জনে জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই জ্ঞান সাধারণে প্রচার করিয়া জগতের হিতসাধন করিতেন; 'ব্রহ্মজ্ঞ' বলিয়া তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জনসমাজের অপর সাধারণ লোক এজন্য আপনাকে ব্রাহ্মণের 'দাস' মানিয়া কৃতার্থ হইতেন। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানালোচনা ও নির্লিপ্ত ভাবে ভগবৎ আরাধনার জন্য লোকালয় হইতে দূরে তপোবনে আশ্রম রচনা করিয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। ব্রাহ্মণরমণীগণ তাঁহাদের স্বামী পিতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট সকল বিষয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিলাসবাসনা শূন্য এবং গৃহী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। আশ্রমস্থিত শিক্ষার্থীগণকে তাঁহারা পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিতেন; বন্য পশুগণকেও পর্য্যন্ত এত স্নেহ করিতেন যে, তাহারা তাহাদের স্বভাবসুলভ হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি ভুলিয়া যাইত। এই জন্যই বোধ হয় সেকালের তপোবন বর্ণনায় ভেক-ভুজঙ্গ এবং শার্দ্দুল-মৃগের একত্র বাসের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সেই দেবহৃদয়া ব্রাহ্মণরমণীগণ অপর জাতীয়া রমণীগণকে পাতিব্রত্য, গার্হস্থ্য-সেবাধর্ম্ম প্রভৃতি নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্যসমূহে শিক্ষা দিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা জনসমাজ কর্ত্তৃক সম্ভ্রমসূচক 'দেবী' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন।

অপর সাধারণ লোক যাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম বা অন্যান্য রাজকার্য্য অবলম্বন করিয়া লোকালয়ে বাস করিতেন, তাঁহাদের গৃহস্থ রমণীগণ গৃহধর্ম্ম-পালন ও দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির সেবাকেই জীবনের সুখ ও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন; এই কারণেই বোধ হয় তাঁহারা স্বেচ্ছায় 'সেবিকা' অর্থাৎ 'দাসী' এই আখ্যা গ্রহণ করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিতা মনে করিতেন।

ভারতের সে গৌরবের দিন বহুকাল কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখনও ব্রাহ্মণবংশীয়া রমণীগণ অতীত যুগের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সেই 'দেবী' উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাঁহাদের মধ্যে এখনও পুরুষোচিত উপাধিধারণের কর্কশ প্রথা তত প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু অপর জাতীয়া মহিলাগণ সেকালের সে 'দাসী' আখ্যায় পরিচিত হইতে এখন কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। পাঠক, মাসিক পত্রিকার লেখিকা ও গ্রাহিকাগণের নামের শেষে দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। প্রথমোক্ত 'দেবী' সম্প্রদায়ের সহিত এই উপলক্ষে আমাদের কোন বিতণ্ডা নাই; কিন্তু শেষোক্ত সম্প্রদায়ের

এইরূপ-পুরুষোচিত উপাধিধারণ কতটা সঙ্গত ও শোভন সে বিষয়ে আলোচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি 'দেবী' নই; তাঁহাদের সেবিকা সম্প্রদায়ভুক্ত সামান্য অযোগ্যা 'দাসী' মাত্র। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার এ আলোচনা অনধিকারচর্চ্চা হইবে না। আশা ছিল, আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কোন যোগ্যতরা সহৃদয়া ভগ্নী এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাবৎ তাহা কেহ করিলেন না। তাই এ 'দাসী' অযোগ্যা হইয়াও এ বিষয়ের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছে।

প্রথমেই দেখা উচিত, এইরূপ পুরুষোচিত উপাধি-গ্রহণের প্রতি অনুরাগের কারণ কি? অনেকের মতে পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তাই এই অনুরাগের মূল কারণ। বিদেশীয়গণের মধ্যে এমন অনেক সদ্‌গুন আছে যাহা আমাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অনুকরণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের জাতীয় আখ্যা, জাতীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্যক পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ অনুকরণ করিতে গেলে সমাজের বিস্তর ক্ষতি হইবে; উপযোগীতার নীতি-অনুসারে যতটুকু অনুকরণ করিলে সমাজের মঙ্গল তাহাই এবং সেই ভাবেই করা উচিত। যাহা কুসংস্কার-প্রসূত নহে অথচ যাহাতে প্রাচীন সংস্কারের গৌরব প্রতিফলিত, এমন প্রথা অন্ধ-অনুকরণপ্রিয়তার খাতিরে উঠাইয়া দিবার আবশ্যক কি? প্রকৃত অনুকরণে সমাজের হিতসাধন হয়। কিন্তু বিকৃত অনুকরণে তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। সাধু-প্রকৃতির প্রকৃত অনুকরণ করিতে পারিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়, কিন্তু হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তি বহিয়া বাহিরে সাধুবেশ ও বাক্যের অনুকরণ করিলে সেই ভণ্ডামী নরকের পথেই চালিত করে। আমরা যদি ইউরোপীয়গণের প্রকৃত অনুকরণ করি, তাহাহইলে আমাদের স্বদেশবাৎসল্য, ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদের আত্মত্যাগ ও জনসেবা-কল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত কল্যানকর বিধিসকল গ্রহণ করিতে হইবে। ইউরোপীয় জননীর সন্তানপালনে ও শিক্ষায় যে নিপুণতা দৃষ্ট হয়, তাহারই অনুকরণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের পরিচ্ছদাদিতে ব্যয়বাহুল্যের অনুকরণ করিলে আমাদের সংসারের ও সমাজের কিরূপ অবনতি হইতে পারে, অন্ধ-অনুকরণ-প্রিয় স্বদেশী ভগ্নীদিগের গৃহে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ফল কথা, অনুকরণের মধ্যেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইবে। প্রাতে উঠিয়া 'গুড মর্ণিং' ও 'সেক হ্যাণ্ডের' স্থানে, যদি সেই শিক্ষাই দিতে হয় তবে, আমাদের ছেলে মেয়েদের তাহাদের গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে ও তাঁহাদের পদধূলি লইতে

শিখাইব। ইহা আমাদের পক্ষে উপযোগী এবং ইহাতেই আমাদিগের সংস্কার-গত জাতীয় ভাব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইবে।

অন্ধ-অনুকরণপ্রিয়তার আর একটী দোষ দেখুন। স্নেহরাজ্য-নির্ব্বাসিত, শোকাতুর বা পরিত্যক্তের অশ্রু, কষ্ট বা অভাবমোচনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা সে কালের 'দেবী' আখ্যাধারী ব্রাহ্মণকন্যাগণের মত আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী ভগ্নীদিগের মধ্যে কয়জনের আছে? বিদেশীয় মহিলা-গণের মধ্যে আত্মত্যাগী, দয়াময়ী রমণীগণ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এখানে আমাদের সেই শিক্ষা দিতে আসেন; তাঁহারা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় চরিত্রের এই অভাব ঔদাসীন্যও দেখাইয়া থাকেন। অথচ যে ভারতবর্ষ সকল প্রকার দৈন্যের আশ্রয় ও দয়াধর্ম্মের আদর্শ ছিল, আমরা সেই ভারত-রমণী। আমাদের এই জাতীয় অধঃপতনে আমাদের লজ্জা নাই, এ হীনতা আমরা অনুভব করি না; যত লজ্জা যত হীনতা 'দাসী' বলিয়া অভিহিত হইবার বেলায়। এরূপ লজ্জায় কেবল আমাদের হীনতা ও দুর্ব্বলতা উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং আমাদের আত্মসম্মান-বোধের অভাব পূরা মাত্রায় প্রকাশ পায়।

কাহারও কাহারও ধারণা 'দাসী' শব্দটী অসম্মান-সূচক। কারণ 'দাসী' অর্থে তাঁহারা 'ঝি' বুঝেন। বর্ত্তমান সময়ে এই 'ঝি' বা চাকরাণীদিগের স্বভাব অতি বিকৃত ও চরিত্র অতি জঘন্য, এই জন্য তাহাদিগকে যাহা বলিয়া ডাকা হয় নিজেরা সেই নামে অভিহিত হইতে অসম্মান বোধ করেন। কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ভুল। কুসুমরাণী গোলাপকে যে নামেই ডাকা হউক না কেন তাহার সৌরভ ও সৌন্দর্য্য অপহৃত হইবার নহে। বিনয়, নম্রতা, স্বভাবের মাধুর্য্য প্রভৃতি স্বাভাবিক নারী প্রকৃতির গুণাবলীতে অলঙ্কৃত 'দাসী' 'দাসী' নামের ঔজ্জ্বল্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন ও তাঁহার সম্প্রদায়কে উন্নীত করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা 'অশ্রুকণা' 'আভাষ' 'শিখা' 'অর্ঘ্য' প্রভৃতির রচয়িত্রী মাননীয়া শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী আপনাকে 'দাসী' আখ্যাতেই ভূষিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এজন্য কি তাঁহার পদগৌরব ও সম্মানের কিছু মাত্র লাঘব হয়? না 'দাসী' বলিয়া তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা, ও আদর্শ হিন্দুনারীর পুণ্যপ্রভ জীবনের দৃষ্টান্তে তিনি যে সমাজের অঙ্গীভূত সে সমাজ কম গৌরবান্বিত? তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান অচলা হইয়া থাকে। আমাদের সকলেরই তাঁহার পদানুসরণ করা উচিত। কারণ যে সম্মান লাভের জন্য আমরা পুরুষোচিত

উপাধি ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে সম্মানবৃদ্ধি ত হয়ই না বরং সাধারণে এজন্য আমাদিগকে ঘৃণা ও উপহাস করেন। এমন কি প্রহসনে পর্য্যন্ত ইহা লইয়া বিদ্রূপ করা হয়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে 'দাসী' কথার প্রকৃত অর্থ 'ঝি' নহে সেবিকা। নারী যদি সেবিকা হইতে না চাহেন, তাহা হইলে সকলের সেবা কে করিবে? বস্তুতঃ যদি স্বদেশের, কি সমাজের, কি স্বজনগণের, কি শ্রীভগবানের অথবা তাঁহার সৃষ্ট একটী প্রাণীরও সেবা করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের নারী-জন্ম সার্থক হইবে। এই সেবাব্রতের শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াই সাধুগণ অনাথ আতুরের সেবাস্থানের নাম 'দাসাশ্রম' রাখিয়াছিলেন। কোন্ সদাশয় ব্যক্তি সেই আশ্রমের 'দাস' বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে শ্লাঘার বিষয় মনে না করিতেন? দাসীর জাতি হইয়া এরূপ গৌরবময় আখ্যা গ্রহণে অনিচ্ছুক, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যেরই বিষয় বলিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস যে নামের শেষে 'দাসী' লিখিলে নামের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়; সকলের রুচি সমান নহে ইহা সত্য। আমাদের মধ্যে অনেকের রুচি এত স্বতন্ত্র যে তাঁহারা পুরুষোচিত 'দাস' লেখাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, 'দাসী' লেখাতে তাহার শতাংশের এক অংশও নাই বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ যদি কোন স্ত্রীলোক চুল বাধিয়া অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ধুতি-চাদর পরিধান করিয়া পথে বাহির হন, তাঁহার সে বেশ যেমন সুন্দর ও সুশোভন হয়, এবং তাহা দেখিয়া লোকের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয় পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশিত রমণীগণের পুরুষোচিত নামগুলি সাধারণ লোকে সেই ভাবেই দেখিয়া থাকেন। স্বামীর সহিত রমণীগণ নির্ভয়ে যেখানে সেখানে যাইতে পারেন এবং তাঁহার উপাধিও যেরূপ ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন; তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই সত্য, কিন্তু তথাপি রমণীগণ হাটে, মাঠে, দোকানে, আফিসে স্বামীর সহচারিণী না হইয়া, গৃহলক্ষ্মী রূপে তাঁহার গৃহের শ্রী-সম্পাদনে এবং 'দাসী' হইয়া স্বামীপুত্রের ও স্বজনগণের সেবা যত্ন করেন, ইহাই লোকে দেখিতে চায় এবং ইহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। যিনি নিজেকে 'দাসী' বলিয়া মনে করিতে পারেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমে একটী লোকের, পরে একটী পরিবারের, পরে একটী গ্রামের, পরে একটী দেশের, পরে অনন্ত প্রাণীর ও বিশ্বপতির দাসীত্ব পদে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়া তাঁহার সংসারে খাটিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালীর মেয়ের নাম 'শ্রীমতী' ও 'দাসী' যোগেস্থ যেমনন্দর মানায়,

তেমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু অনেকেরই মনের বিশ্বাস, নামের শেষে 'দাসী' লিখিত হওয়া আমাদের বিশেষ লজ্জার কথা। এজন্য পত্রাদি লিখিতে হইলে অথবা কোন প্রকারে আমাদের নাম উল্লেখ করিতে হইলে, তাঁহারা 'দাসী' আখ্যা ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন। অবস্থা এমনি হইয়াছে যে, গুরুজনেরাও আমাদিকে 'দাসী' লিখিতে কখন কখন সঙ্কোচ বোধ করেন। দাসী না লিখিয়া আশীর্ব্বাদ-সূচক কোন শব্দ ব্যবহার করা চলে না। গুরুজনেরাও যদি আমাদের সেবিকা ভাবিতে সঙ্কুচিত হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের সুকোমল স্নেহ-আকর্ষণ হইতে যেন দূরে গিয়া পড়িতেছি এবং তাঁহাদের স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের অযোগ্যা হইয়া পড়িতেছি, এই মনে হয়।

আর পুরুষোচিত উপাধি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে ব্যাকরণ হিসাবেও ভুল হয়। পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে যে লক্ষণের পার্থক্য আছে, পুরুষোচিত উপাধিধারণে অন্ততঃ সেটুকুও আমাদের মানিয়া চলা উচিত। সকলেই বোধ হয় জানেন, আমাদের দেশে অনেক জমীদার মহিলাগণই চৌধুরির স্ত্রীলিঙ্গে চৌধুরাণী ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্য সকলেও উপাধিটীকে সেইরূপ স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করিয়া ব্যবহার করেন। যথা 'সরকার' স্থানে 'সরকারনী' 'দত্ত' স্থানে 'দত্তা' 'গুপ্ত' স্থানে 'গুপ্তা' 'রায়' স্থানে 'রায়নী' ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ উপাধিও শুনিতে মোটেই ভাল হয় না, ইহা অপেক্ষা 'দাসী' লিখিলে নামটীকে খুব সুন্দর মানায়।

আশা করি স্বজাতীয়া সুশিক্ষিতা ভগিণীগণ এরূপ পুরুষোচিত উপাধিধারণ আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কিনা, ইহাতে আমাদের কল্যাণ, সম্মান এবং নামের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে কিনা, তাহা নিরূপণ করিবেন। কেন না, তাঁহাদের আদর্শ-গ্রহণ করিয়াই অল্প শিক্ষিত সাধারণ স্ত্রী-সমাজ পরিচালিত হইতেছে। 'দাসী'র সানুনয় নিবেদন এই যে, আমাদের মধ্যে যিনি 'দাসী' আখ্যা নিতান্তই মন্দ মনে করেন, তিনি রমণী-সুলভ কোমল নামের শেষে পুরুষোচিত উপাধি না লিখিয়া শুধুই নামটী মাত্র লিখিবেন। একটী প্রবাদ আছে যে যাহার অলঙ্কার নাই তাহার নিরাভরণে দীনবেশে নিমন্ত্রিত স্থানে উপস্থিত হওয়া ভাল, কারণ পরের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া অপমানিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। আমাদের এ কথাটী খুব সত্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। আমরা যে বঙ্গনারী, নামে, পরিচ্ছেদে, ভাষায় ঠিক সেই বঙ্গনারীই থাকিব।

তথাপি ভক্ত যেমন নানা স্থান হইতে পুষ্পচয়ণ করিয়া আপনার ইষ্টদেবতাকেই সজ্জিত করেন, আমরাও তেমনি জগতের সমুদয় জাতির সদ্‌গুণ আহরণ করিয়া যেদিন 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' জননী-জন্মভূমিকে ভূষিত করিতে পারিব, সেই দিনই আমাদের জীবন সুফল হইবে।

শ্রীমতী —— দাসী।

পুস্তক সমালোচনা।

সেফালিকা, বৈভ্রাজিকা ; কাননিকা।—এই তিন খানি কবিতা পুস্তক ভারত মিহির যন্ত্র হইতে সান্ন্যাল এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা। ভারত মিহিরের ছাপা এবং কাগজ তাহারি উপযুক্ত, সুতরাং বইখানি দেখিতে দিব্য হইয়াছে। লেখা পড়িলে বেশ বোঝা যায় গ্রন্থকর্ত্রীর হাত কাঁচা বটে কিন্তু তাঁহার রচনা আশাপ্রদ। শ্রুত আছি গ্রন্থকর্ত্রী সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকা এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রী কবিদের মত অবস্থা সম্পন্না। গ্রন্থকর্ত্রীর প্রণীত পূতোজ্জ্বল 'সেফালিকা' তাহার পরিচয় দিতেছে। 'সেফালিকা'র উৎসর্গ পাঠেই গ্রন্থকর্ত্রীর কবি-হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

'পশ্চিম-ভারত-ভ্রমণ-কবিতা-কাহিনী' কাননিকা নামে বাহির হইয়াছে। কাননিকা কথা দেখিলাম 'প্রকৃতিবাদে' নাই। এবং ভ্রমণ কাহিনী 'কাননিকা' নামে অভিহিত না হইলেই ছিল ভাল। 'লক্ষ্ণৌ' নামক কবিতায় গ্রন্থকর্ত্রী যে তেজস্বিনী ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তরুণ হৃদয়ের বল প্রসূত।

'বৈভ্রাজিকা' অর্থে বোধ হয় কুবেরের উদ্যান জাত। কুবেরের ধনের কথা আলাদা কিন্তু তাঁহার উদ্যান আদর্শ উদ্যান কিনা তাহা বলা শক্ত। তবে বৈভ্রাজিকায় যে সকল কবিতাকুসুম মুকুলিত দেখিলাম,তাহা বাঙ্গালা-সাহিত্য-উদ্যানের নিতান্ত এক কোনে পড়িয়া থাকিবার নহে। গ্রন্থকর্ত্রীর সাহিত্যা-নুরাগ যে পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে তাঁহার লেখার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন হউক ইহাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

সতীপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি।—শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি.এ. কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। পুস্তকখানি "অশেষগুণৈক নিকেতন, শরণাগত পরিপালক, কারুণ্যরত্নাকর বিদ্যোৎসাহী বদান্যপ্রবর মহামান্য পুণ্যশ্লোক নৃপতিকুলতিলক শ্রীমন্মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র

ভঞ্জদেও ময়ূরভঞ্জাধিপ বাহাদুরের শ্রীকরকমলে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত” উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

আজকালকার লেখকগণ পুস্তক উৎসর্গ করিয়া ‘হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা’ এবং ‘অপরিশোধনীয় ঋণ’ প্রভৃতি স্বীকারের একটী সুলভ এবং সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এরূপ ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই। যাঁহাদের উদ্দেশে করা হয় তাঁহাদের আপত্তি আছে কিনা জানিতে পারিলে বোঝা যাইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি বা কত দূরে। সীমা অতিক্রম করিলে হৃদয়ের আন্তরিকতাও বাক্যাড়ম্বরে পরিণত হয় এবং তখন কৃতজ্ঞতা ও চাটুকারিতার মধ্যে বড় প্রভেদ দেখা যায় না। সামান্য একখানি পুস্তকের দুলাইন সমালোচনায় উৎসর্গ পত্র সম্বন্ধে এত কথা অবান্তর বলিয়া বোধ হইতে পারে ; কিন্তু বঙ্গভাষার মুখ্য লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাহিত্যকে যেরূপ ঘরোয়া ব্যবসায়ে দাঁড় করাইয়াছেন তাহাতে লেখকগণের আত্মসম্মান বোধ ও সাহিত্যের মর্য্যাদা যুগপৎ হ্রাস হইতেছে।

যদুবাবু যে গুণবতী সাধ্বী রমণীর পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য এ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তিনি যে যথার্থই রমণীকুল গৌরব ছিলেন তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। সতীলক্ষ্মীর পারলৌকিক গতি সম্বন্ধে যদুবাবুর কল্পনা অভিনব এবং রমণীয় তাঁহার এই পুণ্য সাধু উদ্দেশ্য যে বঙ্গগৃহের ঘরে ঘরে, বিশেষ নারী সমাজে উপলব্ধ হইবে সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই।

অবলাবালা।— শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র প্রণীত, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। ইহা একখানি উপন্যাস, এ পর্য্যন্ত ইহার তিনটী সংস্করণ হইয়াছে। প্রথমত পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ এবং আকার-অবয়ব দেখিলে বটতলার বহি বলিয়া ভ্রম হয় ; কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিলে মনে হয় যে এমন অপূর্ব্ব গার্হস্থ্য উপন্যাস বেঙ্গল মেডিক্যাল বা মজুমার লাইব্রেরীতে খুব কমই আছে। গ্রন্থের তেমন সাজসজ্জা নাই ; কিন্তু ভিতরে যে বস্তু রহিয়াছে তাহারই মহিমায় গ্রন্থখানি চির উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর স্ত্রী-চরিত্র আমরা বঙ্কিম বাবুর পুস্তক ছাড়া অন্য পুস্তকে পড়িয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। যে লেখক এরূপ চরিত্র আঁকিতে পারেন, তিনি ধন্য।

স্বামী-প্রেম যে কি বস্তু গ্রন্থকার অবলা-চরিত্রে তাহা বিধিমতে দেখাইয়াছেন, এবং এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। অবলার স্বামী-প্রেমের তুলনা নাই। আমরা এ অতুলনীয়-চরিত্র পাঠ করিতে করিতে আনন্দে

অভিভূত হইয়াছি ; কিন্তু অবলার ন্যায় সতীনারীর পরিণাম দর্শনে আমরা প্রকৃত ব্যথিত হইয়াছি। 'অবলাবালা' যেমন সুন্দর তেমনি একটু অদ্ভুতও বটে। আজকালকার উপন্যাসপ্রিয়া মহিলাগণ যদি একখানি করিয়া অবলাবালা পাঠ করেন, তবে শিক্ষার সহিত তাঁহাদের উপন্যাস পাঠের কৌতুহল নানা প্রকারে চরিতার্থ হইবে।

নারীজীবন।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত এল. এম. এস. প্রণীত। মূল্য ১।০ আনা। নারীজীবন একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ও অত্যাবশকীয় গার্হস্থ্য পুস্তক। প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হওয়া উচিত। হরিধন বাবুর এই প্রথম রচনা কিনা জানিনা ; কিন্তু বইখানি পড়িলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় লেখকের বাঙ্গালা ভাষায় বেশ হাত আছে এবং যে সকল প্রবীণ মহাত্মা গ্রন্থকারকে এই পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা হরিধন বাবুর মতই সমাজের 'বিশেষ স্ত্রী-সমাজের' যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছেন। তিনি দুর্ব্বোধ ডাক্তারি পরিভাষাকে যেরূপ সহজ, সঙ্গত ও প্রাঞ্জল করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের উপকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে তাঁহারা ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন এরূপ আশা করা যায়। কথা এই, বটতলার দ্বার খোলা থাকিতে তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন কি ? কেনা ত দূরের কথা।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি ৪র্থ খণ্ড।—শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল, এম্.আর.এ.এস. সম্পাদিত মূল্য ।০ আনা। ইহাতে ২৫টী মুসলমান পদকর্ত্তার গান সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতিভার বিকাশ ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ধর্ম্মও সাম্প্রদায়িকতার বিচার করে না, তাই বোধ হয় আমাদের দেশে তখন এত মুসলমান বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ব্রজসুন্দর বাবু ইঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যেমন প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন তেমনি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে ধর্ম্মের বিশ্বজনীনতাকেও অনেকটা উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার সাধু সংকল্প সিদ্ধ হউক, এই আমাদের প্রার্থনা। নানা কারণে এরূপ গ্রন্থের প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বেহুলা ও ফুল্লরা।—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রত্যেকের মূল্য ৫০ আনা। গ্রন্থ দুইখানি 'নূতন ধরণের'। প্রাচীন বাঙ্গালী কবির কাব্যসুন্দরীর কথা লইয়া উপন্যাস লেখার চেষ্টা এই বোধ হয় প্রথম। দীনেশ বাবুর প্রাচীন

সাহিত্যে অবাধ অধিকার। তিনিই এ চেষ্টা করিয়া সাহিত্যে আর এক অভিনব স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বহি দুখানি দিব্য জল্-জ্বলাট হইয়াছে। বেহুলার আর ফুল্লরার ছবি যে রঙ্গে ফুটান হইয়াছে, তাহা খাঁটি বাঙ্গালী কবির খাঁটি রঙ্। বেহুলার ত্যাগ-স্বীকার ও ফুল্লরার আত্মবস্থায় সন্তোষ আর উভয়ের তপস্যা-প্রভাব বাঙ্গালীর অন্তঃপুরেও দেখাইবার এবং শিখাইবার জিনিস / সাবধান হইলে দীনেশ বাবুর অন্বয়ের গুণে বই দুখানি বেশ সুখপাঠ্য হইতে পারিত এবং পুস্তক দুইখানি ভ্রমপ্রমাদ শূন্যও হইত। সর্ব্বোপরি—ছাপা ও বাঁধাই গুণে বহি দুখানি অধিকতর প্রলোভনকর হইয়াছে। এরূপ আকার, কাগজ এবং সোনার জলে ছাপা ছবি দেওয়া কাপড়ের মলাট, বিলাতী বহি ভিন্ন বাঙ্গালা কোন বহিতে নাই। কিন্তু ইহাতে দীনেশ বাবুর সুখ্যাতি করা হয় না এই যা দুঃখ। অধিকন্তু তিনি পিতা হইয়াও যে তিনি পক্ষপাত দুষ্ট তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহার মানসী দুহিতা-দিগের পরিচ্ছদের ব্যাপারে—তিনি পক্ষাপক্ষ বিচার করেন নাকি ?

দেশের কথা।

গত এক মাসের মধ্যে বাঙ্গালার অনেকগুলি সুসন্তানের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইঁহাদের মৃত্যুতে বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালীজাতির অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বাগ্মীপ্রবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামায়ণের গদ্যানুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সদ্ভাবশতক-প্রণেতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কৃষি ও রেশম-বিজ্ঞানবিদ্ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, কৃষিবিদ্ হেমচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত ও কালাচাঁদ দে এবং প্রফেসার ধনবল্লভ শেঠ প্রভৃতির মৃত্যুজনিত ক্ষতি পূরণ হওয়া কঠিন।

ভারতীয় কৃষি শিল্প প্রদর্শনীক্ষেত্রে এবার সারস্বত-সম্মিলন হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান ৺সরস্বতী পূজার দিন ও তাহার পরদিন করিয়াছিলেন। প্রথম দিন সঙ্গীতাদির আয়োজনের বিশেষ বাহুল্য ছিল। দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রবাবু একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সারস্বতদিগের তৃপ্তিবিধান করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাঙ্গালায় বাঙ্গলা-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পোষাক বিক্রেতা সেন এণ্ড কোং রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট বাহাদুর হেয়ার সাহেব তাঁহাদের কারবারের 'পেট্রণ' বা মুরুব্বি হইয়াছেন। এরূপ সম্মান দেশী পোষাক ব্যবসায়ীর পক্ষে এই প্রথম।

[জাহ্নবী, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

স্বদেশী প্রসঙ্গ।

এই বিশাল মহাদেশতুল্য ভারতবর্ষ আমাদিগের স্বদেশ। কেন না, এই দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই দেশের ফল-শস্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া ও শীতল সলিলে পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, মৃত্যুর পর পঞ্চভূতাত্মক দেহ এই দেশেরই পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা এই পরমারাধ্যা জন্মভূমির নিকট যাহা প্রাপ্ত হইতেছি, আমাদিগের পূর্ব্বে পিতা পিতামহগণও তাহা প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদিগের নশ্বর শরীরের অনুপরমাণুও এই স্বদেশের অনুপরমাণুতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি ভারত-বাসীর বংশ থাকে, তবে সেই ভাবী বংশধরগণও সেই সমস্ত আবশ্যকোপযোগী দ্রব্যই প্রাপ্ত হইবে, এবং আমাদিগের মত এই দেশের মৃত্তিকাতেই অন্তিমশয্যা প্রস্তুত করিবে। এই কারণেই এদেশের মাটি, জল, বায়ু, তাপ ও ব্যোমের উপর আমাদিগের চিরস্বত্ব বর্ত্তমান। আজকাল অনেকের মুখেই শুনিতে পাই, ভারতবাসী স্বদেশভক্ত নহে, কখনই তাহারা স্বদেশকে আপনার করিয়া লইতে যত্ন করে নাই। সত্য বটে, আমাদিগের পূর্ব্বতন শাস্ত্র এবং সাহিত্য গ্রন্থাদিতে স্বদেশ-প্রেমের বিশেষ কোন উপদেশ পাওয়া যায় না; তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, আর্য্য মহাত্মাগণ স্ব-ধর্ম্ম প্রতিপালনের যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহারই মধ্যে স্বদেশ-সেবার বীজ নিহিত আছে। স্বদেশ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্ব-ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুর পক্ষে একান্তই অসম্ভব; এবং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই অমৃত-ময়ী মহাবাণী ভারতবর্ষের পুরাণেই উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। তবে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কখনও স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হন নাই। না হইবার কারণ ছিল।

ভারতবাসী অতীত যুগ-যুগান্ত হইতে, এখনকার মত কখনও 'নিজ বাস-ভূমে পরবাসী' হয় নাই। তাই তখন তাঁহাদিগের এই স্বদেশ-ভক্তির প্রবাহ ছুটিত না। আজ ছুটিবার আবশ্যক হইয়াছে। যাহা অন্তঃসলিলা ছিল, আজ তাহাকে ফুটিয়া প্রবাহিত হইতে হইয়াছে,—যাহা আচ্ছাদিত ছিল, আজ তাহাকে উন্মুক্ত হইতে হইয়াছে! পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে আজ এক শক্তি অভিনব বেশে বিকশিত হইয়াছে। তাই পতিত, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত ভারতবাসী এ নবশক্তির সন্মান রক্ষা করিয়া গৌরবান্বিত হইতে চাহিতেছে।

কিন্তু এই নবশক্তির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিলেই কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? পতিত ভারতবাসি! যদি দৈবকৃপায় শক্তিসঞ্চারিণী মন্ত্র পাইয়াছ, তবে প্রকৃত সাধকের মত তন্ময়চিত্তে, হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি মন্ত্র-সাধনা কর, সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ব্যাধিনিপীড়িত, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সমাজ-শ্মশানে অশিব-শব-সাধনায় অগ্রসর হও, মহাশক্তির সাক্ষাৎ পাইবে।

আমরা এতদিন খুব একটা বড় রকমের ভুল বুঝিয়া আসিতেছিলাম, এখনও যে একেবারে সে ভুলের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, তাহাও বোধ হয় না। যে শ্বেতজাতি কৃষ্ণচর্ম্ম অপর জাতির প্রতি মৌখিক সহানুভূতি ব্যতীত, আন্তরিক আর কিছুই করেন না; তাহাদিগের উপকারার্থে নিজের কণামাত্র স্বার্থও বর্জ্জন করিতে পারেন না; তাঁহারাই আমাদিগের বন্ধুরূপে আসিয়া, আমাদের ধর্ম্মের, আমাদের শাস্ত্রের, আমাদের আচারব্যবহারের কুৎসা করিতে শতজিহ্বা বাহির করেন। আবার এইরূপ অনেকে হিতৈষী সাজিয়া,আমাদিগের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণকেও অযথা কটূক্তি করিয়া থাকেন। আমরা এমনি অপদার্থ যে, সে সকল নির্ব্বাকে শ্রবণ করি! ভাবি, এসকল শ্বেতমুখের কথা, সুতরাং অকাট্য সত্য। আমরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য এই সকল শ্বেতপুরুষগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলাম। আমাদিগের অন্তঃপুরের শিক্ষার ভারও ঐ সকল শ্বেতাঙ্গগণের বণিতাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের দেখাদেখি তৈল ত্যাগ করিয়া সাবান ধরিয়া, তামাকু ত্যাগ করিয়া চুরুট টানিয়া, ধুতিচাদর ছাড়িয়া কোটপ্যাণ্ট পরিয়া, ইত্যাদি আরও কত কি খুঁটিনাটির অন্ধ অনুকরণ করিয়া, ঘোর বিলাসী সাজিয়াছিলাম; এবং এই অসার বিলাসানুকরণের বৃথা গর্ব্বে স্ফীতবক্ষে বিচরণ করিতেছিলাম। কিন্তু বুঝিতেছিলাম না যে, আমরা কেবল শ্বেতজাতির এইরূপ বাহ্য অনুকরণে বড় হইতে পারিব না। বড় হওয়া ত দূরের কথা, মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতেও পারিব না! আমরা শ্বেতজাতির শ্রীমুখ হইতে শুনিলাম, বেদ চাষার গান; নির্ব্বিচারে তাহাই বিশ্বাস করিলাম,—শুনিলাম আমাদের ইতিহাস নাই, অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহাই মানিয়া লইলাম,—শুনিলাম পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতি ভীরু, দুর্ব্বল, কাপুরুষ; অসঙ্কুচিত মনে তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। বেদ পড়িলাম না, বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না,—ইতিহাস অনুসন্ধান করিলাম না,—পূর্ব্বকালের বাঙ্গালীর দিকে ফিরিয়াও দেখিলাম না!

ভাবিলাম, গুরুবাক্য ধ্রুবসত্য। ক্রমে তাঁহাদের কথায় সমাজ ভাঙ্গিলাম—আপনার মাথায় আপনি অস্ত্রাঘাত করিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে ছুটিলাম। তাঁহাদের দেশের জাতিভেদের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, আমাদের জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদসাধনে অগ্রসর হইলাম। বুঝিলাম না, তাঁহাদের সমাজ আর আমাদের সমাজ কত বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। আমাদের শ্বেতগুরুর সকল কথাই নির্দোষ করিলাম, মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাঁহারা যাহা করেন, তাহার অনুসরণ করিলাম না। তাঁহাদিগের আত্মোন্নতির সহস্র পন্থা চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান থাকিলেও, আমরা সে সকলের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলাম না, কোন গুণে তাহারা সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে সামান্য বণিকের বেশে উপস্থিত হইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন, তাহাও বুঝিলাম না, তাঁহারা কি কৌশলে পলাশীর মাঠে বিজয় পতাকা উড়াইয়াছিলেন, তাহাও ভাবিলাম না! তাই ডুবিলাম—মজিলাম, এখন মরিতে বসিয়াছি! এখনও উপায় আছে, এখনও আমরা মরণের পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারি, যদি আমরা হিন্দুমুসলমান আপন আপন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মাতৃভূমিকে ইংরাজের মত ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিক্ষা করি। ইংরাজ তাঁহার স্বদেশকে, স্বজাতিকে, স্ব-সমাজকে কত ভালবাসেন! আর আমরা কি কাজে ঠিক তাহার বিপরীতাচরণ করি না? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুখে কেবল 'স্বদেশ' 'স্বদেশ' বলিয়া গগন ফাটাইয়া দেন, কিন্তু স্বদেশকে কি একজন ইংরাজের মত ভালবাসেন? ইংরাজ তাঁহার স্বদেশের জন্য সব করিতে পারেন, আর আমাদিগের স্বদেশ-হিতৈষী মহোদয়গণের অনেকেই স্বদেশের জন্য স্বার্থের কণামাত্রও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত! এখন কিন্তু আর এরূপ মৌখিক স্বদেশী হইলে চলিবে না। এখন আপনাকে আপনি বিশ্বাস করিতে হইবে; মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া নিজের পায়ে দণ্ডায়মান হইতে হইবে; কেবল মুখে নয়, অন্তরে-অন্তরে স্বদেশী হইতে হইবে; বহুদিনের ভ্রম দূর করিতে হইবে।

অনেক বিজ্ঞ এই স্বদেশী ভাবের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া ভীত ও বিচলিত হইতেছেন, সুতরাং প্রকাশ্যতঃ এই মহাব্রত গ্রহণে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে, এই মহাব্রত গ্রহণই এক্ষণে আমাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম। এই মহাব্রত ধারণে অনন্ত পুণ্য,

বর্জ্জনে মহাপাতক। সে পাতকের প্রায়শ্চিত্ত চিরদারিদ্র্য ও বংশনাশ! যাহা লোকসমূহকে ধারণ করে, পালন করে, রক্ষা করে তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই লোকস্থিতির সহায়। যাহাতে লোকসমূহের দুঃখ বাড়ে, লক্ষ্মী ছাড়ে, শেষে সকলে মরে তাহাই অধর্ম্ম। এ ধর্ম্মাধর্ম্ম হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের পক্ষেই সমান। সুতরাং সকলেরই ইহকালে ইহা একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহকাল লইয়াই পরকাল, সুতরাং ইহলৌকিক ধর্ম্মই পারলৌকিক ধর্ম্মের সহায়। ইহলোকে তিষ্ঠিতে না পারিলে, পরলোকের জন্য কিছুই করা যাইতে পারে না। কি জানি কেন,—বোধ হয় পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষার গুণেই, আমরা এতদিন এই ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম। আমরা আমাদের ঘরের তাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি; পরে কাপড় আনিয়া দেয়, তবে আমরা লজ্জা নিবারণ করি। পরে যদি বলে, তোমাদিগকে আর কাপড় দিব না, তাহা হইলে লজ্জা নিবারণ করিব কিরূপে, সে ভাবনাটা হৃদয়ে একেবারেই স্থান পাইত না। আমরা আমাদের নারীগণের হস্ত হইতে চরকা লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, এবং চরকার পরিবর্ত্তে তাহাদের হাতে বিদেশী প্রেমের আদর্শে অঙ্কিত নানাবিধ নভেল দিয়া কৃতার্থ হইয়াছি; কিন্তু বিদেশী বণিকের অকৃপা হইলে ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিবার সূতাটুকু কোথায় পাইব, সে চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদয় হইত না। এইরূপ আরও কত কি আছে, যাহা আমাদের ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে সে সকল নষ্ট করিয়াছি! এখন পরের কাছে হাত না পাতিলে সে সব জিনিষের অভাবে আমাদের সংসার চলে না। তবেই বুঝিয়া দেখুন, আমাদিগের অবস্থা কত শোচনীয় হইয়াছে। আমাদিগের বিলাসের সাধও অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কেননা আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য আড়ম্বরের অযথা অনুকরণে অভ্যস্ত হইয়াছি, এবং এই অনুকরণপ্রিয়তার জন্য আপনাকে আপনি সুসভ্য বলিয়া জগত সমক্ষে পরিচিত করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছি। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যের অনুকরণ করিয়া আমাদিগের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের অভাব বৃদ্ধি করিতেছি বটে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির শ্রমশীলতার, কষ্টসহিষ্ণুতার ও একাগ্রতার অনুসরণ করিয়া আমাদের অভাব মোচনের উপায় অন্বেষণ করিতেছি না। সুতরাং প্রতিদিন আমাদিগের অভাব বৃদ্ধিই হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে আমরা অনন্ত অভাব-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছি। এখনও চেষ্টা

করিলে, যত্ন করিলে উদ্ধারের উপায় আছে ; কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মরণ সুনিশ্চিত। পাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার অনুকরণে এবং এই নিশ্চেষ্টতার জন্য আমাদিগের ধর্ম্মহানি ঘটিয়াছে। এ ধর্ম্ম কেবল হিন্দুধর্ম্ম নহে, কেবল মুসলমানধর্ম্ম নহে, কেবল খৃষ্টানধর্ম্ম নহে, সমগ্র মানবের যাহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম—সমগ্র জগতে যাহা একমাত্র সত্য, ইহা সেই আত্মরক্ষারূপ মহাধর্ম্ম। ইহাই বিশ্বেশ্বরের অভিপ্রেত মানব-ধর্ম্ম। এই সার্ব্বভৌমিক সত্যধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়া, আমরা আবার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলেই—আমাদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পথও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছি,—কত অখাদ্য খাইতেছি, কত অস্পৃশ্য দ্রব্য নিত্য স্পর্শ করিতেছি! ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। আমরা ধর্ম্ম হারাইয়া অধার্ম্মিক হইয়াছি ; সুতরাং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এখন কিন্তু চক্ষু ফুটিয়াছে—এখন আমাদিগের অবস্থা অবলোকন করিতে পারিতেছি। বুঝিতেছি, জাগতিক জীবনসংগ্রামে তিষ্ঠিতে হইলে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে, পরের অনুগ্রহে কিছুই হইবে না। আত্মনির্ভরতা ভিন্ন, আত্মনিষ্ঠা ভিন্ন, মনুষ্যত্বই বৃথা।

অনেকে আবার একতার কথা তুলিয়া বলিয়া থাকেন যে, যতদিন এদেশে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এদেশের উন্নতির কোন আশা নাই। সকলে কিন্তু তাহা ভাবেন না—ভাবিতে পারে না! ভারতবর্ষ যখন ধনে মানে, বিদ্যাবুদ্ধিতে জগতের শীর্ষস্থানে ছিল ; তখনও কি এই বর্ণভেদ, জাতিভেদ বর্ত্তমান ছিল না? বর্ণ ও জাতিভেদের মধ্য দিয়াই কি ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় নাই? যে জাপান আজ আপন বলে সভ্যজগতে সমাদর প্রাপ্ত হইতেছে, সে জাপানেও ত ধর্ম্মভেদ বর্ত্তমান! তবে সেখানে এত উন্নতি কেন? যে য়ুরোপ খৃষ্টধর্ম্মে প্লাবিত, তথায়ও ত বহুবিধ সম্প্রদায়-ভেদ বর্ত্তমান! তবে সেখানেই বা এত উন্নতি কেন? তাই অনেকের মতে বর্ণভেদ বা ধর্ম্মভেদ জনিত কারণে এদেশ যে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না, একথা ঠিক নহে। মূল কথা, যে বিষয়ের সাধনা করিতে হইবে, সেই বিষয়ের সাধকগণকে সেই বিষয়ের জন্য একতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক ; এবং সেই বিষয়ের জন্য একাগ্রতা প্রয়োজনীয়। যদি চীন দেশের লোক, আরবের লোক এবং আমেরিকার লোক মিলিয়া একটা খাল খনন করিতে যায়, তবে এই খনন কার্য্যের জন্যই তাহাদের একতা ও একাগ্রতার প্রয়োজন, অন্য বিষয়ে নহে। চীন-শ্রমজীবী মৃত পূর্ব্বপুরুষের পূজা করুক, আরবের লোক মস্জিদে নমাজ করুক এবং

আমেরিকার লোক চার্চ্চে ভজনা করুক; কিম্বা চীনের লোক শুটকী মাছ খাউক, আরবের লোক মেষ মাংস খাউক এবং আমেরিকার লোক্ শূকর মাংস খাউক, তাহাতে খনন কার্য্যের অন্তরায় ঘটিবে না; যদি খনন কার্য্যে সকলের একতা ও একাগ্রতা থাকে। সেইরূপ ভারতের বিভিন্ন বর্ণ, সামাজিক ও সম্প্রদায়িক ভাবে যতই পৃথক্ হউক না কেন, স্বদেশ-সেবায় যদি সকলের আন্তরিক অনুরাগ থাকে—স্বদেশের কাজে যদি সকলের একাগ্রতা থাকে, তাহা হইলে নিরাশার কারণ কি? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানাদি সকল সম্প্রদায়ের লোকলই স্ব স্ব উপাসনা মন্দিরে উপাসনা করুন, স্ব স্ব সমাজের আচারব্যবহার যথাশক্তি রক্ষা করিয়া চলুন, কিন্তু দেশের জন্য সকলে এক প্রাণে কাজ করুন; স্বদেশী শিল্পরক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করুন, অসুবিধা কিছুই হইবে না। রুষ রাজ্যে কেবলই খৃষ্টানের বাস, সেখানে জাতিভেদ নাই; তথাপি রুষ জাপানের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। রুষীয় প্রকৃতিপুঞ্জের একাগ্রতা এবং যুদ্ধ-বিষয়ে একতার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। এইরূপ একতা ও একাগ্রতার অভাবেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। রাজপুতজাতি সকলেই সমধর্ম্মী ছিলেন, হিন্দু-আচার অনুষ্ঠানে সকলেরই অনুরাগ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদ থাকিলেও জাতিভেদ বা ধর্ম্মভেদ ছিল না। তবে কেন পঞ্চনদের পূর্ব্বপারে বৈদেশিকের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল? একতা ও একাগ্রতার অভাবই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? কোন গ্রামের কোন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর গৃহে যদি দস্যুদল প্রবেশ করিয়া ধনলুণ্ঠনে ব্রতী হয়, আর সেই সময়ে যদি গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতাগণ অস্ত্রধারণ করিয়া লুণ্ঠন কার্য্যে বাধা প্রদানে অগ্রসর হয়েন, তাহাহইলে কি দস্যুদল পরাজিত হয় না? এরূপ স্থলে ত ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান! হিন্দুগণ নির্জ্জনে একাকী উপাসনা করেন, মুসলমান ভ্রাতাগণ দলবদ্ধ হইয়া উপাসনা করেন,—হিন্দু মুসলমানের খাদ্য গ্রহণ করেন না, মুসলমান ও হিন্দুর খাদ্য গ্রহণ করেন না; তথাপি তাঁহারা যখন দস্যুদলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অস্ত্রধারণ করেন, তখন তাঁহাদিগের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে দস্যুদল কি তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারে? তাই বলি, জাতিভেদ বা ধর্ম্মভেদ এক উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়ার পক্ষে বাধা দিতে পারে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালীর এই স্বদেশী আন্দোলন স্থায়ী হইবে না, সুতরাং দু'দিনের এই নিষ্ফল আন্দোলনে যোগদান না করাই বুদ্ধিমানের

কার্য্য। আমরা বলি, এ অনুমান মিথ্যা। সকলেই যদি কর্ত্তব্য-বোধে এই কার্য্যে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে এ আন্দোলনের স্থায়ীত্বে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমরা যদি বুঝিতে পারিয়া থাকি যে, আত্মোন্নতির চেষ্টা মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা হইলে আমরা সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই, সকল সন্দেহের মীমাংসা হইয়া যায়। ভারতবাসীর এই স্বদেশী শিল্পোদ্ধারের চেষ্টায় প্রথম হইতেই আশাশূন্য হওয়া উচিত নহে। যদি স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মমতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আশাহীন হইবার কোন কারণ নাই।

অনেকে আবার এমনও বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালীর দ্বারা কখন কোনও মহৎকার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, এখনও হইবে না! বুদ্ধিমানদিগের এ কথার সারত্ব অনুভব করিতে পারি না। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত কোন মহৎকার্য্য সম্পন্ন করে নাই, তাহা হইলেও এমন সিদ্ধান্ত হয় না যে, বাঙ্গালীর দ্বারা কখনও কোনও মহৎকার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না। মানুষ একেবারেই সন্তরণদক্ষ হয় না। যে আজ সাঁতার জানে না,—সে যে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে সাঁতার শিখিতে পারিবে না, একথা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে? তবে, সাঁতার শিখিবার জন্য জলে নামিতে হইবে, তীরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা পরাধীন জাতি। আমরা পর-প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছি, পর-প্রদত্ত বস্ত্রে লজ্জানিবারণ করিতেছি, পরের গোলামি করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছি। এ সময় আমাদিগকে সংযমী, স্বার্থত্যাগী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে—সর্ব্বপ্রকার বিলাসবাসনা বিসর্জ্জন দিতে হইবে—স্বদেশের প্রতি ভক্তিমান হইতে হইবে স্বজাতির প্রতি প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে। যাঁহারা এ সময়ে গৃহবিচ্ছেদ বাধাইতে চেষ্টা করেন, অপরের গৌরবে মর্ম্মাহত হন, আপনারা বড় হইবার জন্য অন্য দশজনকে নিন্দা করেন, তাঁহারা কখনই দেশের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না, আপনারাও বড় হইতে পারিবেন না। ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন! যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, তিনিই আমাদিগের এই স্বদেশী ব্রতের পথ-প্রদর্শক। চল ভাই, অগ্রসর হই। বল, "বন্দে মাতরম্!"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্নপূর্ণা।

এখন নয়নজলে সিক্তমুখ পৃথ্বী'পরে রাখি'
সাধনার জলসেকে দীনতা-কর্দ্দম দেহে মাখি'
কাটিছে মোদের দিন। নাই, নাই বারি-বিন্দুপাত,
দগ্ধতাম্র ঊর্দ্ধ হ'তে বিনা মেঘে তীব্র বজ্রাঘাত
ঘন ঘন বাজে। বিত্রাসিত সর্ব্ববিত্ত, বাধাময়
সাধনায় কেহ আজি নহে নহে পূর্ণ-অসংশয় ;
তবু নিরুদ্যম-স্বেদ বিন্দুমাত্র নাহিক ললাটে,
মহোৎসাহে ফিরিতেছি কর্ম্মময়—রৌদ্রময় মাঠে।

অতঃপর কবে এক আনন্দ-প্রভাতে এইখানে,
অশ্রুসিক্ত এই ভূমি ভরিলে সুবর্ণময় ধানে
মিলিব এমনি করি। হাসিব এ অশ্রু বিনিময়ে ;
আসিবে শারদ শশী নিষ্কলঙ্ক মুখশশী ল'য়ে
স্মিতহাস্যে অভিনন্দি'। তখন ভুলিয়া সর্ব্বক্লেশ
লক্ষ্মীরে তুলিব ঘরে ;—অন্নপূর্ণা হবে মোর দেশ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগকে আজ অনেকেই বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সেদিন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতি ঠাকুরকে মিথিলায় লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু বঙ্গীয় প্রজা তাহাতে আপত্তি করিল না। কারণ তাহারা চিরকালই সত্যের দাস। প্রকৃত প্রস্তাবে ঠাকুরকে মিথিলাবাসীরূপে দেখিতে পাইয়া, তাহারা 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' জানাইল। এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া গুপ্ত মহাশয় তাহার পরেই কবি গোবিন্দ দাসকে লইয়া দেশান্তরী হইবার প্রস্তাব সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত করেন। এবার কিন্তু লোকে মৌন হইয়া থাকিতে পারিল না,—দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নানা বাগ্-বিতণ্ডার পর দেশের ছেলে গোবিন্দ দাসকে দেশে ফিরাইয়া আনিলেন, মায়ের ছেলে মায়ের ক্রোড় আলোকিত করিল, দেশও নিস্তব্ধ হইল। ইহার পরই আমাদের আলোচ্য লেখক-পুঙ্গব চণ্ডীদাস ঠাকুরকে লইয়া টানাহেঁচড়া আরম্ভ

করিয়াছেন। ইনিও মিথিলা দেশ ভালবাসেন; কাজেই চণ্ডীদাসকে তথায় প্রেরণ করিবার এক মন্তব্য ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুনের 'বঙ্গবাসী' পত্রে প্রকাশিত করেন। কিন্তু এ মন্তব্য লইয়া বিশেষ কোন গোলযোগ বাধে নাই। ইহা নিভৃতেই প্রকাশিত হয়; নিভৃতেই লয় পায়। দুই বৎসর পরে হঠাৎ তাহা এই লেখকের চক্ষে পড়ায়, শোধনযোগ্য একটী প্রস্তাব লইয়া "জাহ্নবী"র পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এ প্রস্তাব উপস্থিত না করিলেও কোনও ক্ষতি হইত না, কারণ মূল প্রস্তাব দেশের অল্প লোকেই জানিয়াছে, এবং আসলে চণ্ডীদাস ঠাকুরও এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ ছাড়া হন নাই। যাই হোক্ ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আমরা প্রস্তাবটা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম।

'বঙ্গবাসীতে' উক্ত লেখক লিখেন যে, শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "বিদ্যাপতির জন্মস্থান মিথিলা এবং চণ্ডীদাসেরও জন্মস্থান মিথিলা। তাঁহাদের উভয়েরই উপাধি ঠাকুর। বিদ্যাপতি ধনবান ব্যক্তি ছিলেন; চণ্ডীদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ। * * * নান্নুর গ্রাম যে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নয়, তাঁহার নিজের দুইটি গানই সে বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ। একটি গানে আছে,--

ভ্রমিতে ভ্রমিতে পৌঁছি নান্নুর গ্রামেতে।
দেবীর আদেশে যান পীঠের পাশেতে॥

আর একটি গানে আছে,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে।

এই দুইটি গানে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, চণ্ডীদাস অন্য স্থান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া অবশেষে নান্নুর গ্রামে বাস করেন।"

লেখক উক্ত দুই ছত্র গান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস নান্নুরের (বীরভূম জেলার) লোক নহেন, মিথিলার লোক। তদুত্তরে আমরা প্রথমেই বলি যে, লেখক চণ্ডীদাসের পদাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই, পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। উক্ত গান দুইটি মৎ প্রণীত "চণ্ডীদাস-চরিত" নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে, নিত্যা নাম্নী বনদেবীর বাশুলী নাম্নী এক সহচরী ছিল। এই বাশুলী, দেবীর আদেশে 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে' অবশেষে 'নান্নুর

গ্রামেতে প্রবেশ' করিয়া চণ্ডীদাসকে প্রেম-প্রচারের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সহজ ভজন দ্বারা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার উপায়বিধান করাই নিত্যার উদ্দেশ্য ছিল। লেখক শেষোক্ত গীতটির পূর্ব্বাংশ উদ্ধৃত করিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু অভিনব তত্ত্বাবিষ্কারের বাহাদুরীটা যে তাহা হইলে লভ্য হইত না! যাহা হোক্ আমরাই তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥" ইত্যাদি।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, নান্নুরের মাঠে নির্জ্জন পত্র-কুটীরে থাকিয়া চণ্ডীদাস ভজন-সাধন করিতেন। যথা,—

নান্নুরের মাঠে, পত্রের কুটীর
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথা
ভজন করায় নিতি॥ ইত্যাদি।

পাঠক! এখনও কি আপনারা বলিবেন, চণ্ডীদাস অন্যত্র হইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুরে আসিয়া প্রবেশ করেন?

এই বাশুলী ও তাহার কর্ত্রী নিত্যা বনদেবী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শালতোড়া গ্রামের বনে অবস্থান করিতেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী মধ্যে তাহারও উল্লেখ আছে ;—

"শালতোড়া গ্রাম, অতি পিঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী, নিত্য সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।

তাহারি চাপড়ে, নিদ্রা ভাঙ্গিল
পীরিতি হইল সুরু॥"

ইহার পর হইতেই চণ্ডীদাস পদ রচনায় মনোযোগ দেন।

এখন বোধ হয় আমার কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইহার পরও আর কেহ কি সন্দেহ করিতে পারেন, চণ্ডীদাস নান্নুর-বাসী নহেন? কিন্তু 'বঙ্গবাসীর' এই লেখককেই শুধু আমি দোষ দিতে পারি না, কারণ চণ্ডীদাস মিথিলাবাসী এ কথা আরো দুই একজন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, মজঃফরপুর জেলার উচ্চেট্ গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন, তথায় তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক তাহার "চণ্ডীদাস-চরিত" প্রকাশের পূর্ব্বে কোনও এক বন্ধুর সাহায্যে উক্ত উচ্চেট্ গ্রামে অনুসন্ধান করান, বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের বিষয় যে, তৎপোষকতায় কোন তত্ত্বই তিনি অবগত হইতে পারেন নাই।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

তাজমহল।

হেরিলাম প্রস্তরের বিচিত্র নির্ম্মাণ;
এ তাজমহল রূপ, আহা কি সুন্দর!
দেখে নাই পূর্ব্বে কভু আমার নয়ান
এ হেন অপূর্ব্ব সৃষ্টি লাবণ্য-লহর!
ধন্য আগ্রা! হৃদে ধ'রে এহেন রতন।
তরল সৌন্দর্য্য যেন হ'য়েছে জমাট।
একি রূপ! হেরি এই "শিলার-স্বপন"
খুলে গেছে চিরতরে মনের কপাট।
কেমনে বর্ণিব আমি এ সুন্দর স্থান?
ক্রোড়ে ধ'রে এ সুন্দরে যমুনার নীর,
নিরখি বিচিত্র রূপ তবু কাঁদে প্রাণ;
এ হেন সৌন্দর্য্যালয় সমাধি-মন্দির!
হেরি এ অচিন্ত্য শোভা মোহিল নয়ন।
হৃদয় কাঁদিল, হেরি সমাধি-প্রাঙ্গণ!

শ্রীমতী সুরধুনী পালিত।

আগ্রার তাজ ও রূপসী বিধবা নারী।

চৌধারে বিটপীরাজী সুন্দর শোভিত,
মধ্যে তার ব'হে যায় কৃষ্ণা-প্রবাহিনী;
শ্রেষ্ঠ কারুকার্য্য তুমি, মানব-রচিত।—
হে তাজ হেরিয়া তোমা তৃপ্ত এ পরাণী
হ'ল আজি; কিন্তু আমি করি না স্বীকার
তুমি গো উপমাহীন ভুবন-মাঝারে।
আমি জানি, হেন বস্তু আছে এ সংসারে,
তোমার সৌন্দর্য্য হারে সৌন্দর্য্যে যাহার।
সুন্দরী সেও হে তাজ! যমুনা তোমারে
ঘিরি আছে :—কেশের কালিন্দী নদী তারে
আছে আহা আবরিয়া! তোমারি সমান
সেও গো বেঁধেছে বুকে মর্ম্মর-পাষাণ;
তুমি ধর শব হৃদে হে তাজ বিষাদী,
আমার বিধবা-সখী জীয়ন্তে সমাধি!

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সিংহ।

ওরা এবং আমরা।

সে নাকি কোন্ এক অতীত যুগের অতি-বার্দ্ধক্যজীর্ণ সুবিস্তৃত কাহিনী; ওরা আর আমরা এক ছিলাম! হঠাৎ একদিন ওরা শৈলমালা লঙ্ঘন করিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল—আর আমরা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, কত কানন কান্তার, পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকা অধিত্যকা পার হইয়া শেষে গঙ্গা যমুনার শস্যশ্যামল সৈকতভূমি অধিকার করিয়া বসিলাম। তারপর কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর মহা ইতিহাসের পত্রে পত্রে কত উত্থান পতন বিজয় পরাজয় আপন আপন কাহিনী লিখিয়া গিয়াছে কত পর্ব্বত ধ্বসিয়া খসিয়া সমুদ্র হইয়াছে, সমুদ্র শুষিয়া শৈলমালা মাথা তুলিয়াছে, আরও কত কি হইয়াছে কে তাহার নির্ণয় করে!

ওরা চলিয়া গেল বটে কিন্তু বর্ব্বরতা ছাড়িতে পারিল না। আমরা যখন শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, ধর্ম্মে মহনীয়, ওরা তখন কাননচারী মাংসভুক্; আদিম বর্ব্বরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তখন কে জানিত যে, এমন দিনও আসিবে যখন ওরা হাতে তুলিয়া দিলে আমরা খাইয়া বাঁচিব; না দিলে উহাদেরই মুখ চাহিয়া অনাহারে কাতারে কাতারে মরিয়া পড়িয়া থাকিব। ধন্য বিশ্বের মহাচক্র! কাহাকে কোন্ দিকে ঘুরাইতেছে কে বলিবে!

আমাদের কানন ধীরে ধীরে কুঞ্জভবন হইল। সেই মুঞ্জ-কুঞ্জবনে কত সুকণ্ঠ কোকিল গাহিয়া উঠিল ওরা কি তখনও কথা কহিতে শিখিয়াছে? আমাদের হোমধূম-গন্ধামোদিত শান্ত স্নিগ্ধ তপোবন যখন ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির মীমাংসার তপন কিরণে উজ্জ্বল তখনও কি উহাদের অন্ধকার ঘুচিয়াছে? হায় রে অদৃষ্ট! তখন কে ভাবিয়াছিল যে উহাদের মিল্ স্পেনসার, বেকন, বেন্থাম না হইলে আমাদের উপায়ান্তর থাকিবে না—উহাদের নিউটন, হার্শেল টিণ্ডাল না হইলে আমাদের দিন চলিবে না—তখন কে মনে করিয়াছিল যে উহারা না থাকিলে আমরা বাঁচিব না!

সে কাল আর নাই। যখন আমরা বর্ম্মে চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া মৃগয়া করিতাম, যখন আমরা মহার্ঘ চিক্কণ পট্টবস্ত্রে দেহাবৃত করিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুমচয়ন করিতাম, যখন আমাদের কুলকামিনীগণ রত্নকাঞ্চি, সুবর্ণমেখলা, বহুমূল্য বলয়, দীপ্তিমান কনক হারে সজ্জিত হইয়া নূপুরসিঞ্জনমুখরিত

দেব-মন্দিরে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মত শোভা পাইতেন তখন হয়ত উহারা নগ্ন, অথবা বল্কল পরিহিত অথবা ব্যাঘ্র ভল্লুকের চর্ম্মে দেহাচ্ছাদিত করিয়া কাননে কাননে বিচরণ করিতেছে! তখন কে জানিত যে সেই আমরা উহাদেরই দ্বারে লজ্জা নিবারণের জন্য গিয়া দাঁড়াইব! উহাদের দান—পরম আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে শিরে ধরিয়া আমরা কৃত-কৃতার্থ হইব—একদিন যদি উহারা বস্ত্র না দেয় আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া কাননে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইব, কারণ, আমাদের লজ্জা আছে, নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই! হায় তবুও আমরা বাঁচিয়া আছি।

শুধু যে বাঁচিয়া আছি তাহাই নহে; আমরা সাজসজ্জায়, কথায় ব্যবহারে, আহারে বিহারে আমাদের নিজের ছাড়িয়া উহাদের মত হইতে চাহি। কিন্তু ওরা আমরা কত ভিন্ন!

ওরা কাজ করে, কথাও বলে। আমরা শুধু কথা বলিতে শিখিয়াছি, কাজ করিতে জানি না। ওরা সভা-সমিতি করে, বক্তৃতা করে, রেজল্যুশন করে, দেখাদেখি আমরাও সে সব করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু উহারা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া রেজল্যুশন করিলে আমরণ তাহা পালন করে, আর আমরা বাহিরে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ঘরে আসিয়া লুকাইয়া সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি! তবুও আমরা উহাদের বুলি বলিতে ছাড়ি না, উহাদেরই মত উহাদের ডাক ডাকিতে চাই, নিজের ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া পরের ভাষায় হাঁসি, কাঁদি, স্বপ্ন দেখি! আমাদের এবং ওদের কত পার্থক্য! আমরা কথায় বলি "ভাই ভাই" মনে মনে জানি "ঠাঁই-ঠাঁই"; আর যদি রংটা সাদা হয়, মাথায় একটা ব্যানার টুপী ও হাতে এক গাছি বেতের ছড়ি থাকে,—তা হউক না ছেঁড়া প্যানটালুন, জীর্ণ টাই, গ্রন্থিরিহীন পাদুকা,—তবে ত কথাই নাই। উহারা একের জন্য অপরে প্রাণ দেয়! কিন্তু আমরা সহানুভূতি দেখাইতে হইলে কাঁদি; উহারা কালো ফিতা বাঁধে। আত্মীয় বন্ধুর পীড়া হইলে আমরা তাহার শিয়রে বসিয়া রাত্রির পর রাত্রি কাটাইয়া দি; আর উহারা 'কার্ড' রাখিয়া আইসে। কিন্তু সমগ্র জাতিটা লইয়া যেখানে নাড়া চাড়া হয় তা হউক না কেন নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডে বা নোভাজেম্‌ব্লায় উহারা আপনার টুকু সবলে আঁকড়াইয়া ধরে, মরিলেও ছাড়ে না! আর ময়মনসিংহে রামচন্দ্রের মাথা ফাটিলে আমরা সংবাদপত্রে সে ঘটনা পড়িয় দশজনে গলাবাজি করিয়া কেবল বলিতে জানি "কাজটা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।"

উহাদের এখানে ছিল না কিছুই অথচ সবই হইয়াছে আমাদের সবই ছিল, কিন্তু কিছুই নাই! উহারা লইতে জানে রাখিতে জানে। আমরা রাখিতে জানি না, ভোগাইয়া লইলে দিতে জানি। উহারা লয়, দেয় না। আর আমরা কেবলই দি, শেষে ভিক্ষা করিয়াও পাই না! উহারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজত্ব লাভ করিল। আমরা শুল্ক লাভের আশায় শেষে ভিখারী হইলাম। রৌদ্র মাথায় করিয়া, ঝড় তুচ্ছ করিয়া, শিলাবৃষ্টি সহিয়া আমরা উৎপন্ন করি, উহারা লইয়া যায়। আমাদেরই জিনিষ, একটু অবস্থান্তর ঘটাইয়া উহারা আবার তিনগুণ দামে আমাদেরই কাছে বিক্রয় করে; আমরা হাসিমুখে ঘরে লইয়া আসি! আমরা নির্ব্বোধ উহারা বুদ্ধিমান, উহারা সবল আমরা দুর্ব্বল;—কথাতেই বলে

অজ্ঞানেতে কেনে বই
জ্ঞানবানে পড়ে,
ধনবানে ঘোড়া কিনে
বলবানে চড়ে।

তবে আমরা কেন উহাদের মত হইতে চাই? আমরা একদিন ত আপন চরণে ভর করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতাম, উহারা আদর করিয়া দিন কতক আমাদিগকে মাথায় করিয়া বহিয়া বেড়াইল; আমরা হাঁটিতে ভুলিয়া গেলাম!

সমুদ্রতরঙ্গে খালি জাহাজ ডুবিয়া যাইবার ভয়ে যখন হইতে উহারা জাহাজে পাথর বোঝাই করিয়া এদেশে আসিত আর প্রত্যাবর্ত্তণকালে সাত রাজার ধন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত উহারা তখন হইতেই আমাদিগকে বুঝিয়াছিল। তাই কাচ দিত কাঞ্চন লইয়া যাইত! শেষে এমন দিনও আসিল যখন উহাদের ভয়ে আমরা হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম! তবুও আমরা বসনে ভূষণে উহাদেরই মত হইতে চাই! নির্লজ্জ আর কাহাকে বলে?

উহারা জন্মিয়াই ঘোড়ায় চড়িতে শিখে, বন্দুক লইয়া খেলা করে, "Rule Britania rule the waves" গাহিতে শিখে, আর আমরা পাছে একটা আছাড় খাই তাই বাল্যকালে জননীর ক্রোড়চ্যুত হই না ঘোড়া যেখানে সে স্থান হইতে শত হস্ত দূরে যাওয়াই তখন আমাদের শাস্ত্রের আদেশ। একটা বন্দুক আওয়াজ করিয়া কাক চিল তাড়াইতে পারে আমাদের মধ্যে এমন

সাহসী বীর কয়জন? আঙ্গুল কাটিয়া এক ফোঁটা রক্ত পড়িবে বলিয়া আমরা ছেলেদের হাতে পেন্সিল কাটিতেও একখানা ছুরি দিতে চাই না। আর সে ছুরিই বা পাইব কোথায়? বাঁশ-কাঠ কাটিতে 'দা' রাখিলেও পাশের প্রয়োজন! আর চাহিয়া দেখ ছুরি না হইলে ওদের আহার পর্য্যন্ত হয় না।

ওরা কত অসাধ্য সাধন করিতেছে! পাহাড় ভাঙ্গিতেছে, নদী বাঁধিতেছে; সৌদামিনী লইয়া আমোদ করিতেছে। আমরা প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইতেছি না বটে, কিন্তু প্রতিদিন ক্রমেই হাড়গোড়-ভাঙ্গা'দ' হইয়া পড়িতেছি। উহাদের শরীরে শক্তি আছে, সিন্ধুকে অর্থ আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে—লক্ষ্মী-শ্রী উহাদের হইবে না ত কি আমাদের হইবে? আমাদেরও যে শক্তি নাই, অর্থ নাই, বুদ্ধি নাই এমন নহে তবে আমাদের উহাদের মত নিয়োগ করিবার ক্ষমতা নাই অথচ বাহিরে বাহিরে আমরা ওদের মত হইতে চাহি। তা কি সম্ভব?

আমাদের সমাজ স্থিতিশীল—উহারা চির-গতিশীল। বর্ত্তমান বাস্তববাদী সভ্যতার প্রধান উপাদান স্রোতের মুখে গা ঢালিতে শেখা, আমাদের সে শিক্ষা নাই। উহাদের সে শিক্ষা দস্তুর মত হইয়াছে অথচ আমরা বলি উহাদের অপেক্ষা আমরা কম কিসে? উহাদের ও আমাদের আচারব্যবহারের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমরা বলি আমাদের যা তাই ভাল। কিন্তু প্রত্যক্ষ করি উহাদের যা তা অধিকতর উপযোগী কিন্তু আমরা তা সর্ব্বাংশে গ্রহণ করি না। অথচ উহাদের কর্ম্মজীবনের যে সফলতা তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটে না বলিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই। উহাদের ধর্ম্মজীবন উহাদের কর্ম্মজীবনের হাত ধরা। আমাদের ঠিক তার বিপরীত, অথচ উহাদের কর্ম্মজীবনের সফলতা আমরা চাই। আমরা নিজস্ব আদর্শ হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি অথচ উহাদের আদর্শ আমরা ঠিক আত্মসাৎ করিতে পারিতেছি না। উহাদের মত সে সাধনাও আমাদের নাই কিন্তু উহাদের ঐ সিদ্ধির অন্বেষণে আমরা অন্ধ হইয়া ছুটিয়াছি। আমাদের অশিক্ষিতা রমণীরাও যাকে সংস্কারবশে স্বার্থত্যাগ বলিয়া জানে উহাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত পুরুষও তাহাকে বাঁদরামী বলিয়া মনে করে। আমরা শ্রেণী বিশেষে নামে শাক্ত। উহারা সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়াও শক্তির উপাসক, প্রত্যেক শিশুটি পর্য্যন্ত এক একটি শক্তির অবতার। শক্তির, অঞ্চল আমাদের আশ্রয়স্থল। উহাদের বজ্রমুষ্টির আড়ালে উহাদের গাউন-রূপিণী শক্তির লীলাভূমি। আমাদের দয়ার নাম উহারা দুর্ব্বলতা রাখিয়াছে।

আমরা প্রবৃত্তির শেষ ভস্ম করিয়া উড়াইয়া দি, উহাদের নিবৃত্তির আরম্ভ সুদর্শন-সুরক্ষিত সমাধিস্তম্ভ ছাড়াইতে পারে না, অথচ আমরা উহাদের মত না হইতে পারিয়া নিজেদের ধিক্কার দিতেছি।

প্রাণপণে উহাদের অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি তাহাও ঠিক বুঝি না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উহাদের দেশে গিয়াছেন, উহাদের শিক্ষালাভ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নবীনেরা বলেন উহাদের সকলই অনুকরণ করিবার যোগ্য। যাঁহারা প্রবীণ—তাঁহারা বলেন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'। প্রবীণ যাহা অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছেন নবীনকে একদিন তাহাই বুঝিতে হইবে। উহাদের শিক্ষায় আমরা মরিয়া বাঁচিয়াছি। কিন্তু সে কেবল আবার মরিবার জন্য। এই মৃত্যুই—শেষ মৃত্যু, ইহার পরে আমাদের সে অনন্ত জীবন নাই। আমরা যাহাই করি আমরা আমরাই থাকিব, উহারা কি হইবে ভগবান জানেন।

চির-সধবা।

১

চঞ্চলা কমলার চাঞ্চল্যে আজ হেমচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হেমের পিতা ধনকুবের না হইলেও অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। ভবিষ্যতে অল্পে অল্পে সামলাইয়া উঠিবার আশায় কারবারে লোকসান দিয়াও তিনি বাহ্যিক চালচলন বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু কালের তুষার-শীতল করস্পর্শে তাঁহাকে অকস্মাৎ ইহসংসার হইতে চলিয়া যাইতে হইল। হেমচন্দ্র স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদারের টাকা শোধ করিয়া দিলেন।

হেম তাহার স্ত্রীর এক দূরসম্পর্কীয় মাতুলের গৃহে শিশুপুত্র বীরেন ও তাহার জননী তরুণী সবিতা সুন্দরীকে রাখিয়া অবস্থার উন্নতিকল্পে সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন।

সবিতা সমস্ত দিন ধরিয়া স্বামীর নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি পাঁচবার নাড়িয়া চাড়িয়া যত্নের সহিত বাক্সের মধ্যে গুছাইয়া দিল। যাইবার সময় স্ত্রীপুত্রকে ছাড়িয়া যাইতে হেমের প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল; তিনি বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ছেলেটীকে কোলে করিয়া সবিতার চোখের জল নিজের

উত্তরীয়ের অগ্রভাগ দ্বারা মুছাইয়া দিলেন; তারপর কর্ম্মস্থানে গিয়া নিয়মিত পত্র লিখিবেন এবং শীঘ্রই দেশে ফিরিবেন বলিয়া সবিতাকে সান্ত্বনা দিলেন।

সবিতার বলিবার অনেক ছিল; কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাহার হৃদয় যতই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহার ভাষা ততই মূক হইয়া পড়িল। নীরবে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সাধ্বী স্বামীকে বিদায় দিল। বীরেনের মুখচুম্বন করিয়া হেম গাড়ীতে উঠিলেন। থার্ড ক্লাশ গাড়ী যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। হেম তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া, জলভরা মেঘের মত গুরুভার হৃদয় লইয়া, গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল; বাষ্পীয় যান কত নিরাশা, কত মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, কত সকরুণ অশ্রু; কত সাধ, কত সোহাগ, কত ব্রীড়ার হাসি বক্ষে ধরিয়া কত স্বদেশকে প্রবাস করিয়া কত প্রবাসকে স্বদেশ করিয়া ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিল।

তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, হেম আগ্রায় আসিয়াছেন। তিনি এখানে এক ইংরাজের আপিষে প্রথমে সামান্য বেতনে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে সাহেবেরা অত্যন্ত প্রীত হন, এবং এই সামান্য তিন বৎসরের মধ্যেই হেমকে আপিষের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত করিয়া দেন।

হেম এখানে আসিয়া তাজমহল, আগ্রার দুর্গ, সেকেন্দ্রা প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর বর্ণনা করিয়া প্রথম প্রথম সবিতাকে নিয়মিতরূপে পত্র লিখিতেন, তারপর দেশের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে পত্রের কলেবর ছোট হইতে লাগিল; পরে কি লিখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না; সুতরাং পত্র লেখাও একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। সবিতার পাঁচ সাত খানা পত্র পাইলে হেমচন্দ্র লিখিতেন—"আজকাল কাজ কর্ম্মে এত ব্যস্ত যে একছত্রও লিখিবার অবসর পাই না" ইত্যাদি।

সবিতা সে পত্র পাইয়া ম্রিয়মান ও অবসন্ন হইয়া পড়িত, তাহার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিত; জগৎ-সংসার তাহার চক্ষে নিভিয়া যাইত। পত্রের প্রতি অক্ষর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিত। অভাগিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিত না, কেবল নির্জ্জনে

অশ্রুমোচন করিত। হায়! অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে তা কে বলিতে পারে?

৩

আগ্রায় হেমের বেশ একটু প্রতিপত্তিও হইয়াছে, সুতরাং এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় এখন তাঁহার গৃহে অনেক বন্ধুর সমাগম হয়।

হেম একজন নিপুণ চিত্রকর, তাহার উপর সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, কাজেই তাহাদের মধ্যে প্রায় সাহিত্য ও শিল্পের আলোচনা হইত।

একদিন স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, এমন সময়ে, হেমের এক বন্ধু বলিলেন—"এখানে একজন বিদুষী রমণী আছেন, তাঁর সহিত আলাপ করিয়া আসা যা'ক চলুন।" হেমচন্দ্র বলিলেন, "নর্ত্তকীর সহিত আবার আলাপ করিব কি?" তাহাতে বন্ধুরা বলিলেন "আপনি লছিমার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাই ওরূপ বলিতেছেন। লছিমা বারবিলাসিনী নহে। রূপের পসরা লইয়া ধনীর দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়ান তাহার ব্যবসা নহে; সে অর্থেরও কাঙালিনী নহে, তাহার প্রতিপালিকা তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া গিয়াছে। বালিকা অবস্থায় সে পিতৃমাতৃহীনা হয়, তাহার এক আত্মীয় পয়সার লোভে তাহাকে এক বারনারীর নিকট বিক্রয় করে; কিন্তু ঐ বারবিলাসিনী লছিমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখায় এবং নৃত্যগীতে সুশিক্ষিতা করে। লছিমা সুগায়িকা, কলানুরাগের খাতিরে সে এ ব্যবসা করে বটে কিন্তু সে কাহারো বাড়ী গিয়া নৃত্যগীত করে না। লোকে ইচ্ছা হইলে তাহার বাড়ীতে গিয়া গান শুনিয়া আসে, তাহাও আবার সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাহার সহিত আলাপ করিলে আপনি নিশ্চয় মুগ্ধ হইবেন; সে চরিত্রহীনা নয়।"

হেম প্রথমে রাজী হন নাই, কিন্তু বন্ধুবর্গের এইরূপ আগ্রহাতিশয্যে একদিন লছিমার সহিত আলাপ করিতে যান। তিনি লছিমার নৈপুণ্যে, রূপে ও গুণে সত্যই মুগ্ধ হইয়া আসেন। লছিমার কলা-প্রবণ হৃদয়ও বোধ হয় হেমের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে কেন না সেও হেমকে মধ্যে মধ্যে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। তাহার এ অনুরোধও অভূতপূর্ব্ব। হেমও সেই অবধি মধ্যে মধ্যে যাওয়া আসা

করিতেন; ক্রমে লছিমা যখন জানিতে পারিল যে হেম একজন নিপুন চিত্রকর, তখন সে চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য হেমকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিল। অগত্যা হেমকে তাহাতে রাজি হইতে হইল। হেম একদিন পরিহাসচ্ছলে লছিমাকে বলিল, "আচ্ছা আমি যে বিদ্যা শিখাইতেছি, তাহার দক্ষিণা কি পাইব?"

লছিমা সেইদিন হইতে হেমকে প্রত্যহ একটি করিয়া গান শুনাইত।

৪

এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল কেহই তাহা ধরিতে পারিল না। লছিমা এখন হেমের সাংসারিক সকল কথাই শুনিয়াছে কেবল সবিতা ও তাহার শিশুপুত্রের কথা জানিত না, কারণ হেমচন্দ্র সেটুকু তাহার নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন।

কৃতজ্ঞতার মোড় ছাড়াইয়া উভয়েই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে প্রণয়-পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে লছিমা হেমকে বলিয়া ফেলিল "আচ্ছা আমরা যদি উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হই তাহাতে তোমার মত কি?" অনেক দিন হইতে হেম লছিমার গুণে ও রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। একবারও ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না কি অপরাধে তিনি সেই নিরপরাধা সাধ্বী স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতেছেন। ভবিষ্যতে তাহাদের কি হইবে, তাহারা কাহার মুখ চাহিবে।

লছিমাকে যখন বিবাহ করাই স্থির হইল তখন সবিতার সহিত কিসে সম্বন্ধ লোপ হয় সেই চেষ্টাই হেমচন্দ্রের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি অনেক ভাবিয়া শেষ আপনার মৃত্যু ঘোষণা করাই স্থির করিলেন; এবং হটাৎ সর্দ্দিগর্ম্মিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এই মর্ম্মে সবিতার নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন।

স্বামীর মৃত্যু সংবাদে সবিতা মূর্চ্ছিতা হইল; হায় অভাগিনীর শেষ আশার যে ক্ষীণ আলোটুকু জ্বলিতেছিল তাহাও আজ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইল। একটি জীবন-দীপের অভাবে তাহার সমস্ত জীবন জন্মের মত অন্ধকার হইয়া গেল।

৫

সবিতা সধবার বেশ ত্যাগ করিয়াছে, সে সিঁথির সিন্দুর মুছিয়াছে; হাতের

লোহা খুলিয়াছে; অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছে; শাড়ী ছাড়িয়া থান ধরিয়াছে; সে বিধবা!

সবিতা মাতুলালয়ে আসিলে তাহার মামা নিবারণ বাবু সুদীর্ঘ প্রবাসের পর একবার মাত্র দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি রেলওয়ে অফিসে কাজ করিতেন। ছুটি তাঁহাদের ভাগ্যে কুম্ভ মেলার পুণ্য সঞ্চয়ের মত ছিল। সুতরাং স্বদেশ তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিদেশের মত হইয়া পড়িয়াছিল।

নিবারণের স্ত্রী পার্ব্বতী পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কর্ম্ম স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কিন্তু কয় বৎসর হইতে বাতরোগগ্রস্থা হইয়া দেশেই আছেন। সবিতা মাতুলালয়ে আসিয়া থাকাতে পার্ব্বতীর অনেক সুবিধা হইয়াছিল। পুত্র কন্যার লালন পালন ও গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মই প্রায় সবিতা করিত। এক বৎসর হইতে পার্ব্বতীর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছিল, বর্ষার শেষে উঠিবার আর শক্তি রহিল না। নিবারণ যখন ছুটি পাইয়া দেশে আসিলেন পার্ব্বতী তখন স্তিমিত-জ্যোতি। বহুদিন পরে স্বামীকে দেখিয়া নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপ একবার একটু উজ্জল হইয়া উঠিল, এবং পুত্র কন্যাকে স্বামীর হাতে দিয়া যেখানে গেলে সকল জ্বালা জুড়ায় সেইখানে চলিয়া গেল।

নিবারণ স্ত্রীর বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, প্রাণের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন; গৃহ তাঁহার পক্ষে বিজয়া-দশমীর প্রতিমাহীন পূজার দালানের মত বোধ হইতে লাগিল। ঘরে তাঁহার আর মন টিকিল না! তিনি শীঘ্র ঘরবাড়ীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া পুত্র কন্যা ও সবিতাকে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন, এবং ছুটীর অবশিষ্ট দিন কয়টা পুণ্যধামে কাটাইয়া সকলকে লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

৬

নিবারণের স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে, ছেলে পুলে লইয়া এ-দেশ সে-দেশ করিয়া অবশেষে, অল্পদিন হইল, নিবারণ বঁদ্‌লি হইয়া আগ্রায় আসিয়াছেন।

এখানে আসিয়া সবিতা পূর্ব্বের মত ছেলেদের তত্বাবধান, গৃহকর্ম্ম সকলি করে, কিন্তু কিছু বিষণ্ণ; সর্ব্বদাই যেন অন্যমনা। বিকালে ছেলেরা যখন কাছে না থাকে পথের ধারে জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া সে ভাবে, বীরেন ও তাহাকে ছাড়িয়া কতদিন তাহার প্রাণের দেবতা এইখানে ছিলেন। তাহার মনে পড়িত কতবার হেমচন্দ্র তাহাকে লিখিয়াছেন "যতদিন না তোমাকে

কাছে আনিতে পারি এবং এই সকল বিচিত্র শিল্পচাতুর্য্য দেখাইতে পারি ততদিন আমার মনে সুখ নাই"—ভাবিতে ভাবিতে অভাগিনীর অজ্ঞাতে নয়নাশ্রু ঝরিয়া পড়িত।

সম্মুখস্থ বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক সবিতার সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ তাহাকে বিদেশিনী দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাহার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। ক্রমে রমণী সবিতার সহিত আলাপ করিল এবং সবিতার বিষাদ মলিন সুন্দর মুখখানি ও শান্ত মধুর প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সেই অবধি রমণী সবিতাকে আপন ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ-চক্ষে দেখিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা দুজনে জানালার ধারে বসিয়া গল্প করিতেছে সবিতা তাহার অতীত জীবনের আশা নিরাশায় বিজড়িত অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ইতিহাস বলিতেছে,—এমন সময় একজন একখানি তৈল চিত্র হাতে করিয়া বারান্দায় আসিয়া বলিল—"লছিমা দেখ দেখি ছবিখানি কেমন হইয়াছে?" বলিয়া যেমন তাহার হাতে দিবে অমনি সম্মুখের জানালার মধ্য দিয়া দেখিল একটী স্ত্রীলোক অস্ফুট ধ্বনি করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হেম প্রথমে বিধবার বেশে সবিতাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার আর চিনিতে বাকি রহিল না রমণী কে। তাহার হাত হইতে ছবি পড়িয়া গেল, তাহার মুখ বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল; সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঘরের মধ্যে গিয়া পালঙ্কে বসিয়া পড়িল।

লছিমা হঠাৎ হেমের এরূপ অসুস্থ ও বিবর্ণ হইবার কারণ ঠিক করিতে না পারিয়া ঘরে গিয়া হেমকে উহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। হেম "ও কিছু নয়" বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লছিমা সবিতার কাছে তাহার জীবনের যে বিষাদ-কাহিনী শুনিতেছিল তাহাতে লছিমার মনে হেমের উপর কেমন একটা সন্দেহের ছায়া পড়িতেছিল; সে ছাড়িল না, বলিল—"সবিতা তোমাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইল কেন? আর তুমিই বা ওরূপ বিবর্ণ হইলে কেন? নিশ্চয় তুমি ইহার কিছু জান, বলিতেই হইবে।" হেম দেখিলেন লছিমার কাছে সকল কথা বলা ছাড়া এখন আর অন্য উপায় নাই; সুতরাং তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, শুনিয়া লছিমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। হেমের প্রতি তাহার ঘৃণার ভাব আসিল। সে বলিল "তুমি অতি হৃদয়হীন পাষণ্ড। যে তোমার জন্য জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে, যে আজিও

তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে রাখিয়া সতত পূজা করিতেছে, যাহার তুমি ভিন্ন অন্য গতি ছিল না তাহার সহিত এই প্রতারণা—এই জঘন্য ব্যবহার! তোমাকে আর কি বলিব তুমি পশু হইতেও অধম ছি!"—লছিমা আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সাম্‌লাইয়া লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

হেম শয্যায় পড়িয়া সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলেন। সবিতার বিধবার পূত শুক্ল বেশ সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। তিনি এক রকম নেশার ঘোরে পড়িয়া রহিলেন।

৭

নিদ্রিত ব্যক্তির নাসারন্ধ্রে তীব্র অ্যামোনিয়া ধরিলে তাহার যেমন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়, নিরপরাধা সাধ্বী সরলা স্ত্রীর সহিত অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের দৃষ্টি বিনিময়ে হেমের সুপ্ত অনুতাপও সেইরূপ হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর উক্ত ঘটনার পর হইতে লছিমা, কিসে হেমচন্দ্র ও সবিতার পুনর্মিলন হয়, চেষ্টা করিতে ছিল। সে ভাবিল তাহার জন্য সবিতা কেন চিরজীবন স্বামীসুখে বঞ্চিতা রহিবে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার পরদা হইয়া তাহাদের মধ্যে এই নিদারুণ ব্যবধান সৃষ্টি করিবার সে কে? সে সবিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য হেমকে প্রত্যহ জেদ করিতে লাগিল। গাঁটী নারীহৃদয়ের অপূর্ব্ব মহিমায় স্বার্থের নীচতা ও সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা বৃষ্টি পাতে বসন্ত বল্লরীর মত ধৌত নির্ম্মল উজ্জ্বল পবিত্র হইয়া উঠিল। হেমও ভাবিলেন এখন যদি প্রাণপণ করিয়াও সবিতাকে সুখী করিতে পারেন! কিন্তু সবিতা কি তাহাতে রাজী হইবে? একবার মনে করিলেন নিবারণ বাবুকে সব খুলিয়া বলিবেন, কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে? তিনি তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন না। এ পর্য্যন্ত তাহাকে কখন দেখেন নাই; তারপর বিবাহের উপযুক্ত তাঁহার এক কন্যা আছে। পরে হয়ত সমাজে একটা গোলমাল হইবার সম্ভাবনায় তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইতেও পারেন। তখন কোন আশাই আর থাকিবে না। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া, কি করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া, হেম অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে লছিমার পরামর্শ মত প্রথমে সবিতাকে পত্র লেখাই স্থির করিলেন। কিন্তু এতদিন পরে কি লিখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।—শেষে লিখিলেন,——

"সবিতা,

অনেক দিন পরে এ বিশ্বাসঘাতক আজ আবার তোমাকে পত্র

লিখিতেছে। জানি না তোমার প্রতি যে অমার্জ্জনীয় ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে তুমি আর কখনও আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে কি না। বিনা অপরাধে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম; কেন, সে কৈফিয়ৎ দিবার সময় আজ নয়, আমিও সে চেষ্টা করিব না—সে চেষ্টা করিয়া, নিজের সে কলঙ্ক-কাহিনীর অবতারণা করিয়া আর তোমার অপমান করিব না। তুমি কি এ কথা বুঝিবে? আজ কয়দিন হইতে হৃদয়ে যে তুঁষের আগুন জ্বলিয়াছে তাহার দাহিকা শক্তিকে আর আহুতি দিব না! তুমি কি এ অপরাধীর কথা বিশ্বাস করিবে?—আমি এখন কেবল পুড়িতেছি,—প্রায়শ্চিত্তের অতীত হইয়া পুড়িতেছি। তবে আমার হইয়া লছিমাও যে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে তাহা যদি যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় তবে আমায় গ্রহণ করিয়া রক্ষা কর।"

সবিতা সে পত্র পড়িয়া সারারাত অনেক কাঁদিল। তারপর লিখিল—

"সেবিকার নিবেদন—

'আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? আমার কর্ম্মফলের যে ভোগ ছিল তাহা ফলিয়াছে। আবার বিধাতার বিধানেই আমার মাথার সিঁদুর ও হাতের নোয়া অক্ষয় হইয়াছে ইহাতে কাহারও প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক কি? যদি জন্মান্তর থাকে তবে আপনাকেই আবার স্বামী পাইব।"

হেমচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রাণের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা অব্যক্ত যাতনার সৃষ্টি করিতে লাগিল।

৮

ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে সবিতার শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সে একেবারেই শরীরের আর যত্ন লইত না। তাহার উপর এ কয় মাস হইতে আর্দ্রবস্ত্র পরিয়া থাকা, অনাহার, ভূমি-শয্যায় শয়ন প্রভৃতি যথেচ্ছাচার করিতেছিল। দুর্ব্বল শরীরে আর কত সহ্য হইবে? হঠাৎ একদিন তাহার খুব জ্বর দেখা দিল। নিবারণ বাবু সবিতার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার পরীক্ষান্তে বলিলেন—রোগ কঠিন; বাঁচিবার সম্ভাবনা খুব কম।

লছিমা পীড়ার খপর পাইয়া সবিতার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ডাক্তারের একান্ত

চেষ্টা, লছিমার অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা, ও নিবারণ বাবুর অজস্র অর্থব্যয় কিছুতেই কিছু হইল না। নিষ্ঠুর ভবিতব্য তাহাদের মিলিত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। সবিতা-কুসুম দিনে দিনে শুষ্ক ও ম্লান হইতে লাগিল।

ক্রমে সবিতা বুঝিল তাহার জীবনের গোধূলি আসিয়াছে। ধরণী জননী তাহাকে শত চেষ্টাতেও স্নেহের শিকলে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিবেন না। তখন সে লছিমাকে একদিন ডাকিয়া বলিল, বোন, আজ আমার একমাত্র বাসনাটী পূর্ণ কর। তাঁকে ডাক, তিনি এসে আমার এ বেশ মুক্ত করে দিন। আজ শেষ দিনে তাঁকে একবার জন্মের শোধ দেখাও।"

লছিমা তাড়াতাড়ি গিয়া বীরেন ও হেমকে লইয়া আসিল। হেম সবিতার শয্যায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হেমের ক্রন্দনে সবিতাও কাঁদিতে লাগিল। চোখের জল মুছিয়া বলিল অনেক অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর। মরণের সময় যে তোমায় দেখিতে পাইলাম ইহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইল। বীরেন রহিল, তাহাকে দেখিও।" তারপর লছিমাকে বলিল, বোন, রমণী জীবনের সার রত্ন স্বামী পুত্র তোমাকে দিয়া চলিলাম। দেখো, বীরেন যেন আমার আর মাতৃহীন না হয়।" অভাগিনী আর বলিতে পারিল না। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সব স্থির হইয়া আসিল। সতী সাধ্বী পতি পুত্র রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেল।

সবিতাকে সধবার বেশে হেমচন্দ্র যথারীতি সৎকার করিলেন।

তিনি এতদিন সবিতাকে বিধবার বেশ পরাইয়াছিলেন, আজ মৃত্যু আসিয়া তাহাকে চির-সধবার বেশ পরাইয়া দিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত।

স্বপ্ন-প্রসঙ্গে।

স্বপ্ন যে অমূলক নহে এ বিষয় বহু দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহা প্রায়ই হাতে হাতে ফলিয়া থাকে।

আমি দেড় বৎসর পূর্ব্বে যখন সন্তানাদি লইয়া মুঙ্গেরে থাকিতাম, তখন (১৩১২ সালের আষাঢ় মাসের প্রথমে) আমার শশ্রূঠাকুরাণী চুঁচুড়ায় বাটীতে পীড়িত ছিলেন। তাহা আমরা জানিতাম। ৩রা আষাঢ় আমি সন্তানগণের সহ নিদ্রিতা রহিয়াছি, ভোর ৫ টার সময় স্বপ্ন দেখিলাম

যে কোন ব্যক্তি আসিয়া আমার সন্তানদের বলিতেছে,—তোমাদের ঠাকুর মাতার মৃত্যু হইয়াছে তোমরা জুতা পরিয়া আছ কেন?

আমি চমকিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলাম এবং ৬টা বাজিলে ডাকঘরে পত্রের জন্য আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইলাম সে আধ ঘণ্টার মধ্যে পত্র গুলি লইয়া আসিল। সে পত্রের মধ্যে একখানি পোষ্টকার্ডে—৩রা আষাঢ় প্রাতে আমার শাশুড়ীর গঙ্গা লাভ হইয়াছে লেখা ছিল, আমার স্বপ্নের বিষয় পত্র আসিবার পূর্ব্বেই সকলকে বলিয়াছিলাম। ঠিক একঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আসায় সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি নব্বুই বর্ষীয়া বৃদ্ধা ছিলেন ও চিরদিন দেবপূজা-অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রপৌত্রেরা পাছে কোনরূপ অশুচি অবস্থায় অনিয়ম করে এজন্য সূক্ষ্মাত্মা আসিয়া আমাদের সতর্ক করিয়া দিল।

আমার পুত্র শ্রীমান ফণিগোপাল ঐ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে ঐ ৩রা তারিখে, মুঙ্গের লালদরজার ঘাটে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হইল। সে বি-এ পরীক্ষা দিয়া মুঙ্গেরের বাসায় আমাদের নিকট ২০।২৫ দিন মাত্র আসিয়া-ছিল। ১৭ই মে ৩রা জ্যৈষ্ঠ, যে দিন সে জলমগ্ন হইবে ঐ দিন, ভোরে ৫টার সময় আমি স্বপ্ন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলাম। তাহার ছয়মাস পূর্ব্বে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনীবালার মৃত্যু হইয়াছিল তাহার শোকেই আমরা মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছি। সুস্থ-সবল দেহ শ্রীমান ফণি বাটী আসিয়াছে তাহার কোন অমঙ্গল আশঙ্কাই মনে করি নাই কিন্তু হটাৎ ঐ দিন ভোরে স্বপ্ন দেখিলাম যে আমার মৃত কন্যা নলিনী আমার পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিতেছে যে,—কি হইতেছে তুমি দেখিতেছ না। আমি তাহার ডাকে চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু কোন বিষয়ে সে আমার সতর্ক করিল বুঝিলাম না। তাহার তিন ঘণ্টা পরেই আমার ২২ বৎসরের পুত্র ফণিগোপাল মুঙ্গেরে লালদরজার ঘাটে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হয়। আমার বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া যেন আমার নলিনীর সূক্ষ্মাত্মা আসিয়া আমায় সতর্ক করিল কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিনাই। তাহার মৃত্যুর পর এই বিষয় বুঝিতে পারিলাম।

আমার পুত্র ফণিগোপাল মুঙ্গেরে যে গঙ্গায় জলমগ্ন হয় অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার দেহ আমরা সেখানে দেখিতে পাইলাম না; আমার মনের ভিতর নিরন্তরই চিন্তা হইত যে, বাছার দেহ কোথায় গেল, কি হইল।

প্রতিনিয়তই সেই চিন্তা করিতাম। কখনও ভাবিতাম যে, হয়ত কোথাও গিয়া উঠিয়াছে কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য— আমার অদৃষ্টে সে আশা বিড়ম্বনা। গত পৌষ মাসে আমি শেষ রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছি, এমন সময় আমার ফণির মৃত্যুর পর যে অবস্থা হইয়াছিল তাহার একটি বাস্তব ছবি আনিয়া কে যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিল। আমার পুত্র ফণির শরীরটি যেন অতি শীর্ণ, পেটের দিকটার স্থানে স্থানে যেন কোন জন্তু খাইয়াছে; কিন্তু সে গুলির ক্ষত নাই, ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে ও দুটী হাত কাটা। * আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবা তোমার হাত কিরূপে কাটিল?" সে বলিল— যে জাহাজের চাকায় হাত কাটিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই সে আমার চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল। সে জলমগ্ন হইবার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গার সেই স্থান দিয়া একখানা ষ্টিমার চলিয়া যায়, তাহার পর আমি এপর্য্যন্ত তাহাকে যতবার স্বপ্নে দেখি— ততবারই গঙ্গার তীর, কি গঙ্গার উপর, কি গঙ্গার সন্নিকটে যেন রহিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার দেহের কি অবস্থা হইয়াছে জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হওয়ায় কে যেন স্বপ্নে তাহার সেই অবস্থাটা আসিয়া দেখাইল।

এইরূপ সময়ে সময়ে অনেক সত্য স্বপ্ন দেখিয়া আমি ঠিক জানিয়াছি যে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মাত্মা আসিয়া মধ্যে মধ্যে আত্মীয় দিগকে দর্শন দেয়। এ কথা অমূলক নহে। এ বিষয়ে বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনীতি-কবিতা রচয়িত্রী।

প্রবাহ। †

মাতৃহীনা পতিহীনা সরলার অশ্রু-প্রবাহ। ইহার সমালোচনা কি জানি না। সরলা এই অশ্রু-প্রবাহ মায়ের নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন; বলিতেছেন ঃ—

অনাবৃত হিমময় হৃদয় আমার,
চারিদিকে কঠিন তুষার।
তোমার প্রখর তেজে, গলিয়া গিয়াছে সে যে,
নাহি আর কঠিন তুষার,

---

* এ স্থলে লক্ষ্য করিবেন যে, স্থূল দেহের হস্ত ষ্টিমারে কাটিয়া যাওয়ায় সূক্ষ্ম দেহ ও হস্তহীন অবস্থায় দেখা দিয়াছিল। শ্রীশ ঃ—

† শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত।

আজি সে পাষাণ গেহে, যে প্রবাহ যায় বহে,
শুন কলধ্বনি-স্তুতি তার! (১ পৃষ্ঠা)

মাতৃস্নেহের জ্বলন্ত স্মৃতি, আজি বিধবার পাষাণ হৃদয়ে, প্রবাহ তুলিয়াছে। বিধবা মনে করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় পাষাণে-শ্মশান, কিন্তু মাতৃস্নেহের স্মৃতিতে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইল, উৎস উঠিল, প্রবাহ ছুটিল, কলধ্বনিতে মাতৃস্তুতি গীত হইতেছে :—

যে তোমার কথা বলে, মা,
ফেলে দুটি ফোঁটা আঁখিজল,
ইচ্ছা হয় ধরি মাথায় আমার
তাহার দু'খানি পদতল। (৩ পৃষ্ঠা)

'সন্ধ্যাবেলা'— তারা ফোটে শত লক্ষ কোটি—
প্রশান্ত স্নেহেতে ভরা
সুকৃষ্ণ সে দুটি তারা
কোথা মা তোমার আঁখি দুটি। (৭ পৃষ্ঠা)

এ পার ও পার—ইহলোক পরলোক।

নদীতে ভাসাই যাহা, মনে করি পাব তাহা,
ও পারের দেশে।
জননী গো জান তুমি, আছে কি গিয়াছে সব
নদীস্রোতে ভেসে। (১১ পৃষ্ঠা)

জননী সরস্বতী লেখিকার লেখনী-মুখে বসিয়া উত্তর দিতেছেন :—

এ জগত ত্যজি, গেছে নূতন জগতে, যত
তোমাদের আপনার জন
একদিন কতদিনে আবার তাদের সনে,
সেথা গিয়া হইবে মিলন।
যতনে গঠন কর আপনারে আজি হ'তে
মিলনের সেদিন ভাবিয়ে,
সেদিন তাদের সনে যেন গো মিলিতে পার
ধরা হ'তে সুন্দর হইয়ে। (১৫ পৃষ্ঠা)

এই অশ্রু-প্রবাহে হৃদয়ের সমস্ত মলামাটী বিধৌত হইয়াছে; আছে কেবল অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা। স্মৃতিতে আশাতে মাখামাখি হইয়া সরলার মনপ্রাণ সুন্দর করিয়াছে। পোড়া মানুষ তবু কি আশঙ্কার হাত এড়াইতে পারে? পারে না। 'প্রবাহে' বিস্তর আশঙ্কার কথা আছে। এই আশঙ্কা হইতে বিধাতার উপর আক্রোশ ও আব্‌দার ঃ—

হে বিধাতা বিশ্বস্রষ্টা শুনি তুমি দয়াময়,
সুধাই তোমায়
সর্ব্বস্ব যে ছিল মোর, তাহারে কাড়িয়া নিলে
একি কিছু নয়? (১৮১ পৃষ্ঠা)

বলে, "ছিল না কথা, দিয়েছে গা'ল, আজি না হয় হবে কা'ল।" যে বিধাতার উপর আক্রোশ করিতে পারিল, সে তাঁহার চরণের ছায়া পাইবেই। তাই,—

দেবতার মন্দির আমার!
কতদিন পরে ভুলি' দুয়ার গিয়াছে খুলি'
অভাগায় এত কৃপা কার? (২০৮ পৃষ্ঠা)

তাহার পর ভাব-সম্মিলনের পর সমর্পণ!—

হৃদয় সহিত সম্পদ মোর,
তুমি লও তার ভার,
দাতা ভিখারীর ভিক্ষার ধন
কোথায় রাখিব আর? (২৫০ পৃষ্ঠা)

সকল প্রবাহেরই পরিণাম অনন্তে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

[জাহ্নবী, ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

রাঙামেয়ে।

(আমি বিশ্বধাত্রী জগজ্জননীকে "রাঙামেয়ে" বলিয়া এই কবিতাটিতে সম্বোধন করিয়াছি। ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদে আমার কবিতা জয়যুক্ত ও আমার সাধনা সিদ্ধ হউক।)

(১)

রাঙামেয়ে, রাঙামেয়ে, রাঙামেয়ে মোর,
কাড়িয়া লয়েছ বাছা নয়নের ঘুম!
বদনে মা নাই তোর সুষমার ওর!
চরণে কি বাজে ওই! রুণু রুণু রুম্!

(২)

রাগ হয়--অতি ঘন যামিনীর ঘোর
ধরামুখে লেগে আছে; অন্ধকার সবি!
রাঙামেয়ে, রাঙামেয়ে, রাঙামেয়ে মোর,
তুই সুধু জ্বল্-জ্বল্ একখানি ছবি!

(৩)

ঝিনুকের দাগে দাগে, অরুণের রাগে,
রাঙামেয়ে ওই তোর রাঙামুখ জাগে!
তরমুজ কাটিয়া দেখি তাহারো ভিতর
লালে-লাল রাঙামেয়ে হাসিছে সুন্দর!

(৪)

একি কাণ্ড! এ ব্রহ্মাণ্ড মুখপানে চেয়ে
অবাক্ আপনা-হারা ওলো রাঙামেয়ে,
অণুরূপে বিভুরূপে, হে অনন্ত অপরূপে,
বিশ্বরূপে বিশ্বধাত্রী আছ তুমি ছেয়ে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

স্বপ্ন।

(৬)

সত্য স্বপ্ন এত অধিক ব্যক্তি দেখিয়া থাকেন যে, তাহার তালিকা করিতে গেলে বোধ হয় উহা কখনই শেষ হইবে না। কিন্তু উহার সংখ্যা এবং উহা কি প্রকারের, তাহাই বিবেচনা করা অধিকতর আবশ্যক। আমি পূর্ব্বেই

বলিয়াছি যে, এই শ্রেণীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অনুশীলন করিলে জীবাত্মার স্বরূপ অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়। তন্নিমিত্তই এ বিষয়টী এত গুরুতর। *

আমি সূচনায় স্বপ্নকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম; দেহজ ও মনোজ। অজীর্ণতা ইত্যাদি শারীরিক কারণে যে সকল স্বপ্ন দেখা যায় তাহাকে দেহজ বলিয়াছি। আর যে সকল স্বপ্ন মনের কার্য্য, তাহাকে মনোজ নামে অভিহিত করিয়াছি। মনোজ স্বপ্ন দ্বিবিধ। (১) মনের অনুভূত পদার্থ অথবা চিন্তিত বিষয়ের অনুরূপ স্বপ্ন। (২) মনের অনুভূত পদার্থ এবং অচিন্তিত বিষয়ের অনুরূপ স্বপ্ন। স্বপ্ন-দর্শক যাহা কখন অনুভব করেন নাই, যে বিষয় কখন চিন্তাও করেন নাই; যাহা অতীত অথচ অজ্ঞাত ঘটনা, যাহা ভবিষ্যৎ ঘটনা সুতরাং জানা সম্ভবই নহে;—তাহা স্বপ্নে দৃষ্ট হইল, এবং সেই স্বপ্ন সত্য হইল। ইহার কারণ কি? ইহার অর্থ কি? এই প্রকার স্বপ্নই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। †

উপরে যাহা বলা হইল তদনুসারে স্বপ্নকে এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে।
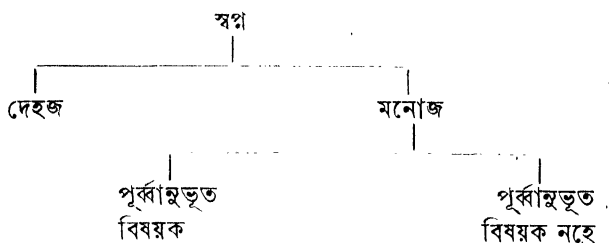
এই চিত্রে যাহাকে "পূর্ব্বানুভূত বিষয়ক নহে" বলিলাম সে প্রকার স্বপ্ন সত্য হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, ঐরূপ স্বপ্নের সার-সংগ্রহ করতঃ দেখিতে হয় যে, উহাদিগের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ কিছু আছে কিনা? ঐ শ্রেণীর সকল স্বপ্নের প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে, এরূপ বিষয় আবিষ্কৃত হইলে তাহারই কারণ কল্পনা করা আবশ্যক। এই কল্পিত কারণ, যত অধিক সংখ্যক স্বপ্ন-বৃত্তান্তের সহিত সামঞ্জস্য হইবে, ইহার সাহায্যে যত অধিক সংখ্যক বৃত্তান্ত বুঝা যাইবে ততই এই কল্পিত কারণ দূরীভূত হইয়া সিদ্ধান্তে পরিণত হইবে। তখন ইহাকে প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে স্মরণ করিতে হইবে যে, হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রানুসারে মন একটী ইন্দ্রিয়

---

* জাহ্নবী বৈশাখ ১৩১৩ পৃঃ ২৩। † জাহ্নবী ১৩১৩ পৃঃ ২৩—২৪।

মাত্র। যেমন চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়, তেমনই মন একটী অন্তর-ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বার; মন যখন ইন্দ্রিয়, তখন অননুভূত বিষয় মন দ্বারা কখনই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না। যাহা কোন-না-কোন রূপে মনে প্রতিফলিত হয় নাই, মন তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং যে শ্রেণীর স্বপ্ন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ক নহে, মনে তাহার কর্তৃত্ব আরোপ করা যায় না। এই নিমিত্তই অন্যকে কারণত্ব আরোপ করিতে হয়। সেই "অন্য" কি? উহা কি প্রকার? উহার স্বরূপ কি? উহা কি প্রণালীতে কার্য্য নিষ্পন্ন করে? এই সকল বিষয় আমাদিগের বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। উহা নিশ্চয়ই দেহাতীত পদার্থ; কারণ স্বপ্ন-দর্শক মুহূর্ত্তমধ্যে দূর দেশের সত্য ঘটনা, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সত্য ঘটনা, স্বপ্নে দেখিয়া থাকেন। এ নিমিত্তই ঐ কারণ দেহাতীত পদার্থ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেহের অবস্থা বিশেষে নিদ্রা এবং নিদ্রার অবস্থা বিশেষে স্বপ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ কারণ দেহাতীত হইলেও দেহের সহিত সম্বন্ধশূন্য নহে। এমন পদার্থ কি আছে, যাহা দেহাতীত অথচ দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত? এই স্থলেই আত্মার কল্পনা অপরিহার্য্য। এইভাবে বিবেচনা করিলে স্বপ্নকে তিন ভাগে বিভাগ করিতে হয়। (১) দেহজ, (২) মনোজ, (৩) আত্মানুভূত। উপরের চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, যাহাকে "পূর্ব্বানুভূত বিষয়ক নহে" বলিয়াছি, এক্ষণে তাহাকেই আত্মানুভূত বলিলাম।

এতদিন যে সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছি, নিম্নে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। কেবল একটী মাত্র অপ্রকাশিত স্বপ্ন ঐ সংগ্রহে লিখিত হইল। অন্য যে সকল স্বপ্ন আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহাও প্রায় ঐ প্রকারেরই; সুতরাং তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। নিম্নের সংগ্রহ পাঠ করিতে এই কয়েকটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১) স্বপ্ন-দর্শক নিদ্রিত অবস্থাতেও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

(২) স্বপ্ন-দর্শক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্বয়ং স্বপ্নে অন্যত্র গিয়া অবগত হইলেন? কি অন্যে আসিয়া তাঁহাকে জানাইল।

(৩) অন্যে জানাইয়া থাকিলে, তিনি তৎকালে জীবিত ছিলেন, কি মৃত হইয়াছিলেন? তিনি দর্শকের আত্মীয় কি নিঃসম্পর্কীয়? তাঁহার সহিত স্বপ্ন-দর্শকের কিরূপ ভাব?

(৪) স্বপ্ন-দৃষ্ট বৃত্তান্ত অতীত কি ভবিষ্যৎ? অতীত হইলে বহু পূর্ব্বের কি অল্প পূর্ব্বের ঘটনা? ভবিষ্যৎ হইলে, বহু পরে কি অল্প পরে ঘটিয়াছিল?

(৫) স্বপ্ন-দর্শনের সময়।

(৬) ঐ সময়ে দর্শকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।

(৭) কোন বস্তু স্বপ্নে পাওয়া গিয়াছিল কিনা?

এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নের সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি করিলে আত্মার কর্তৃত্ব ও স্বরূপ যেরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিব।

সারসংগ্রহ।

প্রথম স্বপ্ন। মৃত পিতা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দর্শকের নিকট আসেন। দর্শক পুরুষ, শেষ রাত্রির স্বপ্ন।

দ্বিতীয় স্বপ্ন। দর্শক স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী। স্বপ্নাবস্থায় নিজে যাইয়া দেখেন। ইহা ঘটনার কিছু পরে দেখা।

তৃতীয় স্বপ্ন। শেষ রাত্রে দৃষ্ট হয়। পিতা অব্যবহিত পূর্ব্বে মরেন। তিনি আসিয়া স্বপ্নে দেখেন। দর্শক পুরুষ।

চতুর্থ স্বপ্ন। পৌত্র জন্মিবার স্বপ্ন নিজেই দেখেন অর্থাৎ কেহ আসিয়া স্বপ্ন দেখায় নাই। স্বপ্নের প্রায় এক মাস পরে পৌত্র জন্মে। দর্শক পুরুষ।

পঞ্চম স্বপ্ন। পৌত্রী আসিয়া স্বপ্ন দেখায়। সে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। পৌত্রী অব্যবহিত পূর্ব্বে মরিয়াছিল। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ।

ষষ্ঠ স্বপ্ন। মৃত পিতা আসিয়া স্বপ্ন দেখান। পিতা বহুদিন মরিয়াছিলেন। স্বপ্ন দর্শনের ১০।১১ মাস পরে কুমার ভূমিষ্ঠ হয়। দর্শক নারী।

সপ্তম স্বপ্ন। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। কন্যার স্বগ্রামবাসী একজন জীবিত ব্যক্তি আসিরা স্বপ্ন দেখায়। তাহার সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দর্শক পুরুষ।

অষ্টম স্বপ্ন। পরলোকগত পিতা আসিয়া স্বপ্ন দেখান। শেষ রাত্রে দেখা। স্বপ্ন-দর্শনের কয়েক মাস পরে পুত্র জন্মে। দর্শক নারী।

নবম স্বপ্ন। মৃত ব্যক্তি আসিয়া স্বপ্ন দেখান। অল্পদিন হইল মরিয়াছিলেন।

---

* জাহ্নবীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় যথাক্রমে যেরূপ ভাবে স্বপ্ন সকল প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি শব্দ সেইরূপ ভাবে বুঝিতে হইবে। লেখক।

আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্বপ্ন দর্শনের অল্প দিন পরে পুত্র জন্মে। দর্শক নারী।

দশম স্বপ্ন। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। অপরিচিত জীবিত ব্যক্তি আসিয়া স্বপ্ন দেখান। কিন্তু স্বপ্ন-দর্শক দূরস্থ মস্‌জিদ্ গোরস্থান ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন। দর্শক পুরুষ।

একাদশ স্বপ্ন। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। দর্শক কাতরা ছিলেন। স্বপ্নে ঔষধের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন। অন্যে বলিয়াছিল। সে অপরিচিত। দর্শক পুরুষ।

দ্বাদশ স্বপ্ন। শেষ রাত্রে দেখেন। অন্যত্র গিয়া স্বয়ং দেখেন; কেহ দেখায় নাই। দর্শক পুরুষ।

ত্রয়োদশ স্বপ্ন। দর্শক নারী। শেষ রাত্রে দেখেন। যেন বিস্তৃত আলোক কেন্দ্রীভূত হইয়া মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। ঐ মূর্ত্তি ঔষধ দিল। পীড়িতা দর্শক ঔষধ পাইলেন।

চতুর্দ্দশ স্বপ্ন। মাতুলানীকে বিধবা দেখেন। মাতুলকে মৃত দেখেন না। স্বয়ং অন্যত্র গিয়া দেখেন। পূর্ব্বে জানিতেন না। দর্শক পুরুষ।

পঞ্চদশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ। শেষ রাত্রে দেখেন। স্বয়ং গিয়া দেখেন। দর্শকের মন উদ্বিগ্ন ছিল।

ষোড়শ স্বপ্ন। পিতা অনেক দিন মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া স্বপ্ন দেখান। স্বপ্ন দেখার ১৫।১৬ দিন পরে ঘটনা ঘটিয়াছিল। দর্শক পুরুষ।

সপ্তদশ স্বপ্ন। পুত্র জীবিত। তিনিই প্রকৃত স্থানের স্বপ্ন দেখান। দর্শক উদ্বিগ্না ছিলেন। তিনি নারী।

অষ্টাদশ স্বপ্ন। নিজালয়ে স্বপ্ন দেখেন। দর্শক উদ্বিগ্না ছিলেন। দর্শনের পরদিবস নিজালয়েই ঘটনা ঘটে। দর্শক নারী।

উনবিংশ স্বপ্ন। রাত্রে দেখেন। পরদিন ঘটে। নিজবাড়ীতে দেখেন; সেখানেই ঘটে। দর্শক মনে মনে অসুখী ছিলেন। দর্শক নারী।

বিংশ স্বপ্ন। ডাক্তার যোগেশচন্দ্র রামপুর বোয়ালিয়াতে চিকিৎসা করেন। তাঁহার একটী মূল্যবান ঘড়ী ছিল, তাহা সময় সময় চলিত না একবার মেরামত করিয়া লইবার পরই বন্ধ হইল। তিনি দুঃখিত হইলেন। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে ঘড়ীটী চলিতেছে। পরদিন প্রাতে জাগ্রত হইবার পর দেখিলেন যে সত্যই ঘড়ীটী চলিতেছে।

শ্রীশশধর রায়।

জ্ঞানদাস বনাম চণ্ডীদাস।

বিগত আশ্বিন মাসের "জাহ্নবী" পত্রিকায় আমি একটী পদ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের কৃত এবং অপ্রকাশিত বলিয়া লিখিয়াছিলাম। তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, পদটী জ্ঞানদাসেরও নয়, এবং উহা অপ্রকাশিতও নয়। পদটী চণ্ডীদাসের রচিত এবং "বহুদিন হইল মুদ্রাযন্ত্রের লৌহ-কারাগার ভেদ করিয়া লোকলোচনের অন্তর্গত হইয়াছে।"

প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় অপরাধের গুরুভার প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, কি হতভাগ্য লেখকের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ পরিস্ফুট নহে। তথাপি লেখকের পক্ষ হইতে মোটামুটি রকমের একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক। পাছে পাঠকগণ মনে করেন যে, ধৃষ্ট লেখক কোন 'লুপ্তরত্নের' উদ্ধার করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদের দুরারোহ সিংহাসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে + + + অনেক স্থানেই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো দেখিতে পাওয়া যায়। + + + এই সকল কারণে উক্ত গ্রন্থনিচয়ের (গীতকল্পতরু, পদকল্পতরু প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ পুস্তকের) একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা থাকা অসম্ভব নহে। তবে আধুনিক অনেক বিখ্যাত সংগ্রহকারগণের গ্রন্থের ঐরূপ 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর' অভাব দেখিতে পাই না। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়ের "চণ্ডীদাস-চরিত" গ্রন্থের সহিত দুর্ভাগ্যক্রমে লেখকের পরিচয় নাই। সুতরাং স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে দুই একটী পদ উদাহরণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।"

একটী বহু-প্রসিদ্ধ পদ। আমরা বাল্যকাল হইতে পদটীকে চণ্ডীদাসের বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। মল্লিক মহাশয় পদটীকে জ্ঞানদাসের পদসংগ্রহে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পাদটীকায় স্বীকার করিয়াছেন "পদটী চণ্ডীদাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে।"

"না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥"

এ পদটী বহু সংগ্রহ গ্রন্থেই চণ্ডীদাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু মল্লিক মহাশয় ইহাকে জ্ঞানদাসের পদ-সংগ্রহে স্থান দিয়াছেন।

"শুন শুন সুজন কানাই তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান
গোরস মানি সে
বেশর দান নাহি শুনি।"

পদটী জ্ঞানদাসের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বহুদিন হইতে পদটী গোবিন্দদাসের বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি।

'দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাঙ পাছে,
এ পথে কণ্টক আছে,
তবে ঘরের না হইতাঙ বাহির।'

মল্লিক মহাশয় জ্ঞানদাসের বলিয়া তাঁহার সংগ্রহ-গ্রন্থে পদটীকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থান্তরে পদটী শ্যামানন্দের ভণিতিযুক্ত আছে।

এমন অনেকই আছে; এবং সংগ্রহ-পুস্তকে এ প্রকার ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। পাঠক দেখিবেন "প্রাচীন হস্তলিখিত" পুঁথি বলিয়াই গীত-কল্পতরু, পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়া থাকিলে অনেক 'আধুনিক বিখ্যাত সংগ্রহকর্ত্তা'ও তুল্যরূপে 'পুনঃ সংস্কার মহর্তি।'

গীতকল্পতরু, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলি যখন সংগৃহীত হইয়াছিল, তখন বঙ্গদেশে কোন গ্রন্থেরই 'মুদ্রাযন্ত্রের লৌহকারাগার' বাসের আশঙ্কা ছিল না। তখন গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হস্তলিখিত পুঁথিতেই নিবদ্ধ থাকিত। গীতি-কবিতাগুলি গায়কগণের কণ্ঠে কণ্ঠে দেশবিদেশে নীত হইত। তাৎকালিক সংগ্রহ-পুস্তকগুলি এই সকল হস্তলিখিত পুঁথি ও গায়কগণের সাহায্যে প্রস্তুত হইত। সংগ্রহের শুদ্ধাশুদ্ধ এই সকল হস্তলিখিত পুঁথির বিশুদ্ধতা ও গায়কগণের স্মৃতির উপর নির্ভর করিত।

একথা ঠিক যে বাঙ্গালার প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ পাঠের বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রাচীন পুস্তকাদিতে

যত বিভিন্ন প্রকারের পাঠ দৃষ্ট হয়, ভারতে আর কুত্রাপি তেমন দেখা যায় না। এ অবস্থায় আধুনিক সংগ্রহকারগণকে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হয় এবং বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনও পদ কোন কবি বিশেষের বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধির জন্য আধুনিক অপেক্ষা কবির সমসাময়িক বা অনতিকাল পরবর্ত্তী সংগ্রহের উপর অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে; এবং সে হিসাবে আধুনিক বিখ্যাত সংগ্রহকারগণের সংগ্রহ অপেক্ষা গীতকল্পতরু, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন পদসংগ্রহের মূল্য অনেক অধিক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বাঙ্গালার প্রাচীন গীতি-কবিতাগুলি সাধারণতঃ গায়কগণের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া দেশ-দেশান্তরে নীত হইত। একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, স্থানবিশেষে এখনও সেই নিয়মই প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থানে গুরুপরম্পরায় বা বংশপরম্পরায় গীতগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। আধুনিক অনেক সংগ্রহকার ইহাদেরই নিকট হইতে অনেক প্রাচীন লুপ্ত পদ সংগ্রহ করিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত এই উপায়ে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবির অনেক অপ্রকাশিত পদ নানাস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে।

যে সকল স্থানে গুরুপরম্পরায় বা বংশপরম্পরায় কোন কবির কোন পদ চলিয়া আসিতেছে, আমার মতে ঐ সকল পদের পাঠ্য বিশুদ্ধির জন্য বর্ত্তমানে প্রচলিত অনেক মুদ্রিত সংগ্রহ পুস্তক অপেক্ষা ইহাদের উপর নির্ভর করা অনেকাংশে নিরাপদ। কারণ যাহারা গুরুপরম্পরায় বা বংশপরম্পরায় গীতগুলিকে আপনাদের নিজস্ব বলিয়া মনে করে তাহারা প্রতি গীতের প্রত্যেক অক্ষরটী মন্ত্রাক্ষরের ন্যায় পবিত্র ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহা সযত্নে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখে। সুতরাং ইহাদের হস্তে পাঠ-ব্যত্যয়ের সম্ভাবনা অতীব বিরল।

এই উপলক্ষে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যিনি প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণের পদগুলি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন প্রায় সকল কবিই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাবটুকু আত্মসাৎ করা বিশেষ দোষের বলিয়া মনে করেন নাই। কেবল বৈষ্ণবকবি কেন, সমুদায় প্রাচীন বাঙ্গালা

কবিগণের প্রতিই এ কথা তুল্যরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী কবি-গণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া অগ্রসর হয়েন নাই। "একটী উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কোন কবিকে প্রশংসা করার পথ নাই। কোন্ কবি সেই ভাবের আদি প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। * * * যেখানে একটী সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপরেই তাহা উপর্য্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তন্তসার হইয়াছে। এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মূল সূত্র। নূতন পথে লেখনী প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ বোধ হয় এ কথা স্বীকার করিতেন না। তাই তাঁহারা কল্পনার পুষ্পকরথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন হাঁড়ি কি ডোনাজুলিয়া সংগ্রহ করিয়া বেড়ান নাই।" এ হিসাবে ধরিতে গেলে চণ্ডীদাস সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-দাসের আদর্শ এবং "জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গা।" [১]

কেবল জ্ঞানদাসের পদই চণ্ডীদাসের আদর্শে বাঁধা বলিলে জ্ঞানদাসের প্রতি অবিচার করা হয়। যদিও "তিনি (চণ্ডীদাস) তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়", [২] তথাপি আমরা নিম্নে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এক একটী পদাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন উভয়ে কত সাদৃশ্য।

"এখন কোকিল আসিয়া করুক গান
ভ্রমর আসিয়া ধরুক তান,
মলয় পবন বহুক মন্দ
গগনে উদয় হউক চন্দ।"——চণ্ডীদাস।

"সোহি কোকিল অবলাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥"——বিদ্যাপতি।

পাঠক বলিতে পারেন কে আসল, কে নকল? এইবার জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের এক একটী তুলিয়া দেখাই।

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।
২। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
এখন আমার লয় অন্য জনা
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
যে দিন দেখিব আপন নয়নে
আপন জন সঙ্গে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা।
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমন হউক সে।
জ্ঞানদাস কহে শুন হে সুন্দরী
মনে না ভাবিহ আন।
তুঁহু সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমারি প্রাণ॥

—মল্লিক মহাশয়ের জ্ঞানদাস, ১৮৬ পৃঃ।

সই! কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার দুয়ার দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমত করিছে
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরিতি
আর জানি কার হয়?

—মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাস, ১৪৪ পৃঃ।

পুনশ্চ—

দেখিব যে দিনে আপন নয়নে
কহিতে তা সঙ্গে কথা।
বেশ দূর করিব কেশ ঘুচাইব
ভাঙ্গিব আপন মাথা।
* * * * *
সে হেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
এমতি করিল কে।
হৃদি সীদতি আমার যেমতি
তেমতি পুড়ুক সে॥

—মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাস, ১৪৫ পৃঃ।

পাঠক কি আরও বলিবেন জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের নকল করে নাই? জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবি তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। উভয় কবির লেখাই তুলিয়া দেখাইলাম—এ Parallel passage নহে। তবে কি বলিব? এই জন্যই একজন সমালোচক বলিয়াছেন "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রতিভায় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি তারকামণ্ডলী উজ্জ্বলিত।" ১

ভাষার হিসাবে ধরিতে গেলেও দেখা যায় প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পাঠে ভুল নাই। ভুল করিয়াছেন আধুনিক বিখ্যাত সংগ্রহকার। পূর্ব্বে যে "দানী দেখি কাঁপিছে শরীর" প্রভৃতি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে 'জানিতাঙ', 'হইতাঙ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ জ্ঞানদাসের অন্য কোন পদে দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং প্রাচীন সংগ্রহকারগণ পদটীকে শ্যামানন্দের রচিত বলিয়া উল্লেখ করা সত্ত্বেও আধুনিক সংগহকার কোন্ প্রমাণের বলে তাহাকে জ্ঞানদাসের সংগ্রহে স্থানদান করিয়াছেন পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীজগদীশ্বর রায়।

ভাবান্তর।

হা ধরণি! কোথা তোর সে সুষমারাশি,
ছায়ালোকে স্নিগ্ধ-দীপ্ত-নিখিলরঞ্জন?
কোথা শ্যাম-লাবণ্যের ঢল-ঢল হাসি
বর্ণ-রাগ গীত-গন্ধ চিত্ত-সম্মোহন?

১। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

আজি মনে হয়, হায়! তোর মাতৃকোল
তপ্ত-ভস্মে সমাকীর্ণ অতীতের চিতা।
সদ্যঃপাতী এ সুষমা—জীবন-হিল্লোল
শুধু নিমেষের স্বপ্ন। হে চির-ব্যথিতা!
তুমি গড়িতেছ নিজ সরবস্ব দিয়া
কামনার স্বর্ণ-স্বর্গ দিব্য-অপরূপ!
অলক্ষ্যে সংহার-দণ্ড হানিয়া হানিয়া
মৃত্যু রচিতেছে তাহে মহা ভস্ম-স্তূপ।
তাই তোর বক্ষে বহে অকূল পাগল
অনন্ত নীলাম্বু-নিধি—মাতৃ-অশ্রুজল।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মৃত্যু-বধূ।

ক্যাণ্টনের দশ ক্রোশ দক্ষিণে সুদূর সুণ্টকে দুই যমজ ভগ্নী বাস করিত, লী ও লাই। তাহারা অনাথা। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় মিশন-স্কুলে পড়িয়া তাহাদের শিক্ষালাভ হয়। এখানে তাহারা চিকনের কাজ ও অল্প-স্বল্প হিসাব রাখিতেও শিখিয়াছিল। তাহারা মান্দারীণের পোষাক এবং বাই-ওয়ালীর চিকনের কাপড়ের কাজ করিত। হিসাবে হাত ছিল বলিয়া তাহারা স্থানীয় কৃষক ও ব্যাপারীদের বিস্তর কাজে আসিত। এইরূপে পরিশ্রম ও হিসাব করিয়া চলিয়া তাহারা কিছু সংস্থান করিয়াছিল, এবং তাহাতে কিছু জমী কিনিয়া বিলি করিয়াছিল। এই আয় ও তাহাদের শ্রমজাত লভ্যের দ্বারা তাহারা এক প্রকার স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। প্রতি-বেশীরা সকলেই তাহাদের শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত। তাহারা পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। তাহাদের অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—উভয়ের কেহ কখনও কাহারও কাছছাড়া হইবে না; কখনও বিবাহ করিবে না।

লাই সুন্দরী ছিল। পূর্ণিমার চন্দ্রের মত তাহার ঢলঢলে মুখখানি। সে অনেক পুরুষের কামনার ধন ছিল। লী ও লাইএর এক বড় ভাই ছিল,—সে অতি অর্থপিশাচ। সে দেখিল, লাইএর পাণিগ্রহণ করিতে অনেকেই খুব বেশী পণ দিতে প্রস্তত। লাই যদি বিবাহ করে, তবে পণের সমস্ত অর্থই

তাহার হস্তগত হয়; অধিকন্তু লাইএর বিবাহ হইয়া গেলে সে তাহার অংশের জমী-জমাও হস্তগত করিতে পারে। সুতরাং সে স্থির করিল, লাইএর বিবাহ দিতেই হইবে, এবং যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ দিবে, লাই তাহারই হইবে। লাই ও লী অনেক কাঁদিল; বিস্তর প্রতিবাদ করিল; কিন্তু কে তাহাদের কথায় কাণ দেয়। সো নামে এক ক্ষৌরকার বিস্তর অর্থ জমাইয়াছিল। সে মহাজনী করিত। তাহারই অদৃষ্ট ফিরিল। অনাথিনী লাই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগত্যা সোএর অঙ্কলক্ষ্মী হইতে চলিল।

কিন্তু দুই ভগ্নী যখন দেখিল, তাহাদের চিরজীবনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিতে চলিল, তখন তাহারা এক সর্ব্বনেশে মতলব আঁটিল। লাই কখনই সোএর পত্নীরূপে বৃত হইবে না। ইহার অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, এই সঙ্কল্প স্থির হইল। অসমসাহসী লী বিষ সংগ্রহ করিল। অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাহার আন্দাজ মত যথেষ্টপরিমাণে, সে লাইকেও দিল।

আজ বিবাহের দিন। বরযাত্রীর দল কন্যার দ্বারে সমাগত; নহবতের সুরে চতুর্দ্দিক মুখরিত। অভ্যাগতদের লইয়া পাল্কীর সারি ও বিচিত্র সুবর্ণ-খচিত মহাপায়া চলিল, এবং এই মহাপায়ার মধ্যে আসীনা বেপমানা লাই। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তাহার ভয়ের কারণ দুইটি, প্রথম মৃত্যুর, দ্বিতীয়,—পাছে তাহার সত্যভঙ্গ হয়। কেহ না দেখিতে পায়, এ জন্য শিবিকার পরদা টানা ছিল। তারপর যখন সেই 'মিছিল' চলিতে আরম্ভ করিল, লাই তখন তাহার জ্যাকেটের ঢিলে আস্তিনের মধ্য হইতে ছোট একটি শিশি টানিয়া বাহির করিল। যে বিস্মৃতির শান্তি সে অন্বেষণ করিতেছিল, এই শিশির মধ্যে তাহাই ছিল। নিমেষের জন্য লাই একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। তারপর তাহার সুখময় জীবন ও প্রেমময়ী সহোদরার কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, এবং সেই সাংঘাতিক হলাহল পান করিয়া ফেলিল। কিন্তু এ কি! হলাহলের পরিমাণ যে কম হইয়াছে! গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া সো যখন শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিল, লাই তখনও জীবিত বটে, কিন্তু তাহার সেই বাসর-সজ্জার আবরণের অন্তরালে দারুণ পাণ্ডুরবরণা। সে তাহার সদ্যঃ-পরিণীত স্বামীকে কিছুই বলিল না; স্থির-প্রতিজ্ঞ হৃদয়ে সে কোনও গতিকে অন্দরে প্রবেশ করিল। সেই অন্তঃপুরে তাহাকে এখনও কয়েক ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইবে। বসিয়াই সে রহিল। সেই নববধূর চেলাঞ্চলের অবগুণ্ঠনের মধ্যে সে নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া

রহিল। এ দিকে তাহার ও তাহার স্বামীর মহিলা-পৌরজনেরা তাহার ভাবী কর্ত্তব্যের বিষয়ে সুপরামর্শধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর বটে, কিন্তু মর্ম্মভেদী নয়। সানাই আবার সজোরে বাজিয়া উঠিল; ঢাকের আওয়াজে কান পাতা দায় হইল; পুরুষ-অভ্যাগতদের উল্লাস ক্রমে প্রচণ্ড ভীমরবে পরিণত হইল।

কেবল অভাগিনী লাই সেই অন্তঃপুরে একাকিনী বসিয়া নিরাশার উৎকট পীড়ন সহ্য করিতেছিল। জীবন এখনও দেহ-মুক্ত হইতেছে না। তার পর কোনও উপায়ে তার নিত্য-সহচরী লীর নিকট লাই এক পত্র-প্রেরণে সমর্থ হইল। লীও কালবিলম্ব করিল না; সেই অমোঘ বিষের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিয়া তাহার সহোদরার নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

এ দিকে এই আনন্দোৎসবের মধ্যে মিশ্রিতকণ্ঠের একটা ব্যাকুল কাতর অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

রমণীগণের কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চতর ও তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। গৃহিণীগণ তারস্বরে অনুযোগ করিতে করিতে দ্বার খুলিয়া নববধূর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তারপর অভ্যাগতেরা যে গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন, অভাগিনী মৃতকল্পা লাই—কোনও মতে সেই গৃহে নিজেকে টানিয়া লইয়া গেল, এবং একটি চৌকাঠে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,—তাহার কণ্ঠস্বরে আনন্দ ও যন্ত্রণা পরস্পরকে ছাপাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল— "সো, তুমি আমাকে ক্রয় করিয়াছ, আমি তোমার নিকট বিক্রীত হইয়াছি; আর দাদা! আমায় বিক্রয় করিয়াছ তুমি। কিন্তু দাদা! তুমি আমার দেহই বিক্রয় করিয়াছ, আমার মন-প্রাণ বিক্রয় করিতে পার নাই। আর সো সো তুমিও আমার আত্মা ক্রয় করিতে পার নাই। তুমি আমার দেহই ক্রয় করিয়াছ; এই তোমার সেই দেহ—কিন্তু এ আত্মা-বধূ এই দেখ—বিদায় লইতেছে—"

লাই আর বলিতে পারিল না; তাহার সুকুমার তনুলতা ঢলিয়া পড়িল। এবার সেই অমোঘ হলাহল অব্যর্থ শর-সন্ধান করিয়াছিল। *

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

---

* অনূদিত।

সৌম্য। ❋

হে মোহন! তোর ওই ঢল ঢল নয়ন-উৎপল,
বদনমণ্ডল মরি ঢল ঢল লাবণ্যে মাখানো,
কোমল-কুঞ্চিত কেশ, রঙ্গে যেন তরঙ্গে খেলানো,
সুন্দর সরল হাসি, আঁখিতারা সতত উজ্জ্বল,
আমার তাপিত প্রাণে ঢালি দিল তরল বিমল
শান্তি-সুরধুনী জল! নন্দনে যা আছেরে সাজানো;—
তুই তারি একটি মল্লিকা! নীলাকাশে আছে যা ছড়ানো;—
তুই তারি—মরি, মরি, একবিন্দু চন্দ্রিকা শীতল!

তোরে হেরি, ওরে শিশু, পড়ে মনে ম্যাডোনার কোলে
বালক যীশুর মূর্ত্তি!—রাঙ্গাপায়ে মধুর নূপুর
তুই যেন ব্রজের গোপাল!—যেন মলয়-হিল্লোলে
ফুল্ল-কদমের শাখে হাবভাবে নাচিছে ময়ূর!
এ ক্ষুদে মুকুর-মাঝে,—কে দেখিবে? এস করি ত্বরা!
অসীম সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি নিজে আসি পড়িয়াছে ধরা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

আমার কৈফিয়ৎ।

বঙ্গের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর হরিনদীর বিষয়ে বিগত ভাদ্র মাসের "জাহ্নবী"তে আমি কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। কয়েক মাস পরে তজ্জন্য আমি শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট "বিশেষ ধন্যবাদ" লাভ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি আমি তাঁহার "বিশেষ প্রশংসাহ´", কিন্তু এই "ধন্যবাদ" ও "প্রশংসা"র সম্মুখে তাঁহার কল্পনার মূলে প্রকাণ্ড ভুল দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

আমি লিখিয়াছিলাম,—হরিনদী ভাগীরথীর উত্তর তীরে ছিল। রাধিকা বাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন,—"আমাদের মতে হরিনদী * * * ভাগীরথীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল না—দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। সেই

❋ "সৌম্য", আমার এক প্রিয়বন্ধুর শিশু পুত্র।

সময়ে ভাগীরথী বর্ত্তমান পানপাড়া নামক গ্রামের—হরিপুরের ও শান্তিপুরের অব্যবহিত দক্ষিণদিক দিয়া প্রবাহিত ছিল। কালের পরিবর্ত্তনানুসারে ভাগীরথীর গতি ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় ও দক্ষিণ দিকস্থ হরিনদী প্রভৃতি গ্রামসমূহকে * * * কবলিত করিয়া এখন পূর্ব্বাপেক্ষা নিস্তেজ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।" *

এই কথাগুলির প্রারম্ভেই রাধিকা বাবু লিখিয়াছেন, "আমাদের মতে।" তাই আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এই ভুল বিশ্বাসের পোষকতার জন্য তিনি আর কাহারও নাম করিতে পারেন কি? এ ভুল "তাঁহার মতে" হউক, কিন্তু "তাঁহাদের মতে" কখনই নয়! রাধিকাবাবুর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরাও আমার উক্তিই সমর্থন করিয়াছেন।

উপরে রাধিকাবাবুর প্রবন্ধ হইতে যে কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে তিনটি ভুল আছে। ১ম ভুল,—ঐ উক্তি তাঁহার নিজের ভুল বিশ্বাসের ফল, আর কাহারও ঐ রূপ ভুল বিশ্বাস নাই। সুতরাং "আমাদের মতে" এ কথা ঠিক নহে। ২য় ভুল,—হরিনদী ভাগীরথার উত্তর তীরেই ছিল, দক্ষিণ তীরে ছিল না। এখনও হরিনদীর যে অংশ বর্ত্তমান, তাহা ভাগীরথী-ত্যক্ত খালের উত্তর তীরেই অবস্থিত। সুতরাং হরিনদী ভাগীরথীর "দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল", এ কথা সত্য নহে। ৩য় ভুল,—পানপাড়া, হরিনদী ও হরিপুরের অব্যবহিত দক্ষিণে যখন গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল, তখন "শান্তিপুরের অব্যবহিত দক্ষিণ" দিকে গঙ্গা ছিল না; অর্থাৎ হরিনদী আদি গ্রামের দক্ষিণে যে খাল ও শান্তিপুরের দক্ষিণে যে খাল, এ উভয় খালে এক সময়ে গঙ্গার গতি ছিল না। যে কোন বিবেচক ব্যক্তি উভয় খালের তীরে দাঁড়াইলেই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং ঐ উভয় খালে এক সময়ে গঙ্গার গতি থাকার কথা আদৌ সত্য নহে।

যাঁহারা নদনদীর গতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, নদনদীর স্রোত সরল পথে প্রবাহিত হইলে, তীরবর্ত্তী ভূমি ভাঙ্গিয়া নদনদীর গর্ভগত হয় না। স্রোত বক্রপথে চলিয়া যে তীরবর্ত্তী ভূমির পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হয়, সেই তীরই ভাঙ্গে। ইহাকে চলিত ভাষায় "ভাঙ্গন" বলে। যে তীরে এইরূপ ভাঙ্গন ধরে, সে তীর ক্রমে ধনুকাকার প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই নদীর "বাঁক" বলে। এইরূপ বাঁক ক্রমে

* বিগত পৌষ মাসের "জাহ্নবী" দেখুন।

ধনুকাকৃতি হইতে প্রায় বলয়াকৃতি প্রাপ্ত হয়। নদীর যে ধার ভাঙ্গে, তাহার অপর পারে চড়া পড়ে। নদীর স্রোত যখন প্রায়-বলয়াকৃতি ধারণ করে, তখন মধ্যস্থ চড়া উপদ্বীপের আকার প্রাপ্ত হয়। এবং ঐ উপদ্বীপের যে অংশ অন্য স্থলাংশের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহা যোজকরূপে পরিণত হয়। মনে করুন, কোন স্থানের স্রোত প্রায়-বলয়াকৃতি পথে প্রবাহিত হইতেছে, বলয় মধ্যস্থ শূন্য অংশ চড়া ও বলয়বহির্দ্দেশস্থ ভূমি ক্রমে ভাঙ্গিয়া নদীর গর্ভগত হইতেছে। যে ধার ভাঙ্গে, সে ধারের মৃত্তিকা জল হইতে দেওয়ালের মত উচ্চ ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, ইহাকে পাহাড়ী, পাড় বা পাউড়ী বলে। প্রায় বলয়াকৃতি স্রোতের এক পার্শ্বে যোজকের মত যে স্থলাংশ থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে, স্রোত প্রায়-বলয়াকৃতি পথ পরিত্যাগ করিয়া সরল পথে প্রবাহিত হয়। এই অবস্থা ঘটিলে, নদনদীর প্রায়-বলয়াকৃতি অংশ স্রোতোহীন খাল বা বিলরূপে পরিণত হয়। বহুকাল পরে এইরূপ বিলের অবস্থা দেখিয়া নদনদীর গতি কোন দিকে ছিল, কোন তীর ভাঙ্গিত তাহা সকলেই স্থির করিতে পারে। ইহার জন্য বিশেষ বিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন হরিনদীর নিম্নে যখন গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত ছিল, তখন তাহা এইরূপ প্রায়-বলয়াকৃতি পথেই চলিত। গঙ্গা-পরিত্যক্ত বর্ত্তমান বিলের অবস্থা দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই প্রায়-বলয়াকৃতি গঙ্গার মধ্যস্থ চরে এক্ষণে কয়েকখানি গ্রাম হইয়াছে। এই বলয়াকৃতি গঙ্গার উত্তর তীরেই হরিনদী ছিল, অদ্যাপি হরিনদীর কিয়দংশ গঙ্গা-পরিত্যক্ত বিলের উত্তর তীরেই বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত অস্তিত্বের স্থান-নির্দ্দেশ করিতেছে। বর্ত্তমান হরিনদীর নিম্নেই গঙ্গার পাহাড়ীর চিহ্নও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি কেহ বলেন, "হরিনদী ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল", তবে তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইব ?

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে হরিনদীর উত্তরে অবস্থিত বাগাঁচড়া গ্রামে চাঁদরায়ের কথা লিখিত হইয়াছে। এই চাঁদরায়ের বিস্তৃত বাটীর দক্ষিণ দ্বার হইতে হরিনদী পর্য্যন্ত প্রায় ৮০ হাত প্রসারিত এক পথের বর্ত্তমান নাম "চাঁদরায়ের জাঙ্গাল।" চাঁদরায় হরিনদী গ্রামের নিম্নে নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। রাধিকাবাবুর কল্পনা অনুসারে হরিনদী গঙ্গার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত থাকিলে বাগাচঁড়া ও হরিনদীর মধ্যে গঙ্গার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়; এবং বলিতে হয় যে চাঁদরায় নিজ বাটী হইতে দক্ষিণ মুখে গমন করিয়া গঙ্গার অপর পারে

যাইয়া হরিনদীর নিয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন; ও গঙ্গার উপর দিয়া তাঁহার রথ টানিয়া হরিনদীতে লইয়া যাওয়া হইত! কিন্তু এস্থানের কেহই এরূপ কথা বলেন না, আজ কেবল রাধিকাবাবুই বলিতেছেন! আর একটা কথা, হরিনদী যদি গঙ্গার দক্ষিণ তীরেই ছিল, এবং উত্তর দিক হইতেই গঙ্গা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে বলেন, তাহা হইলে গঙ্গা-পরিত্যক্ত খালের উত্তর তীরে এক্ষণে হরিনদীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে কেন? যদি বাগাঁচড়ার দক্ষিণে ও হরিনদীর উত্তরে ভাগীরথীর অস্তিত্বের কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ উভয় গ্রামের মধ্যে সেরূপ কোন চিহ্ন দেখা যায় না কেন? বাগাঁচড়া ও হরিনদীর মধ্যে উচ্চ সমতল ভূমিই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতঃপর বোধ হয় ভাগীরথীর উভয় তীরে হরিনদীর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে রাধিকা বাবু উদ্যোগ করিবেন।

বর্ত্তমান হরিনদীতে যে কয়েক ঘর মৎস্যজীবী বাস করে তাহাদের মধ্যে শ্রীকালীপ্রসন্ন বারিক একজন। মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করাই ইহাদিগের পৈতৃক ব্যবসায়। কালীপ্রসন্নের বয়ক্রম এক্ষণে ৮০ বৎসর। এই কালীপ্রসন্নের পিতা রাম বারিকের ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে (প্রায় একশত বৎসর বয়সে) মৃত্যু হইয়াছে। কালীপ্রসন্নের মুখে শুনিয়াছি, তাহার পিতা গল্প করিত যে, সে হরিনদীর অব্যবহিত দক্ষিণবাহিনী ভাগিরথীতে মৎস্য ধরিয়াছে; এবং হরিনদী প্রভৃতি গ্রামসমূহের নিম্নস্থ ভাগিরথী প্রায়-বলয়াকৃতি পথ পরিত্যাগ করিয়া সরল পথে গমন করায়, স্রোতোহীন গঙ্গাকে বিলরূপে পরিণত হইতেও দেখিয়াছে। রাধিকা বাবু একটু কষ্ট করিয়া এই কালীপ্রসন্নকে অথবা এইরূপ বৃদ্ধদিগকে এসম্বন্ধে দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেন। সত্যানুসন্ধানে তাঁহার প্রবৃত্তি থাকিলে, তিনি নানা উপায়ে জানিতে পারিতেন যে, হরিনদীর দক্ষিণে গঙ্গা ছিল, এবং ক্রমে ক্রমে সেই গঙ্গাগর্ভেই প্রাচীন হরিনদী দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এই কালীপ্রসন্নও তাহার জ্ঞানোদয়ের পর বর্ত্তমান ক্ষুদ্র হরিনদীতে কয়েক ঘর মোদক, সূত্রধর ও কাঁসারীর বাস দেখিয়াছে। এখন কিন্তু আর উহাদের কেহই হরিনদীতে নাই।

রাধিকা বাবু আমার পরিচিত। তিনি আমার সত্য কথার প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই পারিতেন। যাহা হউক এই অপ্রিয় আলোচনার জন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু ভ্রম দূর করিতে ও সত্যের সম্মান রক্ষার্থে আমাকে রাধিকা বাবুর উক্তির প্রতিবাদ করিতে হইল।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অশ্রুহার।

(সমালোচনা)

এখানি গীতিকাব্য। পাঠ করিলেই বোধ হয় যে, গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম। ইহাতে শব্দ-নৈপুণ্য বড় একটা নাই, লিপিচাতুর্য্যও বড় একটা নাই। তা হউক্;—তবু ইহাতে যাহা আছে, সচরাচর বাঙ্গলা কবিতায় তাহা বিরল। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি ভাব-ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত। রচনা মধুর ও আবেগ-পূর্ণ। কোথাও ভাবগুলি যেন ফুলগুলি; আবার কোথাও ভাবগুলি যেন বর্ষার চঞ্চলা স্রোতঃস্বতীর মত, তর-তর শব্দে খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও কবি বাঞ্ছিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"প্রেমের ভিখারী আমি, প্রেম-অন্নপূর্ণা তুমি"

তিনি জানেন দয়িতাকে কখনই পাইবেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। তাই তিনি বলিতেছেন ঃ—

হৃদয় মুকুরে হায় তবে কেন বল না
ফেলে ছায়া ক্ষণতরে পুনরায় গেলে সরে
তুমি ত সরিয়া গেলে, ছায়াটুকু গেল না
ছায়ার আধার হ'ল বুক ভরা বাসনা।

আহা! কি সুন্দর উপমা

আবার কবি চিত্তের উচ্ছ্বাসে বলিতেছেন ঃ—

"বর্ষ, দিন, মাস, তিথি করি সুখে গণনা,
ধরণী আশার ভরে
চক্র প্রায় ঘুরে মরে—
ছায়ায় ছুঁইবে শশী—পূরিবে রে বাসনা।
এ পোড়া হৃদয়ে হায় গ্রহণ ও যে লাগে না,
মিছে সব; সুধাই রে ছলনা?

ইহা অতি সুন্দর; উপমাটি বাস্তবিকই মৌলিক।

আবার কবি মনের আক্ষেপে বলিতেছেন ঃ—

"চাই তারে দেখিবারে—
আসি ফিরে কাঁদিবারে—
আবার দেখিব ব'লে কেঁদে ফিরে যাই রে!
কি ক্ষতি? আপন চিতা আপনি সাজাই রে।

কবির এ প্রেমে মলিনতা নাই, তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষায় কাম-গন্ধ নাই। তাঁহার বাসনা-রাগিনী প্রেমের সা-রে-গা-মা র অতি উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন ঃ—

"আমি পর, তুমি পর,
যেন নিশি, প্রভাকর,—
হউক একটি বার উভয়ে মিলন
মোহন উষায় হায় শেষ-পরশন!
এস যাই—দাও,—লও—একটি চুম্বন।

এ উপমাটিও সুন্দর ও অভিনব।

ঠিক্ কথা। আত্মবলিদান ছাড়া প্রেম নাই। তাই অন্য এক বাঙ্গালী কবি, হৃদয়মন্দিরে প্রেমের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাকে বলিয়াছেন ঃ—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে!"

হায়! এই অপার্থিব প্রেম এত বাধা-বিঘ্ন-সঙ্কুল কেন? জব্বলপুরের marble-rocks ভেদ করিয়া যেমন "ধূম-ধারা" নির্ঝরিণী নির্গত হইতেছে, প্রেমের শ্বেতমর্ম্মরময় শিলাসন ভেদ করিয়া,অশ্রু-নির্ঝরিণীও তেমনি প্রবাহিত হইতেছে। মহাকবি Shakspear এই তত্ত্ব বেশ বুঝাইয়াছেন ঃ—

"Lysander ;
"Ah me! for aught that I could ever read
Could ever hear by tale or history.
The course of true love never did run smooth!"
(A Midsummer Night's Dream.)

তাই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের সুবিখ্যাত লেখক সহৃদয় দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না। সুরধুনী তীর হইতে যেন শুষ্ক কণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার উপাদান আছে"—

"চাঁদের মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই।"

তাই প্রেমিক কবি Shelly গাহিয়াছেন ঃ—

"Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought".

তাই প্রেমিক কবি Keats বিহঙ্গের ললিত কাকলীর উপভোগ কালেও বিষাদ-খিন্ন হইয়া গাহিয়াছেন ঃ—

> "My heart aches, and a drowsy numbness pains
> My sense, as if of hemlock I had drunk
> Or emptied some dull opiate to the drains
> One minute past, and Lethe-wards had sunk".

অমর কবি Tennyson গাহিয়াছেন ঃ—

> Dear as remembered kisses after death,
> And sweet as those by hopeless fancy feigned
> On lips that are for others ; deep as love,
> Deep as first love, and wild with all regret,
> O Death in Life ! The days that are no more".

মেঘদূত কাব্যের নায়ক বিরহী যক্ষ অলকায় বসিয়া কখনই, ভাববিভোর হইয়া, সৌন্দর্য্য-বিভোর হইয়া, গাহিতে পারিত না ঃ—

> "ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া—
> মাত্মানং তে চরণপতিতাং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
> অস্রৈস্তাবন্ মুহুরুপচিতৈ দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
> ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ।"

তাই তপস্বীজনোচিত অলৌকিক কবিতায় মহাকবি ভবভূতি গাহিয়াছেন ঃ—

> বরমপি বিরহো বিকল্পে নহি সঙ্গমস্তস্যাঃ।
> সঙ্গে সৈব স একা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

আমাদিগের কবি তাঁহার কতিপয় কবিতায় দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিষ্কাম প্রেম-সাধনা কতকটা সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু পাছে দয়িতার নামে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ করে, তাই তাহাকে প্রকারান্তরে বলিতেছেন ঃ—"হে বাঞ্ছিত! তুমি জন্মের শোধ দেখা দিয়াছ ;—আর আসিও না। এই মাহেন্দ্রক্ষণে, তোমার আত্মা-বধূর সহিত আমার শুভ পরিণয় হইয়া গেল। এক্ষণে তোমার জড় রূপ লইয়া, হে চিদানন্দময়ি বিগ্রহমূর্ত্তি! তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহৃদয় বাঙ্গালী পাঠক এ অপূর্ব্ব সঙ্গীতে লালসার সূর্পণখা মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন না। আমি বেশ জানি বাঙ্গালী কোন্‌টা খাঁটি সোণা আর কোন্‌টা chemical gold তাহা বুঝিতে অক্ষম নহে।

তাই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে অকথ্য-অশ্রাব্য অনেক কথা থাকা সত্ত্বেও, উহার ভিতরে নিষ্কাম প্রেমের আস্বাদ পাইয়া, বাঙ্গালী বিমোহিত হয়। ভারতচন্দ্র একটি অপূর্ব্ব ছত্রে প্রেমের মহীয়সী সম্প্রসারণী শক্তির প্রভাব দেখাইয়াছেন ঃ—

"খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট।"

যে লৌকিক প্রেম, আত্মহারা হইয়া, অনন্তের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহা লৌকিক হইলেও বিশ্বলৌকিক। এই জন্য "রজকিনী রামী"র প্রেমমুগ্ধ বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের অবতারণা করিয়াও বঙ্গ-কবিকুলের রাজা। এই জন্য রাধাভাবের মধুর ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন ঃ—

"বাহিরে বিষ জ্বালাময়
ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমা আস্বাদন
তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে
তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

আমরা কাব্যখানি পাঠ করিয়া কবির আরাধ্যা প্রেমময়ী মোহিনী মূর্ত্তির ভিতরে আমাদের ইষ্টদেবতার প্রতিবিম্ব দেখিয়া, তন্ময় হইয়া, নিজ ভাষায়, "হে কৃষ্ণ! হে জনার্দ্দন! হে বল্লভ! হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর!" বলিতে বলিতে, কবির ভাষায় বলিতে লাগিলাম ঃ—

"কোথা তুমি রেতে রেতে এসে তুমি গোপনে,
আঁধার হৃদয় তলে
আশাআলো দাও জেলে
আলো যে নিবিয়ে গেলে, পোড়ে বুক দহনে,—
কেন এসে মিছে মিছে আলো জ্বালো স্বপনে ?

হে কবি, তুমি কেন ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছ ?—

ফুরাল রে শেষ দেখা,—ছাইল ধরণী
চিতাধূমরাশিময় প্রচণ্ড রজনী!

যাই—শোকতরু মূলে
সিঞ্চিব নয়নজলে—
আপন সমাধিতল খুঁড়িব আপনি।

হে কবি! তুমি কেন বিষণ্ণ, অবসন্ন হইয়া, বলিতেছ ?—

নাহি আশা এ নয়নে
হেরিবে রে সে নয়নে,
জানাইব দু' নয়নে
নয়ন-পিপাসা তায়।

হে কবি! হে বন্ধো! এস, আমরা দুইজনে, পাশাপাশি হইয়া, এই মায়া-যবনিকার কাছে, এই শ্রীমন্দিরের রুদ্ধ কপাটের নিকটে দাঁড়াইয়া, বাষ্পাকুল-লোচনে, হাতযোড় করিয়া বলি ঃ—"হে দয়িত! হে চিরারাধ্য! হে কামনার একমাত্র বস্তু! দ্বার খোল! দ্বার খোল! তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি"।

শুনিতে পাইতেছ না? ভিতর হইতে কোন্ মহাপুরুষ প্রেমগদ্গদকণ্ঠে বলিতেছেন ঃ—"Knock, and it shall be opened! Knock, and ye shall find."

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

রূপের প্রতিমা।

১

চেয়েছিনু আঙ্গিনার পানে ;
রূপের প্রতিমা কার হেরিনু কে জানে ?—
বাধিছে কেশের রাশি, অধরে উথলে হাসি,
হেরিয়া দর্পনে নিজ দর্পিত সে যৌবনে ;
শিশু এসে চুমা চায় চুমা-রাঙ্গা বদনে।
রূপের প্রতিমা এক নেহারিনু অঙ্গনে।

২

চেয়েছিনু বন-পথ পানে ;
রূপের প্রতিমা কার হেরিনু কে জানে ?—
শিরে তার জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের হার,
বিভূতি বসনে ঢাকা ফুলতনু যতনে ;
নাহি হাস, নাহি ভাষ, অধরে কি নয়নে।
রূপের প্রতিমা এক নেহারিনু কাননে।

প্রকাশিত হইবে। জ্যোতি ব্রত মহাশয় বঙ্গদেশীয় বিখ্যাত জ্যোতিষী-কুলোদ্ভব এবং এই শাস্ত্রে একজন কৃতী ব্যক্তি। তাঁহার এই প্রচার কার্য্যে সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

কতকগুলি উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও গীতা প্রভৃতি কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ অন্বয়, শব্দার্থ ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইতেছে। স্থলে স্থলে তাৎপর্য্যও থাকিতেছে। সামান্য সংস্কৃতজ্ঞান থাকিলেও যাহাতে মূলের অর্থ প্রতীতি হয় এইরূপে পুস্তক কয়খানি সম্পাদিত হইতেছে। উপনিষৎ অংশে শঙ্কর কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত উপনিষৎগুলিই থাকিবে। ইহার প্রকাশক পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মৈত্র। মৈত্র মহাশয় সদাচারী ব্রাহ্মণদিগকে বিনামূল্যে দান এবং সাধারণকে বিনালাভে বিক্রয় করিবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান মৈত্র মহাশয়ের এ সৎকার্য্যের পুরস্কার অবশ্যই দিবেন।

কর্ণেল অলকট থিয়োজফির কেন্দ্র মাদ্রাজের আদেয়ার গ্রামে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার শবদেহ কবরস্থ না করিয়া দাহ করা হইয়াছে। কর্ণেল অলকটের জীবন যেমন দীর্ঘ, তেমনি বৈচিত্র্য-পূর্ণ। নিউ জারসির অরেঞ্জ প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম বয়সে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উৎকর্স সাধনে যত্নবান হন। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের গৃহবিচ্ছেদের সময় তিনি সৈন্যদলভুক্ত ও কর্ণেলের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সামরিক বিভাগের স্পেশাল কমিশনারের পদে বৃত হয়েন। তাহার পর ক্রমে আইন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তিনি বিলক্ষণ পশার করিয়াছিলেন। অতঃপর থিয়োজফির প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল; এবং তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক নগরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য তাহার সভাপতি নিযুক্ত হন। ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কির সংস্পর্শে আসায় তাঁহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ এবং সিংহল ও জাপানে উক্ত ধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। কর্ণেল অলকটের যত্নে আজ সমগ্র পৃথিবীতে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর আট শত তিরানব্বইটী শাখা স্থাপিত হইয়াছে।